বাংলাদেশের উপন্যাসের শৈলীবিচার(১৯৪৭ - ১৯৭১)

মোহাম্মদ গোলাম মাওলা

Dhaka University Library
382684
382684
ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.ফিল. ডিগ্রির জন্য প্রস্তুত অভিসন্দর্ভ
নভেম্বর, ১৯৯৯

Dhaka University Institutional Repository

382684

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, মোহাম্মদ গোলাম মাওলা কর্তৃক উপস্থাপিত 'বাংলাদেশের উপন্যাসের শৈলীবিচার (১৯৪৭-১৯৭১)' শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার তত্ত্বাবধানে রচিত। এই অভিসন্দর্ভ বা এর কোন অংশ গবেষক অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো ডিগ্রির জন্য উপস্থাপন করেন নি।

(বিশ্বজিৎ ঘোষ) ৩১/১০/১৯৯৯
গবেষণা-তত্ত্বাবধায়ক
সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা - ১০০০
বাংলাদেশ।

Dhaka University Institutional Repository

সূচীপত্র

অবতরণিকা

প্রথম অধ্যায় : মহাকাব্য শিল্পশৈলীর উপন্যাস ॥ ১-১৭
ক. সংশপ্তক
খ. ক্ষুধা ও আশা

দ্বিতীয় অধ্যায় : চেতনাপ্রবাহ শিল্পশৈলীর উপন্যাস ॥ ১৯-৪৩
ক. চাঁদের অমাবস্যা
খ. কাঁদো নদী কাঁদো

তৃতীয় অধ্যায় : মিথ-ইতিহাস-ঐতিহ্যের নবমূল্যায়নধর্মী নতুন শিল্পশৈলীর উপন্যাস ॥ ৪৫-৬০
ক. ভাওয়াল গড়ের উপাখ্যান
খ. অভিশপ্ত নগরী
গ. পাপের সন্তান

চতুর্থ অধ্যায় : রূপক-প্রতীকী শিল্পশৈলীর উপন্যাস ॥ ৬২-৭৮
ক. ক্রীতদাসের হাসি
খ. রাজা উপাখ্যান
গ. সমাগম

পঞ্চম অধ্যায় : আঞ্চলিক উপন্যাসের শিল্পশৈলী ॥ ৮০-৯২
ক. সারেং বৌ
খ. কর্ণফুলী

উপসংহার : ॥ ৯৩

পরিশিষ্ট : ॥ ৯৪

Dhaka University Institutional Repository

প্রসঙ্গ কথা

আমার এম.ফিল. অভিসন্দর্ভের শিরোনাম 'বাংলাদেশের উপন্যাসের শৈলীবিচার (১৯৪৭-১৯৭১)'। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডক্টর বিশ্বজিৎ ঘোষ-এর তত্ত্বাবধানে আমি এ-অভিসন্দর্ভ রচনা করি। ১৯৯৫-১৯৯৬ শিক্ষাবর্ষে আমি এম.ফিল.কোর্সে নিবন্ধন লাভ করি এবং বাংলা বিভাগের প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান এবং ডক্টর সৈয়দ আকরম হোসেন-এর কাছে এম.ফিল. প্রথম পর্বের কোর্সসমূহ অধ্যয়ন করি। ১৯৯৯ সালের জানুয়ারি মাসেএম.ফিল. প্রথম পর্ব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে আমি অভিসন্দর্ভ রচনায় মনোনিবেশ করি। ব্যক্তিগত জীবনে নানা প্রতিকূলতা সত্ত্বেও নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই আমি এই অভিসন্দর্ভ পরীক্ষার জন্য উপস্থাপন করছি।

বর্তমান অভিসন্দর্ভের সামগ্রিক পরিকল্পনা - প্রণয়ন ও রূপরেখা-নির্মাণে আমার গবেষণা-তত্ত্বধায়ক ডক্টর বিশ্বজিৎ ঘোষ-এর নিরন্তর উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা আমি কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি। তাঁর অকৃত্রিম ভালোবাসা, অনাবিল আন্তরিকতা, সুচিন্তিত পরামর্শ ও প্রাজ্ঞ নির্দেশনা আমার গবেষণা-কর্মকে অনেক সহজসাধ্য করে দিয়েছে। ব্যক্তিগতভাবে আমি তাঁর স্নেহে ধন্য , তাঁর কাছে অপরিশোধ্য ঋণে আবদ্ধ।

গবেষণা-কালে নানা পর্যায়ে প্রাজ্ঞ পরামর্শ ও মূল্যবান অভিমত দিয়ে প্রফেসর আনিসুজ্জামান, প্রফেসর মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, প্রফেসর আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ,প্রফেসর সৈয়দ আকরম হোসেন, ডক্টর ভীষ্মদেব চৌধুরী, ডক্টর রফিকউল্লাহ খান প্রমুখ আমাকে গভীর কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন। বাংলা একাডেমীর পরিচালক সুব্রত বড়ুয়া, সেলিনা হোসেন ও উপপরিচালক ফরহাদ খান এবং আমার বড় ভাই মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর-এর আন্তরিকতা ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ এ-প্রসঙ্গে আমি কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করি। আমার গবেষণা -জীবনের সূতিকাগার চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রফেসর ডক্টর মনিরুজ্জামান, ডক্টর ভুঁইয়া ইকবাল,ডক্টর শাহজাহান মনির,ডক্টর ময়ূখ চৌধুরী প্রমুখের স্নেহময় সান্নিধ্য ও আন্তরিক অনুপ্রেরণার কথাও আমি কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করি।

গবেষণা -কালে আমি প্রধানত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার এবং বাংলা একাডেমী গ্রন্থাগার ব্যবহার করেছি। এ-সূত্রে গ্রন্থাগার-কর্তৃপক্ষ ও কর্মচারীবৃন্দকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

Dhaka University Institutional Repository

অবতরণিকা

উপন্যাস একটি বিমিশ্র শিল্পাঙ্গিক। শৈলীবিজ্ঞানের সুনির্দিষ্ট দৃষ্টিকোণ থেকে উপন্যাসের নান্দনিক সৌন্দর্য বিশ্লেষণ করা দুরূহ বিষয়। কারণ শৈলীবিজ্ঞান মূলত ভাষাবিজ্ঞানেরই একটি শাখা ; রচনার ভাষিক উপাদান বিশ্লেষণই এর প্রধান লক্ষ্য।উপন্যাস ভাষিক উপাদানে নির্মিত হলেও এই শিল্পাঙ্গিকের রয়েছে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য। জীবনদর্শন, প্লট, চরিত্র, বিষয়, ভাষা সংগঠন, অবয়ব সব মিলিয়ে উপন্যাসের বিশাল শিল্পজগৎ। তাই নিঃসন্দেহে বলা যায়, একমাত্র ভাষা-বিশ্লেষণ দিয়ে উপন্যাসের শৈলী সৌন্দর্য আবিষ্কার করা সম্ভব নয়।

উপন্যাস কেবল সমাজ ও ব্যক্তির দ্বন্দ্বের স্বরূপ নয়, উপন্যাসে থাকে লেখকের জীবনদর্শন,জীবন সম্পর্কে তাঁর স্বকীয় অভিজ্ঞান। Ralf Fox তাই বলেন- "it is true that all novel writing is a philosophical occupation."[১] কিন্তু দর্শন যখন শিল্পে রূপ নেয় তখন তা কিভাবে ঘটে ? ঔপন্যাসিক কি জীবনদর্শন প্রকাশের জন্য একটা ছক সাজিয়ে নেন, নাকি ভাস্করের মত বাস্তবের মাটি দিয়ে কল্পনার মানুষের মূর্তি গড়ে তোলেন ? বিষয়ের চাপে উপন্যাসের সাজবদল ঘটে, নাকি জীবনদর্শনের অমোঘ প্রযোজনে চরিত্ররা আপন মূর্তি নিয়ে উপন্যাসে শরীর গড়ে তোলে ? উপন্যাসের শৈলী বিচারে এসব বিষয়ের আলোচনাও প্রাসঙ্গিক। তাই উপন্যাসের শৈলী স্বাতন্ত্র্যকে কেবল ভাষাতত্ত্বের অনুগামী না করে উপন্যাসের নিজস্ব শিল্পবৈশিষ্ট্যের আলোকে বিশ্লেষণ করাই অধিক যুক্তিযুক্ত। 'যেহেতু বহমান বর্হির্বস্তুজগত এবং স্রষ্টার অনুভবসংবেদন মন এদুয়ের জটিল বাস্তবতা একাত্ম হয়ে প্রকাশ ঘটায় রূপের ; সে-কারণে উপন্যাসের ফর্ম নির্মাণের ক্ষেত্রে সাধিত হল জটিলতর রূপান্তর। .. .. প্লটবিন্যাসের কার্যকারণ, চরিত্রের বিকাশক্রম সময়ধারণা ও বাক্যগঠনশৈলীর মাঝে সঞ্চারিত হল এক অস্থির মন ও মননক্রিয়া। সৃষ্টি হল চৈতন্যপ্রবাহরীতির উপন্যাস। পরীক্ষাপ্রিয় ঔপন্যাসিকগণ রচনা করল anit-plot, anti-hero ও anti-time উপন্যাস।'[২] তাই রূপকল্প (Form) ও প্রকরণ পরিচর্যা (Treatment) উপন্যাসের শৈলী বিচারের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় হওয়া উচিত বলে আধুনিক কালের উপন্যাসতাত্ত্বিকরা মনে করেন।

'শৈলী' শব্দের অর্থ অভিধানে 'রীতি' লেখা হলেও 'শৈলী' অর্থে রীতি শব্দে 'শৈলী'-র সামগ্রিক চারিত্র্য প্রকাশিত হয় না। বাংলায় 'রীতি' শব্দটি একার্থ নয় ; 'রীতি' বলতে বোঝায়-প্রণালী,প্রথা পদ্ধতি, ধরন, ধারা, দস্তুর (সামাজিক রীতি-নীতি, দস্তুর)ইত্যাদি। ইংরেজি Style শব্দের পারিভাষিক অর্থ 'রীতি' লেখার ফলে এই অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছে। Style শব্দটি যখন আমরা উচ্চারণ করি তখন বোঝাতে চাই ব্যক্তি বিশেষের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য। যেমন, লোকটির কথা বলার স্টাইল, হাঁটার স্টাইল, পোশাকের স্টাইল ইত্যাদি। অর্থাৎ ব্যক্তিত্বের ছাপকল্পনাই স্টাইল শব্দ ব্যবহারের মধ্যে সক্রিয় থাকে।

'শৈলী' শব্দের অর্থ 'রীতি' বললে আরেকটি বিভ্রান্তি যোগ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সেটি হচ্ছে ভারতীয় রীতিবাদের ধারণা। সংস্কৃত আলংকারিক দণ্ডী, ভামহ্-এর মতে 'রীতিরাত্মা কাব্যস্য'-রীতিই হলো কাব্যের আত্মা। রীতির অর্থ বিশিষ্ট পদরচনার ভঙ্গি। এই বিশিষ্টত্বের আত্মা হলো গুণ। এভাবে বৈদর্ভী,গোড়ী, পাঞ্চালী নামে তিনটি রীতি বা কাব্যভঙ্গির কথা বলেছেন তাঁরা। স্টাইল অর্থে 'রীতি' ব্যবহারকারীদের মনে সংস্কৃত রীতিবাদের এই ধারণা অজান্তে ছায়া ফেলে গেছে। 'স্টাইল' শব্দের বাংলা পরিভাষা হওয়া উচিত 'শৈলী'। কেননা, স্টাইল বা শৈলী বলতে আমরা

Dhaka University Institutional Repository

মূলত বোঝাতে চাই ব্যক্তিত্বের ছাপ বা বিশেষ বৈশিষ্ট্য। যদিও একই ব্যক্তি বা লেখকের ভিন্ন ভিন্ন রচনার ভিন্ন ভিন্ন শৈলী বা বৈশিষ্ট্য থাকে।

স্টাইল শব্দটি ল্যাটিন 'স্টাইলাস' শব্দ থেকে এসেছে। স্টাইলাস শব্দের অর্থ এক প্রকার লেখন দণ্ড। বিশেষ্য পদ হিসেবে Stilistik শব্দটি ইংরেজি অভিধানে স্থান পায় ১৮৪৮ সালে। রচনার বিশেষ রূপ ও ভাবব্যঞ্জক শব্দার্থে Stylistique ফরাসী সাহিত্যের অভিধানে জায়গা করে নেয় ১৮৭২ সালে। ওল্ড ইংলিশ ডিক্সেনারীতে শব্দটি রেগুলার ওয়ার্ড হিসেবে ব্যবহৃত হয় ১৮৮২-৮৩ সাল থেকে।'[৩] ইংরেজি স্টাইল থেকে স্টাইলিস্টিকস্ শব্দের সৃষ্টি। প্রকৃতপক্ষে স্টাইল ও স্টাইলিস্টিকস্, ল্যাঙ্গুয়েজ ও লিঙ্গুইস্টিকস্ এর মত ভাষা বিজ্ঞানের বিষয়। তবে লিঙ্গুইস্টিকস্ এবং স্টাইলিস্টিকস্ এর মধ্যে পার্থক্য আছে। লিঙ্গুইস্টিকস্ ভাষার স্টাক্চার বিশ্লেষণ করে আর স্টাইলিস্টিকস্ শুধু স্টাক্চার নয় রচনার সৌন্দর্য এবং রসাবেদন ও বিশ্লেষণ করে। কাজেই রচনার সামগ্রিক শিল্পসৌন্দর্য আবিষ্কার করা স্টাইলিস্টিকস্ এর বিষয়। অর্থাৎ রচনার 'রেটোরিক্যাল এ্যাপিল' কিভাবে গড়ে উঠেছে, তার পেছনে ভাষার গঠন ও নির্মাণকৌশল কতটুকু অবদান রাখে স্টাইলিস্টিকস্ তার অনুসন্ধান করে। Stylistics এর সংজ্ঞার্থ দিতে গিয়ে Stephen Ullmanবলেছেন-Styliscs is not a branch iof linguistics, it is a parallel science which examines the same problmes from a different point of View.'[৪]

Ullman-এর এই সংজ্ঞার্থের তাৎপর্য হচ্ছে, সাহিত্যকে শুধু ভাষানির্মিতি হিসেবে দেখা নয়, ভাষায় নির্মিত লেখকের কল্পনার মূর্তিরূপকেও দেখা। ভাষায় নির্মিত লেখকের শিল্পমূর্তির মধ্যে একটি অবয়ব কল্পনা থাকে, যার মধ্যে ভাষাও পড়ে। তাই শৈলীবিজ্ঞানকে একান্তভাবে ভাষাবিজ্ঞান নির্ভর আলোচনার অনুগামী না করে, বলা যায় 'বিচারবিভাগের সঙ্গে গোয়েন্দাবিভাগের সে সম্পর্ক, খানিকটা সেই রকম সম্পর্ক সমালোচক আর শৈলীবিজ্ঞানীর। তার অর্থ এই নয় যে, বিচারক নিজে গোয়েন্দাগিরির কাজ করবেন না। প্রচুর বিচারক তা করেছেন। আবার তার অর্থ এও নয় যে, গোয়েন্দা কখনো বিচারক হয়ে উঠবেন না। দুয়ের ভূমিকা যেখানে মিলে যায় সে এক তৃতীয় অবস্থা, বিচারকের গভীর অন্তর্দৃষ্টি এবং শৈলীবিজ্ঞানীর তথ্যসমৃদ্ধ সাক্ষ্যপ্রমাণ তখন বিচারকের সিদ্ধান্তকে এক প্রবল মৃদ্‌ভূমির উপর দাঁড় করিয়ে দেয়, বিচারকের অনুমানকে দেয় সত্যের মর্যাদা।'[৫] বাংলাদেশের উপন্যাসের শৈলী বিচারের ক্ষেত্রে উপর্যুক্ত দৃষ্টিকোণ অবলম্বণ করা হয়েছে।

'বাংলাদেশের উপন্যাসের শৈলীবিচার (১৯৪৭-১৯৭১)' শীর্ষক বর্তমান অভিসন্দর্ভে 'উপসংহার' ব্যতীত পাঁচটি অধ্যায় রয়েছে। প্রত্যেকটি অধ্যায়ের প্রারম্ভে সংশ্লিষ্ট শিল্পশৈলী-সংক্রান্ত তত্ত্ব-ব্যাখ্যা সংযোজিত হয়েছে। প্রথম অধ্যায় 'মহাকাব্যিক উপন্যাসের শিল্পশৈলী'। এ অংশে আলোচিত হয়েছে শহীদুল্লা কায়সারের 'সংশপ্তক' এবং আলাউদ্দিন আল আজাদের 'ক্ষুধা ও আশা' উপন্যাস। দ্বিতীয় অধ্যায়- 'চেতনাপ্রবাহ শিল্পশৈলীর উপন্যাস'। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র 'চাঁদের অমাবস্যা' এবং 'কাঁদো নদী কাঁদো' উপন্যাসের শিল্পপ্রকৃতি অধ্যায়ে বিশ্লেষিত। তৃতীয় অধ্যায় - 'রূপক - প্রতীকী শিল্পশৈলীর উপন্যাস'। শওকত ওসমানের 'ক্রীতদাসের হাসি', 'রাজা উপাখ্যান' এবং 'সমাগম' এ অধ্যায়ের আলোচিত উপন্যাস। চতুর্থ অধ্যায়- 'মিথ-ইতিহাস-ঐতিহ্যের নবমূল্যায়নধর্মী নতুন শিল্পশৈলীর উপন্যাস'। আবু জাফর শামসুদ্দীনের 'ভাওয়াল গড়ের উপাখ্যান' এবং সত্যেন সেনের 'অভিশপ্ত নগরী' ও 'পাপের সন্তান' এ অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। পঞ্চম অধ্যায়ে-আঞ্চলিক জীবনরূপায়নমূলক শিল্পশৈলী'। শহীদুল্লা কায়সারের 'সারেং বৌ' এবং আলাউদ্দিন আল আজাদের 'কর্ণফুলী' এ অধ্যায়ের আলোচিত উপন্যাস। সবশেষে সংযোজিত হয়েছে 'উপসংহার'।

Dhaka University Institutional Repository

আধুনিক উপন্যাসের শৈলীবিচারের ক্ষেত্রে কয়েকটি দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেয়া হয়- চেতনাগত দিক, জীবনপর্যবেক্ষণ, সময়ের ব্যবহার, ভাষাতাত্ত্বিক বিবেচনা, আঞ্চলিক জীবন-অবলোকন ইত্যাদি। বর্তমান অভিসন্দর্ভে এসব দিকের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। বিষয়কে বাদ দিয়ে উপন্যাসের শৈলীবিচার সম্ভব নয়,তাই উপন্যাসের শৈলীবিচারের সময় অনিবার্যভাবে বিষয়ের আলোচনাও বর্তমান অভিসন্দর্ভে সংযোজিত হয়েছে।[৬-১১] কালপরিসরে বিপুল সংখ্যক উপন্যাসের প্রকাশ লক্ষ করা গেলেও একথা অনস্বীকার্য যে, এই পর্বের বাংলাদেশের ঔপন্যাসিকরা উপন্যাসের ফর্ম ও প্রকরণ -পরিচর্যায় ততটা যত্নশীল নন। সুদীর্ঘকাল ঔপনিবেশিক শাসনের পর ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগ, নব্য ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র শক্তির সঙ্গে বাঙালির দ্বন্দ্ব-সংঘাত, ৫২ সালের রক্তাক্ত অভিজ্ঞতা ও ৫৮- সালে সামরিক শাসনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে জাতীয় মুক্তির পথে অগ্রসর হয়েছে। কিন্তু সংকট-সংকুল, জটিলতর জীবন-পরিস্থিতিতে উপন্যাসের নতুনতর ফর্ম-উদ্ভাবনের যে অনিবার্যতাপ্রত্যাশিত ছিলো,দু'একটি ব্যতিক্রম ছাড়া, তা লক্ষ করা যায় না। সঙ্গত কারণে বিপুল সংখ্যক উপন্যাসের মধ্যে খুব স্বল্পসংখ্যক উপন্যাসকে আলোচ্য শিরোনাম-সমীক্ষায় অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হয়েছে।

তথ্যনির্দেশ ও টীকা

১. Ralf Fox, *The novel and the people* , 1944. Moscow, Eagle Publication P.36.

২. সৈয়দ আকরম হোসেন, *প্রসঙ্গ: বাংলা কথাসাহিত্য,* ১৯৯৭,ঢাকা,মাওলা ব্রাদার্স, পৃ. ১১১-১১২

৩. নবেন্দু সেন, *বাংলা গদ্য স্টাইলিস্‌টিক্‌স্‌,*দ্বিতীয় মুদ্রণ ১৯৯০, কলকাতা, সাহিত্য প্রকাশ, পৃ.১

৪. Stephen Ullman, *Style in the French novel,* 1957. England, P. 10

৫. পবিত্র সরকার, আশিসকুমার দে লিখিত *সাহিত্যালোচনা ও শৈলীবিজ্ঞান* ১৯৯২, কলকাতা, সাহিত্য প্রকাশ, গ্রন্থের 'ভূমিকা' অংশ দ্রষ্টব্য।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায় : মহাকাব্য শিল্পশৈলীর উপন্যাস

ক. সংশপ্তক
খ. ক্ষুধা ও আশা

Dhaka University Institutional Repository

মহাকাব্য শিল্পশৈলীর উপন্যাস

উপন্যাস বিবেচনায় সমালোচকগণ নানা সময়ে কিছু উপন্যাসকে মহাকাব্যিক উপন্যাস হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। যদিও মহাকাব্যিক উপন্যাসের সংজ্ঞা ও স্বরূপ সম্পর্কে কোনো সুনির্দিষ্ট অভিমত পাওয়া যায় না, তবুও স্পষ্ট বোঝা যায়, প্রাচীন মহাকাব্যের চারিত্র্য লক্ষণের সঙ্গে উপমিত করে কিছু উপন্যাসকে মহাকাব্যিক উপন্যাসের আখ্যা দেয়া হয়েছে। প্রাচীন মহাকাব্য থেকে মধ্যযুগে রোমান্সের পথ অতিক্রম করে আধুনিক যুগের অনিবার্য শিল্পাঙ্গিক যে উপন্যাস তার সৃষ্টির নেপথ্যে রয়েছে শিল্পবিপ্লবোত্তর আধুনিক সমাজ। মানব সভ্যতার যে স্তরে গতি ও গদ্যের আবির্ভাব সমাজ বিকাশের এই পর্ব থেকেই আধুনিকতার সূত্রপাত বলে ইতিহাসবিদরা মনে করেন। আধুনিকতার এই বোধ ও অভিজ্ঞতা অর্জনের সঙ্গে সঙ্গে খুলে যায় মানুষের চারপাশের বোধের দরজা, বহু দিগন্ত, যুক্ত হয় অবলোকনের নতুন মাত্রা। প্রজ্ঞা ও প্রচেষ্টা দিয়ে গদ্যের মাধ্যমে মানুষ হাজির করে জীবন ও জগতের যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা। গদ্যের আবির্ভাবের সঙ্গে উপন্যাসের উদ্ভব তাই কোনো আকস্মিক ঘটনা নয়, কারণ গদ্যই ধারণ করেছিল একই সঙ্গে অনেক মানুষের শ্রুতি ও চেতনা। গদ্যের গর্ভেই উপন্যাসের ভ্রূণ সুপ্ত ছিল। উপন্যাসকে তাই বলা যায়, মহাকাব্যের মহিমাভ্রষ্ট সন্তান। আধুনিক সমাজে উপন্যাস, মহাকাব্যের স্থান দখল করলেও মানুষের মন থেকে মহাকাব্যের মহিমা পরিপূর্ণভাবে মুছে যায় নি। উপন্যাস লিখতে গিয়ে মানুষ মহাকাব্যের বিশালতা, প্রলম্বিত কাহিনী ও নায়কোচিত চরিত্রের কথা স্মরণ করেছেন। পটভূমি ও যুগমানস সঞ্চার করে উপন্যাসকে দান করেছেন মহাকাব্যিক মহিমা। কারণ, উপন্যাসের লক্ষ্য মানুষের সমগ্র জীবন। Ralf Fox বলেছেন :

'The novel is not merely fictional prose, it is the prose of man's life, the first art to attempt to take the whole man and give him expression.'[১]

উপন্যাস কেবল মানব জীবনের গদ্য নয়, মানব জীবনকে সমগ্রভাবে গ্রহণ করার শিল্পরূপই হলো উপন্যাস। 'সমগ্র জীবন' বলতে মানুষের অন্তর্দ্বন্দ্বময়, বিচিত্র, বহুভুজ ব্যক্তিজীবন এবং পরিবর্তমান সমাজ সময়ের স্রোতে নিত্যসংকটদীর্ণ বস্তুময় বর্হিজীবনকে বোঝায়। কিন্তু অধিকাংশ উপন্যাসেই মানবজীবনের সামগ্রিকতা খুঁজে পাওয়া যায় না। 'মুষ্টিমেয় যে সব উপন্যাসে মানুষের ব্যক্তিজীবন ও সমাজ জীবন বিস্তীর্ণ পরিধির মধ্যে শিল্পরূপ লাভ করে, সেখানেই প্রকাশিত হয় মানুষের 'সমগ্রজীবন'। এই উপন্যাসসমূহকেই প্রাচীন মহাকাব্যের সঙ্গে উপমিত করে বলা হয়েছে মহাকাব্যিক উপন্যাস।'[২] W.Somerset Maugham তাঁর Ten novels and their Authors (১৯৫৪) গ্রন্থে মহাকাব্যশৈলীর উপন্যাসের আদর্শ দৃষ্টান্ত হিসেবে জেন অস্টিনের 'প্রাইড এ্যান্ড প্রেজুডিস' এবং লিও তলস্তয়ের 'ওয়ার এ্যান্ড পীস' উপন্যাসের কথা উল্লেখ করেছেন। মম বলেছেন :

'War and Peace is surely the greatest of all novels. It could only have been written by a man of high intelligence and of powerful imagination. a man with wide experience of the world and a penetrating insight into human nature. No novel with so grand a sweep, dealing with so momentous a period of history and with so vast an array of characters, was ever written before ; nor I surmise, will ever be written again. Novels as great will perhaps be written, but none quite like it. With the mechanization of life, with the state assuming ever greater power over the lives of men, with the uniformity of education. the extinction of class

Dhaka University Institutional Repository

distinctions and the diminution of individual wealth, with the equal opportunities which with be offered to all (if such is the world of the future) men will still be born unequal.'[৩]

সমাজ, সময় ও ইতিহাসের বিচিত্র উপাদানের সম্মিলনে, ঘটনা ও চরিত্রের অভূতপূর্ব বিন্যাসে 'ওয়ার এ্যান্ড পীস' চিরায়ত শিল্পাদর্শের মানে উন্নীত। অর্থাৎ ঔপন্যাসিক যখন নির্লিপ্ত প্রেক্ষণবিন্দু দিয়ে জীবনের সার্বজনীন, সামগ্রিক রূপকে প্রকাশ করেন, তখনই উপন্যাস, মহাকাব্যিক হয়।

সমালোচকদের[৪] বিবেচনায় বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' (১৯০৯) বিভূতিভূষণের 'পথের পাঁচালী' 'অপরাজিত' (১৯২৯) তারশঙ্করের 'গণদেবতা' 'চন্ডীমন্ডপ' 'পঞ্চগ্রাম' (১৯৪৩-৪৪) অন্নদাশঙ্করের 'সত্যাসত্য' (১৯৩২-৪২) সতীনাথ ভাদুড়ীর 'ঢোঁড়াই চরিতমানস' (১৯৪৯-৫১) এবং দেশ বিভাগোত্তর (১৯৪৭) বাংলাদেশের পটভূমিতে রচিত শহীদুল্লা কায়সারের 'সংশপ্তক' (১৯৬৫) আলাউদ্দিন আল আজাদের 'ক্ষুধা ও আশা' (১৯৬৪) আবু জাফর শামসুদ্দীনের 'পদ্মা মেঘনা যমুনা' (১৯৭৪) আবু ইসহাকের 'পদ্মার পালিদ্বীপ' (১৯৮৬) রিজিয়া রহমানের 'বং থেকে বাংলা' (১৯৭৮) ইত্যাদি এপিকধর্মী বা মহাকাব্যিক উপন্যাস।

আমাদের আলোচ্য কালপর্ব যেহেতু ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগ থেকে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীনের পূর্ব পর্যন্ত এবং এই সময় পরিসরে প্রকাশিত মহাকাব্যশৈলীর উপন্যাস , শহীদুল্লা কায়সারের 'সংশপ্তক' এবং আলাউদ্দিন আল আজাদের 'ক্ষুধা ও আশা' । সঙ্গত কারণেই এদুটি উপন্যাসের আলোচনাই আমরা এখানে উপস্থিত করছি।

ভারত বিভাগোত্তর (১৯৪৭-৭১) কালপর্বে বাংলাদেশের ঔপন্যাসিকরা আপন সমাজের সংস্কৃতি, রাজনীতির দ্বন্দ্বময় পরিস্থিতি ও জীবন জিজ্ঞাসার প্রশ্নে মহাকাব্যশৈলীর (epic form) উপন্যাস রচনায় উৎসাহী হন। 'এই নবধারা উদ্ভাবনার পেছনে জাতিসত্তার সমকালীন বহুকৌণিক সংকটচেতনার ভূমিকাই মুখ্য। সময় ও ইতিহাসের পটে ব্যক্তি ও সমষ্টির সংগ্রামশীল জীবন-অবলোকনের মধ্য দিয়ে বাঙালির আত্মসন্ধান, সত্তাসন্ধান ও জাতিসত্তাসন্ধানকে ইতিহাসের মূলধারায় স্থাপন করার ক্ষেত্রে এপিকধর্মী উপন্যাসের উপযোগিতা সর্বাধিক'[৫] সময়ের ক্রমবর্ধমান চাহিদা, মহাকাব্যের এই শিল্পায়তনিক ফর্মকে অনিবার্য করে তুলে ছিল। আলোচ্য কালপর্বে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর রাজনৈতিক সচেতনতা, বাঙালী জাতীয়তাবাদী আন্দোলন জনজীবনকে তরঙ্গায়িত করেছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (১৯৩৯-৪৫), দুর্ভিক্ষ (১৯৪৩), দাঙ্গা (১৯৪৬) দেশ বিভাগের (১৯৪৭) পটভূমিতে ব্যক্তি ও সমষ্টি জীবনের সংকট ও যুগমানস সঞ্চারে শহীদুল্লা কায়সারের 'সংশপ্তক' মহাকাব্যশৈলীর সচেতন শিল্প প্রয়াস। ' আমাদের কথাসাহিত্যে এপিক ফর্মের উপন্যাস রচনায় যে প্রতিশ্রুতি হুমায়ুন কবিরের 'নদী ও নারী'তে উৎসারিত হয়েছিল, শহীদুল্লা কায়সারের (১৯২৬-১৯৭১) 'সংশপ্তক' (১৯৬৫)-এ তার সিদ্ধি। গ্রাম ও নগর জীবনের সুবৃহৎ ক্যানভাসকে উপন্যাসের পটভূমি হিসেবে ব্যবহার করে সামন্ত সমাজের অবক্ষয় এবং মধ্যবিত্তশ্রেণীর উত্থান প্রক্রিয়াকে 'সংশপ্তক'-এ বিন্যাস্ত করেছেন লেখক। যুগচেতনা, শিল্পচেতনা এবং জীবনচেতনার সমন্বিত বিন্যাসে জীবনের সমগ্রতা এ উপন্যাসে হয়ে উঠেছে আন্দোলিত, স্পন্দিত।'[৬] ঔপন্যাসিকের সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণ (omniscient point of view) প্রয়োগই মহাকাব্যশৈলীর উপন্যাসের ক্ষেত্রে সচেতন শিল্পসূত্র। শহীদুল্লা কায়সার, 'সংশপ্তক' উপন্যাসে ঔপন্যাসিকের এই সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণ সফলভাবে প্রয়োগ করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

সংশপ্তক

শহীদুল্লা কায়সারের (১৯২৬-১৯৭১) 'সংশপ্তক' মহাকাব্যশৈলীর শিল্পনিপুণ উপন্যাস। এর গঠন কাঠামো (Structure) উনিশ শতকের ইউরোপীয় উপন্যাসের আঙ্গিক অনুসারী। ঔপন্যাসিকের আত্ম-অনুসন্ধান, তত্ত্ববাসনা ও দ্বন্দ্বময় সমাজপরিস্থিতি কাহিনীর (Plot) প্রাণাবেগকে ক্ষুন্ন করেনি। 'সংশপ্তক' এর বিশাল প্রেক্ষাপট ও বিপুল জীবন প্রবাহের মাঝেও এর কালগত সংহতি অক্ষুণ্ন থেকেছে। শহীদুল্লা কায়সারের কোনোরকম উচ্চাশা 'সংশপ্তক' এর প্লটবিন্যাস ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। দ্বন্দ্ব জটিল সামাজিক পরিস্থিতি সত্ত্বের স্বতঃস্ফূর্ত কার্যকারণসূত্রে এ উপন্যাসের ঘটনাপ্রবাহ বিকাশমান। প্রচলিত প্রথা অনুসারে আমরা 'সংশপ্তক' উপন্যাসের গঠনশৈলী বিশ্লেষণ করতে পারি। উপন্যাসটি দুই ভাগে বিভক্ত, প্রথম ভাগে উপন্যাসের মৌল দ্বন্দ্বের উৎপত্তি ও পরবর্তীতে ঘটনা প্রবাহের ক্রিয়াশীলতার সূচনা ; দ্বিতীয় ভাগে ঔপন্যাসিক আরো বেশি নিরাসক্তভাবে, পরিবর্তিত সমাজ সময়ের প্রেক্ষাপটে চরিত্রের রসপরিণামী সংহতি দিয়েছেন। 'সংশপ্তক' উপন্যাসে শহীদুল্লা কায়সারের সমাজ ভাবনা ও শিল্পবোধ ছিল নির্দ্বন্দ্ব,প্রাগ্রসর ও প্রগতিমুখী। কারণ ঔপন্যাসিকের জীবন সমাজ সমকালের রাজনৈতিক দ্বন্দ্বময় অভিজ্ঞতায় স্নাত (শহীদুল্লা কায়সার ব্যক্তিগত জীবনে বামপন্থি রাজনৈতিক চেতনার অনুসারী ছিলেন) এবং সেই চেতনার মর্মমূল থেকে উৎসারিত চরিত্র জাহেদ, রবীন্দ্রনাথের 'গোরা'র মতই আত্মদ্বন্দ্ব ও সমাজদ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে বিকশিত । বস্তুত, জাহেদই 'সংশপ্তক' (যুদ্ধে জয় লাভ অথবা মৃত্যু,এরূপ শপথকারী সৈন্য।) নামের অর্থকে প্রতীকী ব্যঞ্জনা দান করেছে। 'সংশপ্তক' উপন্যাসের প্রথম ভাগে মৌল দ্বন্দ্ব হচ্ছে অবক্ষয়িত সামন্ত প্রভুর প্রাচীন ঐতিহ্য পুনরুদ্ধার চেষ্টা ও মধ্যবিত্তশ্রেণীর উত্থান প্রচেষ্টা। কাহিনীর এ অংশ গ্রামীণ। উপন্যাসের শুরু হয় শুক্রবার জুম্মার নামাজের শেষে হুরমতির বিচার সভা দিয়ে। অন্যান্যদের মধ্যে প্রধান মিঞা বাড়ির ফেলু মিঞা, রমজান, খতিব সাহেব, কারি সাহেব, তালতলি হাইস্কুলে জুনিয়ার মাস্টার সেকান্দর, লেকু, সতুর বাপ, কসির ও অন্যান্য। বিচার শেষে ফেলু মিঞার নির্দেশে রমজান হুরমতির কপালে পঞ্চম জর্জের প্রতিকৃতিপূর্ণ একটি তামার পয়সা আগুনে তাতিয়ে ছেঁকা দেয়; অবৈধ সন্তান গর্ভে ধারণ করার যথার্থ শাস্তিই বটে। হুরমতির শাস্তি সম্পন্ন হলে এর জন্য দায়ী পুরুষের শাস্তি দাবী জানায় লেকু, তাকে সমর্থন করে সেকান্দর মাস্টার। কিন্তু ফেলু মিঞা সময়ে স্বল্পতার কথা বলে পাশ কাটিয়ে যায়। হুরমতির এ পরিণতির জন্য দায়ী মূল আসামীর কোনো সাজা হয় না।

ঔপন্যাসিক ঘটনা ও চরিত্রের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া রূপায়ণে নাট্যশৈলী (dramatic manner)ও চিত্রশৈলীর (pictorial manner) শিল্প সম্মত সমন্বয় ঘটিয়েছেন। বাকুলিয়া-তালতলির নিস্তরঙ্গ জীবন-প্রকৃতির স্বরূপ উপস্থাপনায় ঔপন্যাসিক কখনো বা বর্ণনাকে (narration) প্রাধান্য দিয়েছেন। যেমন :

> 'বাকুলিয়া আর তালতলি। পাশাপাশি দুটো গ্রাম।
> দু গ্রামকে ফারাক করে রেখেছে বিস্তীর্ণ এক শস্যক্ষেত্র। পাশ তার সোয়া
> মাইল। লম্বায় মাইলেরও উপর। বাকুলিয়ার দক্ষিণে, তাই ক্ষেতটার নাম
> দক্ষিণ ক্ষেত। তলতলির মানুষেরা বলে উত্তরের ক্ষেত।
> বাকুলিয়ার প্রবেশ পথে সৈয়দ বাড়ির সদর ফটক আর বেরুবার পথে মিঞা
> বাড়ির মসজিদ। দুটো খানদানী বাড়ি। দুই প্রহরীর মতো গোটা গ্রামটিকে
> যেন হাতের বেষ্টনে ধরে রেখেছে।' [৮]

Dhaka University Institutional Repository

সৈয়দরা প্রায় সকলেই কলকাতাবাসী, মিঞাদেরও অনেকে কলকাতা থাকে, শুধু ফেলু মিঞা বাকুলিয়াতে রয়েছে। ফেলু মিঞার ইচ্ছে মিঞা বাড়ির অতীত ঐতিহ্য ও ঐশ্বর্যকে ফিরিয়ে আনার, তাই রামদয়ালের কাছ থেকে বন্ধক-দেয়া-তালুক সে ফিরিয়ে পেতে চায়। করিৎকর্মা রমজানকে সে পাঠায় রামদয়ালের কাছে। রামদয়াল, রমজানকে প্রলোভন দেখায় যে, আট হাজারের বেশি যা দাম হবে সেই অতিরিক্ত টাকার অর্ধেক পাবে রমজান। ফেলু মিঞা সাত নম্বর মৌজা কেনার জন্য স্ত্রীর গহনা বিক্রি করেও যখন টাকা হয়না দেখে,তখন রমজানের পরামর্শে বাকী খাজনার জন্য লেকু-কসিরদের চাপ দেয়। খাজনা মিটিয়ে দেয়ার জন্য লেকু-কসির মুরুব্বির ধরে সেকান্দর মাস্টারকে কিন্তু ফেলু মিঞা বকেয়া খাজনা মকুবে সম্মত হয় না। খাজনার দায়ে লেকুর বাদবাকী জমি বন্ধক দিতে হয় রামদয়ালের কাছে। কসিরকে হতে হয় ভিটে-বাড়ি ছাড়া। কসিরের পরিত্যাক্ত ভিটেয় ঘর তোলাকে কেন্দ্র করে রমজান, লেকুর শরীরে দায়ের কয়েক কোপ বসিয়ে দেয়। ফেলু মিঞার ইচ্ছা বিচারটা গ্রামেই সেরে ফেলবে কিন্তু সেকান্দর মাস্টার চায় মামলা করতে। মামলা করতে গিয়ে সেকান্দর মাস্টার বুঝতে পারে,নিজে বি.এ. পাশ করলেও মামলা বিষয়ে তাঁর চেয়ে ফেলু মিঞা বেশ অভিজ্ঞ। উপন্যাসের গতিময় ও ক্রমনির্ধারক উপাদান হচ্ছে প্লট। চরিত্র এবং অন্যান্য উপাদানও উপন্যাসের প্লটকে গতিশীল করতে পারে কিন্তু সেগুলোও অনিবার্যভাবে প্লটেরই অংশ। আধুনিক এপিক শিল্পশৈলীর উপন্যাসে ঘটনা ও চরিত্র প্রায় সমান গুরুত্বে বিবেচিত হয় এবং প্লট অনেকাংশে চরিত্রের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত :

'The epic plot is to a certain extent bespoken by epic characterization. The plot is inherent in the concept of the protagonist, but that concept is not realised in the narrative until this character is expressed through action.'[৯]

সময় এবং সমাজকে 'সংশপ্তক' উপন্যাসের শিল্পায়তনের কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত করলেও সময়শৃঙ্খলার প্রেক্ষাপটে ঘটনা বা চরিত্রের উপর প্লট কোনো নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেনি। '১৯৩৮-১৯৫১ কাল পরিসরের অসংখ্য ঘটনা ও চরিত্রের গতিশীল ও দ্বন্দ্বময় প্রবাহকে শহীদুল্লা কায়সার 'সংশপ্তক' উপন্যাসের বিশাল আয়তনে রূপ দিয়েছেন। সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণের বহুমুখী প্রয়োগে বিচিত্র ঘটনা ও চরিত্র সময়স্বভাবের অন্তর্নিহিত শৃঙ্খলার অনুবর্তী হয়েছে।'[১০] বাকুলিয়া-তালতলির নিস্তরঙ্গ গ্রামীণজীবনে, কাহিনীর এই পটভূমিতে সৈয়দ বাড়ির কলেজ পড়ুয়া ছেলে জাহেদ এসে প্রবেশ করে। ঔপন্যাসিক যেন ক্ষেত্র প্রস্তুত করে মূল চরিত্রকে স্থাপন করলেন। জাহেদ কলকাতা থেকে এসে সেকান্দর মাস্টারকে বোঝাতে থাকে মুসলিমলীগের কার্যাবলী, তার প্রচেষ্টার গড়ে ওঠে সংগঠন। গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে সভা-সমিতি করে জাহেদ, সেকান্দর মাস্টার, ফেলু মিঞা। মালু তাদের সঙ্গী হয়। 'শিকল ভাঙ্গার গান' গেয়ে মালু জাহেদের সভা জমিয়ে তোলে। আত্মদ্বন্দ্ব ও সমাজদ্বন্দ্বের সঙ্গে ঔপন্যাসিক মতাদর্শের দ্বন্দ্বটাও স্পষ্ট করে তোলেন জাহেদ এবং সেকান্দর মাস্টারের কথোপকথনে :

'তুমি মুসলমান কিনা ?

না।

তবে তুমি কে?

মানুষ।

Dhaka University Institutional Repository

অপমান বোধে মুখটা লাল হয়ে আসে জাহেদের। তুমি কি বলতে চাও আমি মানুষ নই?

না। তুমি মুসলমান।

আলবৎ। আমি প্রথমে মুসলমান তারপর মানুষ।

সে জন্যই কি এমন বর্বরের মত আচরণ করছ? গলাটা ছাড় তো এবার।

যেন বিরক্ত হয়েই বলল সেকান্দর।

আমি মুসলমান। আমি মুসলমান।'--------[১১]

সেকান্দর মাস্টার ও জাহেদের কথোপকথনে উন্মোচিত হয়েছে ঔপন্যাসিকের জীবনার্থের পরিচয়। পাশ্চাত্য উপন্যাস তত্ত্ববিদ নরম্যান ফ্রায়াডম্যান এবং পার্সি লুবক উপন্যাসের বিষয়বস্তু ও শিল্পরূপ ব্যাখ্যায় ঔপন্যাসিকের দৃষ্টিকোণকে (point of view) অধিক গুরুত্ব দেন। পার্সি লুবক এর মতে :

'The whole intricate question of method, in the craft of fiction, I take to be governed by the question of the point of veiw - the question of the relation in which the narrator stands to the story.'[১২]

ঔপন্যাসিকের শিল্পকৌশলের জটিলতর বিষয় হচ্ছে দৃষ্টিকোণ। লুবক এর মতে উপন্যাসের আঙ্গিক নিয়ন্ত্রিত হয় 'point of veiw' বা দৃষ্টিকোণের মাধ্যমে। এপিক শিল্পশৈলীর উপন্যাসের ক্ষেত্রে ঔপন্যাসিকের সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণ প্রয়োগ করাই স্বীকৃত শিল্পকৌশল। শহীদুল্লা কায়সার 'সংশপ্তক' উপন্যাসে ঔপন্যাসিকের সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণ প্রয়োগ করেছেন। সমাজ সময়ের যুগমানস সঞ্চার করে 'সংশপ্তক' ঔপন্যাসের মহাকাব্যিক আঙ্গিককে উচ্চকিত করেছে। ১৯৪০ সালে লাহোর প্রস্তাব এবং তার পরবর্তী সময় বাঙালী মসুলমানদের পাকিস্তান আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে মুসলীমলীগের কর্মী জাহেদের বক্তব্য প্রণিধান যোগ্য। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশ বিরোধী সুদীর্ঘ আন্দোলন, দেশ বিভাগোত্তর নানা ঘটনার প্রেক্ষাপটে বাঙালী মুসলমানের আশা ও স্বপ্নভঙ্গের ফলে জাহেদের পাকিস্তান বিরোধী মনোভাব এবং প্রেক্ষার, ঔপন্যাসিকের ক্রমপরিবর্তমান চেতনাকে রূপান্বিত করেছে। সমাজ, পরিবেশের পরিবর্তনের সঙ্গে চরিত্রের মনোভঙ্গির পরিবর্তন কাহিনীর বিকাশকে সংহত করেছে।

জাহেদ এক সভা থেকে এসে শোনে দরবেশ চাচা তার মারফতি দলবল নিয়ে বাড়ি এসেছে এবং পীর গোলাম হায়দার মোজাদ্দেদীর সঙ্গে রাতে রাবুর বিয়ে দেয়া হয়েছে। জাহেদ লেকুদের সহায়তায় পীর ও তার মারফতি দলকে মারপিট করে গ্রাম ছাড়া করে। কন্যা রাবুর আবদার সত্ত্বেও দরবেশ চাচা মারফতি দলের সঙ্গে নিরুদ্দেশ হয়। সৈয়দ পরিবার বাকুলিয়ার মায়া ছেড়ে কলকাতায় চলে যায়। দ্রুত পরিবর্তন শুরু হয় বাকুলিয়ার। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রতিক্রিয়া পড়তে থাকে জনজীবনে।

'সংশপ্তক' এর প্লট গঠনে ঔপন্যাসিক সময় এবং স্থানকে (time and spece) একটি শিল্পমাত্রায় ব্যবহার করেছেন। সময়ের পরিধি ও স্থানের বিশালতা (বাকুলিয়া থেকে কলকাতা এবং পরবর্তীতে ঢাকা - বাকুলিয়া) 'সংশপ্তক'-এর মহাকাব্যিক মহিমাকে সফলতা দান করেছে। কাহিনীর দ্বিতীয় পর্বে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে কলকাতার পটভূমিতে মালুর চোখ দিয়ে পরিবর্তনটা দেখানো হয়। মালু প্রথমে মেসে রান্নার কাজ পেলেও পরে সঙ্গীত শিল্পী হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। কলকাতায় মালু ভিন্ন বাস্তবতার মুখোমুখি হয়। প্রথমে কলকাতায় গিয়ে মালু যে আশ্রয়ে

Dhaka University Institutional Repository

উঠে ১৯৪৬ সালের সাম্প্রাদায়িক দাঙ্গায় সেই আশ্রয় কেড়ে নেয়। হোটেল মালিক শচীনবাবু নিজের জীবন বিপন্ন করে মালুকে পৌঁছে দেয়, পথে মালু দেখতে পায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার শিকার নানা বয়সের মানুষের লাশ। শচীন বাবুর গাড়ি থেকে প্রায় চলন্ত অবস্থায় নেমে পড়ে মালু, রাবুর কলেজ হোস্টেলের কাছে। অশোক মেসের মত এখানেও তার জীবন বিপন্ন হওয়ার উপক্রম, পাড়ার হিন্দু ছেলেদের সহায়তায় এক সময় মালু রাবুরা নিরাপদে পার্ক সার্কাসে সৈয়দ বাড়িতে পৌঁছায়। মালুকে সঙ্গে নিয়ে রাবু,জাহেদের খোঁজে পার্ক সার্কাসের একটি হোটেলে যায়, সেখানে দেখা হয় জাহেদের সঙ্গে। জাহেদ দেশের কাজে আত্মোৎসর্গ করেছে। জাহেদের সংগে মালুও যোগ দেয়। তাদের কাজ হলো ইংরেজের কাছ থেকে স্বাধীনতা লাভের জন্য কাজ করা এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখা। রকীব সাহেবের চেষ্টায় মালু একসময় খ্যাতিমান পল্লীগীতি শিল্পী হয়ে ওঠে।

১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর সৈয়দ সাহেবের পদোন্নতি ঘটে এবং তাকে চলে আসতে হয় ঢাকা। মালুও ঢাকা বেতারের শিল্পী হিসেবে কাজ পায় । রিহানা নামের একটি মেয়ে মালুর প্রেমে পড়ে এবং তারা বিয়ে করে কিন্তু সে বিয়ে খুব সুখকর হয় না। মালু যখন নানা দ্বিধাদ্বন্দ্বে ক্ষত-বিক্ষত তখন রাবু চাকরি ছেড়ে গ্রামে যায়। পিতা দরবেশের সেবার জন্য এবং গ্রামে স্কুলে প্রতিষ্ঠা করে শিক্ষার আলো জ্বালাবার বাসনা নিয়ে রাবু বাকুলিয়া যায়। রেডিওর চাকরী ছেড়ে দিয়ে মালুও এক সময় বাকুলিয়ায় যাত্রা করে। বাকুলিয়া গ্রামে ঢোকার পথে দেখা হয় রমজানের সঙ্গে। অবশ্য তখন সে কাজী মোহাম্মদ রমজান আলী। দেখা হয় সেকান্দর মাস্টারের সঙ্গে এবং বাকুলিয়ার নানা পরিবর্তনের কথা শোনার পর, মহামারির কথা শুনে আতঙ্কিত হয়। রাবুও সে মহামারিতে আক্রান্ত, মাস্টার তার জন্য ঔষধ আনতে শহরে যাচ্ছে। জাহেদ তার ভালোবাসার পাত্রীকে বসন্ত রোগে আক্রান্ত দেখে বিচলিত হয়। জাহেদকে ভালোবেসে অসুখের মধ্যেও প্রলাপ বকে রাবু। জাহেদ, সেকান্দর মাস্টার, লেকু, হুরমতি নিরলস পরিশ্রম করে রাবুকে সারিয়ে তোলে। কয়েকদিন পরই পুলিশ এসে জাহেদকে গ্রেপ্তার করে :

> 'রাবুর দিকে তাকিয়ে হাত তুলল জাহেদ। বলল, আসি।
> অশ্রু টলটল রাবুর চোখ। টপ টপ করে ঝরে পড়ল দুটো ফোটা।
> রাবু হাসল। বলল, এসো।
> সাম্পান পৌঁছে গেছে মাঝ গাঙ্গে। পকেট থেকে রুমাল বের করল
> জাহেদ। উড়িয়ে দিল নিশানের মত। চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলল,
> চিন্তা করিসনে রাবু, আমি আবার আসব। আমি আসব।'[১৩]

২.

'সংশপ্তক' উপন্যাসের এই পরিণতি শহীদুল্লা কায়সারের শিল্পচেতনার পরিচয় বহন করে। উপন্যাসের বিশাল ক্যানভাসে ঔপন্যাসিক আপন শিল্প চৈতন্যের বিকাশ ঘটিয়েছেন সময়োপযোগী বিভিন্ন দৃশ্য ও চরিত্রের উপস্থাপনার মাধ্যমে। ঔপন্যাসিকের তত্ত্ববাসনা সত্ত্বেও চরিত্রগুলো জীবন্ত, বাস্তবানুগ এবং সংগ্রামমুখর। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কিছু পূর্বে উপন্যাসের কাহিনী শুরু হয় এবং শেষ হয়েছে ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্তি লাভের পর দ্বি-জাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তান সৃষ্টির কিছু পরে। অর্থাৎ সময়ের দিক থেকে ১৯৩৮ থেকে ১৯৫১ খুব বেশি নয় কিন্তু বাংলাদেশ তথা উপমহাদেশের প্রেক্ষাপটে এসময়-কাল খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। বস্তুত এই সময় উপমহাদেশে রাজনৈতিক,

Dhaka University Institutional Repository

সামাজিক, অর্থনৈতিক নানা প্রকার পরিবর্তন সূচিত হয়েছিল। বিশ্বযুদ্ধের প্রত্যক্ষ প্রভাব না থাকলেও পরোক্ষপ্রভাব জনজীবনে ব্যাপকভাবে পড়েছিল। ১৯৪৩ এ মন্বন্তর, ঔপনিবেশ বিরোধী আন্দোলন, দ্বি-জাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র ভূখণ্ডের দাবি তথা পাকিস্তান আন্দোলন। ১৯৪৬ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, উপনিবেশের বিদায়, দেশবিভাগ (১৯৪৭) পাকিস্তান রূপী নতুন ধর্মীয় উপনিবেশের পত্তন, ভাষা আন্দোলন (১৯৪৮-৫২), জমিদারী প্রথা বিলোপ (১৯৫০) ঢাকা কেন্দ্রিক নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উত্থান ইত্যাদি যুগচঞ্চল ঘটনা, বাঙালী মুসলমানের আশা ও স্বপ্নভাঙ্গার প্রেক্ষাপটে আর্থ-সামাজিক,রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্য প্রচেষ্টাকে শহীদুল্লাহ্ কায়সার 'সংশপ্তক' উপন্যাসের কাহিনী ক্যানভাসে স্থাপন করেছেন। বাঙালীর স্বাধিকার ও স্বাতন্ত্র্য প্রচেষ্টার পটভূমিতে গ্রাম ও শহর, ঢাকা ও কলকাতা, স্থান ও কালের পরিধি তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে অসংখ্য চরিত্রকে সঙ্গী করে। 'সংশপ্তক' উপন্যাসের প্লট বিন্যাস নির্বন্ধ, সচেতন শিল্পকৌশলে সুনিপুণ। সময় ও সমাজের বিশাল প্রেক্ষাপট ও চরিত্রাবলী, তাদের সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম অংশের উদ্ভাসন 'সংশপ্তক'-এর গঠনশৈলীর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। চরিত্রের মুখে সঙ্গীত ও সংলাপের প্রয়োগ 'সংশপ্তক' উপন্যাসকে স্বচ্ছন্দ গতি দান করেছে। উপন্যাসের সূচনায় হুরমতির লাঞ্ছনা এবং পরিণামী দৃশ্য পুলিশ কর্তৃক জাহেদের গ্রেপ্তার ঘটনা নাটকীয় পদ্ধতিতে বিন্যস্ত করায় 'সংশপ্তক'-এর প্লট বিন্যাস শিল্প সফলতা লাভ করেছে।

ঔপন্যাসিকের জীবনার্থ সন্ধানের মূল উপাদান হচ্ছে চরিত্র। উপন্যাসের কাহিনী-ক্যানভাসে একক, স্বয়ম্ভু বৃক্ষ-চরিত্রই ঔপন্যাসিকের দৃষ্টিকোণ, অবলোকন অভিজ্ঞতা ও অনুভব প্রকাশের, প্রচারের ভার বহন করে। উপন্যাস বিবেচনায় প্রাতীচ্যের উপন্যাসতাত্ত্বিকরা সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন চরিত্রের উপর। ডব্লিউ.জে.হার্ভে-র মতে 'most great novels exist to reveal and explore character.'[১৪]

উপন্যাসকাহিনীতে বিধৃত চরিত্র সমূহ ব্যক্তিত্বময় হয়ে ওঠে ঔপন্যাসিকের সৃজন দক্ষতায়। 'শহীদুল্লা কায়সার তাঁর উপন্যাসের জন্য কোনো নায়ককল্প চরিত্রের ধারণা নিয়ে অগ্রসর হননি। গুণগত দিক থেকে যে সকল চরিত্র সমকালের অন্যান্য মানুষ থেকে অগ্রসর কিন্তু স্বাভাবিকতা অতিরেক নয় 'সংশপ্তক'–এর চরিত্র কল্পনায় এ ধারণারই বিন্যাস ঘটেছে। এই সব স্বাভাবিক, জনজীবনসংলগ্ন অথচ সক্রিয়তা ও সংবেদনশীলতায় সামাজিক নেতৃত্বদানের গুণসম্পন্ন চরিত্রকেই উপন্যাস কাহিনীর কেন্দ্রে স্থাপন করা হয়েছে। নেতৃত্বের গুণ জাহেদ কিংবা সেকান্দর মাস্টার উভয়ের মধ্যেই বিদ্যমান। কিন্তু জাহেদের চিন্তা ও কর্মের যে দ্বন্দ্বময় অগ্রগতি লক্ষ করা যায়, সেকান্দর মাস্টারের ক্ষেত্রে তেমন ঘটে না। জাহেদের চেতনা ও কর্মের সৃংগে নির্দিষ্ট কালখন্ডের সমাজ মানসের সঙ্গতি বিদ্যমান। সেকান্দর মাস্টার গোড়া থেকেই মীমাংসিত এবং ঔপন্যাসিকের জীবনবোধের আদর্শরূপ হিসেবে উপস্থাপিত।'[১৫] জাহেদ প্রথমে মুসলিম লীগের দৃষ্টিতে জীবন ও জগতকে দেখে; অনেকটা রবীন্দ্রনাথের প্রথম পর্বের 'গোরা' যেমন হিন্দুর চোখ দিয়ে ভারতবর্ষের স্বাধীনতাকে দেখেছিল। পরে আত্মদ্বন্দ্ব ও সমাজদ্বন্দ্বের রক্তাক্ত অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে জাহেদ প্রগতিশীল রাজনৈতিক চেতনার অগ্নিপুরুষে পরিণত হয়। চরিত্র পরিকল্পনায় তারাশঙ্করের 'গণদেবতা' 'পঞ্চগ্রাম'-এর দেবু ঘোষ, শ্রীহরি পাল এর সঙ্গে শহীদুল্লা কায়সারের সেকান্দর মাস্টার,ফেলু মিঞা, জাহেদের অনেক মিল খুঁজে পাওয়া যায়। তবে সময় ও সমাজদ্বন্দ্বের স্বরূপ বাস্তবতায় তারাশঙ্কর গান্ধীবাদী আর শহীদুল্লা কায়সারের চরিত্রগুলো সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতায় বিশ্বাসী। উপন্যাসের শুরুতে যে কর্মচঞ্চল জাহেদকে দেখা যায়, কাহিনীর পরিণতিতে সে হয়ে পড়ে ম্লান। জাহেদ,রাবুর প্রেম গোপন থাকে না, প্রথাগত রোমান্টিক চরিত্র হয়ে উঠে

Dhaka University Institutional Repository

জাহেদ। মালুর চরিত্র ব্যাপকভাবে ভাববাদী। ঢাকা বেতারের জনপ্রিয় সঙ্গীত শিল্পী মালু প্রেম করে রিহানাকে বিয়ে করে কিন্তু রিহানার উপর নিজের অধিকারকে ব্যক্তিত্ব দিয়ে প্রতিষ্টা করতে পারেনি। রিহানার আচরণে ক্ষুব্ধ মালু জাহেদের চিঠি পেয়ে বাকুলিয়ায় ফিরে আসে এবং রাবুর কথায় সে জাহেদের সহকর্মী হয়ে যায়। সৈয়দ পরিবারের অন্যান্য চরিত্র-আরিফা,সৈয়দ গিন্নি, সৈয়দ সাহেব উপন্যাসের ঘটনাংশে গৌণ চরিত্র। সেকান্দর মাস্টারের চরিত্রটি ব্যতিক্রমী। তার জীবন উপলব্ধি, আদর্শ, কর্মতৎপরতা, মহাভারতের সেই সংশপ্তকদের মিথিক চরিত্রের মাত্রা পায়। ফেলু মিঞা ক্ষয়িষ্ণু সামন্ত চরিত্রের যোগ্য প্রতিনিধি কিন্তু রমজান চরিত্রবৈশিষ্ট্যের দিক থেকে সামন্ত হলেও নীতি আদর্শে বুর্জোয়া শ্রেণীর সফল প্রতিনিধি। উপন্যাসে লেকু, কসির, হুরমতি জীবনযুদ্ধে দুঃখজয়ী। কোনো বঞ্চনাই তাদের বঞ্চিত করতে পারে না। বঞ্চনার পথ ধরেই তারা মহাপ্রাপ্তির দিকে এগিয়ে যায়। তাদের জীবনমুখী সংগ্রাম জীবনজয়ী করে তুলেছে।

৩.

উপন্যাসের শৈলী বিচারে ভাষা একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। ভাষা মানুষের ভাব প্রকাশের প্রধান বাহন। রচয়িতা ভাষার লিখিত রূপের মাধ্যমে পাঠকের অনুভূতির আঙ্গিনায় নিজের ভাবকে পৌছে দেন। তাই সাহিত্যাঙ্গিকের নানা মাধ্যম-কবিতা, গল্প,উপন্যাস, নাটক ইত্যাদির ভাষা ও বাক্যের গঠন বিভিন্ন। সাহিত্যাঙ্গিকের এই বিভিন্ন রূপের ভাষার বিজ্ঞান ভিত্তিক বিশ্লেষণ বেশ দুরূহ। দুরূহ বলেই বাংলা সমালোচনা সাহিত্যে শৈলী বিজ্ঞান আজো অবিকশিত। শৈলী বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে, ব্যক্তি ভেদে তার শব্দ প্রয়োগ, বক্যগঠনের ভিন্নতা পরিসংখ্যান ও গ্রাফের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়। বাক্যের দীর্ঘতা ও হ্রস্বতা, তৎসম, তদ্ভব, দেশি, বিদেশি শব্দ প্রয়োগের হারও শৈলীবিজ্ঞানে বিশ্লেষিত হয়। 'শব্দের মালা গেঁথেই সৃষ্টি করা হয় বাক্য। সুতরাং শৈলী চর্চায় শব্দের পাশাপাশি বাক্য গঠনের প্রতিও দৃষ্টিপাত প্রয়োজন।'[১৬] আমরা জানি উপন্যাস একটি বিমিশ্র শিল্পাঙ্গিক। উপন্যাসের আঙ্গিকের মধ্যেই রয়েছে সেই সম্ভাবনা,যাতে অবলীলায় স্থান করে নিতে পারে কবিতা,গান,নাট্য,সংলাপ, বর্ণনা, বিবরণ-ভাষ্য, সব কিছু। সুতরাং সব উপন্যাসের ভাষাশৈলীর বিচার এক পদ্ধতিতে করা যায় না। শৈলীবিজ্ঞানের বিভিন্ন নিরিখ বিভিন্নভাবে প্রয়োগ করে একেকটি উপন্যাসের ভাষাশৈলী একেক ভাবে বিশ্লেষণ করাই স্বীকৃত পদ্ধতি।

উপন্যাস যেহেতু বিমিশ্র শিল্পমাধ্যম, সেহেতু 'সংশপ্তক' এর মহাকাব্যিক শিল্পাঙ্গিকের মধ্যে রয়েছে বিচিত্র ভাষা-ভঙ্গির প্রয়োগ। 'সংশপ্তক'-এর ঘটনা ও চরিত্রের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া রূপায়ণে ঔপন্যাসিক ব্যবহার করেছেন চিত্রশৈলী (pictorial manner),বিশ্লেষণশৈলী (analytical manner), সংলাপনির্ভর নাট্যশৈলী (dramatic manner) এবং বর্ণনা (narration).

চিত্রশৈলী (Pictorial manner) :

> 'বিরাট বটের অসংখ্য শিকড় যেমন এঁকে বেঁকে মাটির ভেতর ছড়িয়ে যায়, মাটির সাথে অচ্ছেদ্য বন্ধনে ধরে রাখে বিশাল মহীরুহকে, রস সিঞ্চন করে প্রতিনিয়ত, তেমনি ওই গাঙ আর ছোট ছোট খালগুলো তালতলি বাকুলিয়াকে ধরে রেখেছে অসংখ্য বাহুর আলিঙ্গনে। রসে ভরে যায় তালতলি বাকুলিয়ার মাটি, বৃষ্টি বন্যার পানি আর আবর্জনা বয়ে নিয়ে অটুট রাখে দুগ্রামের স্বাস্থ্যশ্রী।'[১৭]

Dhaka University Institutional Repository

এখানে ঔপন্যাসিক বাকুলিয়া ও তালতলির স্বাস্থ্যশ্রীর কথা বলতে গিয়ে গাঙ ও ছোট ছোট খালগুলোকে বটগাছের সঙ্গে তুলনা করেছেন। বটগাছের চিত্রকল্প উপস্থাপন করতে গিয়ে ঔপন্যাসিক কমা (')র সাহয্যে দীর্ঘ বাক্য ব্যবহার করেছেন। তাঁকে সাহায্যেনিতে হয়েছে অসমাপিকা ক্রিয়ার।

ক. ভেতরে ছড়িয়ে যায়

খ. অচ্ছেদ্য বন্ধনে ধরে রাখে

গ. রস সিঞ্চন করে প্রতিনিয়ত

ঘ. বাকুলিয়াকে ধরে রেখেছে

বাক্যের রূপবন্ধ দীর্ঘ করতে হলে অসমাপিকা ক্রিয়ার প্রয়োগ অনিবার্য। চিত্রকর যেমন ছবি আঁকার জন্য তুলি চলিষ্ণু রাখে, তেমনি ঔপন্যাসিক চিত্ররীতি প্রয়োগ করতে গিয়ে অসমাপিকা ক্রিয়া দিয়ে ভাবকে চলিষ্ণু রেখে বাক্যকে দীর্ঘ করেছেন।

বিশ্লেষণশৈলী (Analytical manner) :

> 'কিছুদূর এগিয়ে ফেলু মিঞা উদাস চোখে তাকায় সমনের দিকে যেখানে একটি রূপোর সুতোর মতো চিকচিক করছে বড় খাল। ওই খালের এপার-ওপার একদা সবটাই ছিল মিঞাদের সম্পত্তি। তালতলি,চাটখিল, সুলতানপুর এসব গ্রাম ছিল মিঞাদেরই জমিদারীর অংশ। কিন্তু কর্নওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় কেমন করে যে জমিদারীটা বেহাত হয়ে যায়, সে ইতিবৃত্ত এখানো উদ্ধার করতে পারেনি ফেলু মিঞা। শুধু শুনেছিল প্রাচীন সম্পত্তি পূর্নবার বন্দোবস্ত নেবার মতো নগদ টাকা নাকি ছিল না তাদের দুর্ভাগা পূর্বপুরুষদের হাতে।'[১৮]

এখানে ফেলু মিঞাদের হারিয়ে যাওয়া প্রাচীন ঐতিহ্যের ব্যাখ্যায় ঔপন্যাসিক বিশ্লেষণরীতি প্রয়োগ করেছেন। যেমন- ফেলু মিঞার ভাবনা বিশ্লেষণ -'কেমন করে যে জমিদারীটা বেহাত হয়ে যায়'- এর কারণ বিশ্লেষণ করতে ব্যবহার করতে হয়েছে- 'পুর্নবার বন্দোবস্ত নেবার মতো নগদ টাকা নাকি ছিলনা' পূর্বপুরুষদের। স্বগতোক্তির মতো ফেলু মিঞার মনোবিশ্লেষণের মাধ্যমে ফুটে উঠেছে তার বর্তমান ক্ষয়িষ্ণু অবস্থা এবং 'রূপোর সুতোর মতো চিকচিক' বড় খালের এপার-ওপারের হারানো সম্পত্তির বেদনা।

নাট্যশৈলী (Dramatic manner) :

> 'হারামজাদী ছিনাল।
>
> বজ্জাত মাগী।
>
> খানকী বেইশ্যা।.. ..
>
> এই কসবী হারামজাদী; ঘোমটা দে। ধমকে উঠে ফেলু মিঞা।
>
> .. ..
>
> আবার দেমাক দেখো না? কিরে খানকি মাগী 'যারবা' পেটে নেবার সময় খেয়াল ছিল না? দেমাগটা তখন কোথায় ছিল? মুনিবের চেয়ে কণ্ঠস্বর আর এক ডিগ্রি চড়া করে খিঁছিয়ে ওঠে রমজান।'[১৯]

'সংশপ্তক' উপন্যাসের শুরুতে হুরমতি বিচার সভার নাটকীয় আয়োজনের সঙ্গে সংলাপের এব্যবহার গ্রামীণ সমাজ/ বাস্তবতাকে তীব্রতর করেছে।

Dhaka University Institutional Repository

সংলাপের শব্দ ও বাক্যবন্ধনে স্পষ্ট, চরিত্রের সামাজিক অবস্থান এবং ভাষার আঞ্চলিকশৈলী। কারণ ব্যক্তির ব্যবহৃত ভাষার ভেতরেই রয়ে যায় সেই নির্দিষ্ট বাস্তাবতার সংকেত। হুরমতির উদ্দেশ্যে ছুঁড়ে দেয়া ফেলু মিঞার ভৎসনা বা গালিতে ব্যবহৃত শব্দ উৎস :

সংস্কৃত : ছিনাল, বেইশ্যা

ফার্সী : বজ্জাত, খানকী, দেমাক, খেয়াল, হারামজাদী

অসমীয়া : কসবী

বাংলা : ঘোমটা, পেট।

'সংশপ্তক' উপন্যাসের চরিত্রসমূহের সংলাপের ভাষা বিচারের ক্ষেত্রে নিম্ন ছকটি লক্ষ্য করা যায় :

চরিত্র	স্ত্রী/পুরুষ	পেশা	শিক্ষাগত যোগ্যতা	সম্প্রদায়	কোন অঞ্চলের অধিবাসী
ফেলু মিঞা	পুরুষ	জমিদারী	অস্পষ্ট	মুসলিম	নোয়াখালী
রমজান	পুরুষ	পেয়াদা/ ব্যবসায়ী	অস্পষ্ট	মুসলিম	নোয়াখালী
জাহেদ	পুরুষ	ছাত্র/নেতা	শিক্ষিত	মুসলিম	নোয়াখালী
সেকান্দর মাস্টার	পুরুষ	চাকুরীজীবী/ নেতা	শিক্ষিত	মুসলিম	নোয়াখালী
লেকু	পুরুষ	দিনমজুর	অশিক্ষিত	মুসলিম	নোয়াখালী
দরবেশ চাচা	পুরুষ	বাউন্ডেলে	শিক্ষিত	মুসলিম	নোয়াখালী
মালু	পুরুষ	সঙ্গীত শিল্পী	স্বল্পশিক্ষিত	মুসলিম	নোয়াখালী
হুরমতি	স্ত্রী	মহিলা শ্রমিক	অশিক্ষিত	মুসলিম	নোয়াখালী
রাবু	স্ত্রী	ছাত্রী/চাকুরীজীবী	শিক্ষিত	মুসলিম	নোয়াখালী
আরিফা	স্ত্রী	গৃহিনী	শিক্ষিত	মুসলিম	নোয়াখালী
সৈয়দ গিন্নী	স্ত্রী	গৃহিনী	অস্পষ্ট	মুসলিম	নোয়াখালী
রিহানা	স্ত্রী	গৃহিনী	শিক্ষিত	মুসলিম	ঢাকা
রাম দয়াল	পুরুষ	জমিদারী	স্বল্পশিক্ষিত	হিন্দু	নোয়াখালী
শচীন বাবু	পুরুষ	শিল্পী	স্বল্পশিক্ষিত	হিন্দু	কলকাতা

আমাদের বিবেচনায় 'সংশপ্তক' উপন্যাসের প্লট এবং স্থান-কালগত গঠন- বিন্যাস এরূপ কল্পিত :

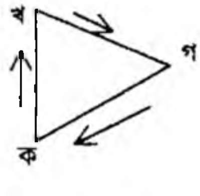

'ক'= উপন্যাসের কাহিনীর উৎসভূমি- বাকুলিয়া। 'খ'= সময় ও সমানুবাস্তবতার অনিবার্য কারণে কুশিলবদের কলকাতা গমন, বিশ্বযুদ্ধের প্রভাব, দাঙ্গা ইত্যাদি সমাজ ও রাজনীতির দ্বন্দ্ব অবলোকন, 'খ'- কলকাতা। দেশবিভাগের প্রেক্ষাপটে কুশিলবদের ঢাকায় প্রত্যাবর্তন; 'গ'- ঢাকা। কাহিনীর বাস্তব প্রয়োজনে, এ্যারিষ্টেটোলীয় ত্রিনীতি সূত্রে- দ্বন্দ্ব, বিকাশ,পরিণতির জন্য ঘটনাংশ বাকুলিয়ায় ফিরে আসে।

Dhaka University Institutional Repository

ক্ষুধা ও আশা

শিল্প বিপ্লবের পর পণ্যের উৎপাদন বিপণন-বাণিজ্যেক কেন্দ্র করে গড়ে উঠে শহর, ভেঙ্গে পড়ে কৃষি নির্ভর গ্রামীণ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে এপ্রক্রিয়া আরো তীব্রতর হয় এবং বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে উনিশ'শ তেতাল্লিশের মন্বন্তরের পটভূমিতে বেঁচে থাকার ন্যূনতম আশায় ব্যাপকভাবে গ্রামীন মানুষ শহরের দিকে যাত্রা করে। বিচিত্র পেশা আর বিপুল সমারোহ নিয়ে স্ফীতকায় হয়ে উঠে নগর। বিশ্বযুদ্ধের প্রত্যক্ষ প্রভাব না পড়লেও যুদ্ধের পরোক্ষ প্রভাবে এদেশের জনজীবনে নেমে আসে অকস্মাৎ বিপর্যয়। কারণ উপমহাদেশ তখনো ছিলো ব্রিটিশ শাসনের অধীনে। বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন উনিশ'শ তেতাল্লিশে খরায় ব্যাপক ফসলহানীতে দেখা দেয় প্রচন্ড খাদ্যাভাব, সংগঠিত হয় শতাব্দীর সবচেয়ে ভয়াবহ মন্বন্তর। মন্বন্তরে মারা যায় লাখ লাখ মানুষ। সমকালের এই অভিজ্ঞতাকে অঙ্গীকার করে আলাউদ্দিন আল আজাদ (জন্ম-১৯২২) রচনা করে তাঁর মহাকাব্যিক উপন্যাস 'ক্ষুধা ও আশা' [২০]। এ উপন্যাসের পটভূমি বর্ণনা করতে গিয়ে আলাউদ্দিন আল আজাদ বলেন- 'আমরা যুদ্ধ দেখেছি। দেখেছি ধ্বংস, সকল নৈতিকতা ও মূল্যবোধের অপমৃত্যু, দুর্ভিক্ষ। তারপর তথাকথিত স্বাধীনতা। আর চক্রান্তের রাজনীতি বহুরূপি চরিত্র; ফলে আশা ভঙ্গ, হতাশা, নৈরাশ্য। এমন প্রাচুর্যের দেশেও দুর্ভিক্ষে লাখে লাখে মানুষ প্রাণ দিয়েছে কিন্তু পরাধীনতার কবল থেকে মুক্তি পেয়েও সে দুর্ভিক্ষকে জয় করতে পারিনি।'[২১] মন্বন্তরকে উপন্যাসের কেন্দ্রে স্থাপন করে আলাউদ্দিন আল আজাদ 'ক্ষুধা ও আশা' উপন্যাস ব্যক্তি ও সমষ্টির জীবনকে অবলোকন করেছেন।

প্রচলিত মহাকাব্যশৈলীর উপন্যাস হলেও 'ক্ষুধা ওআশা' উপন্যাস আলাদা মনোযোগ দাবী করে। 'এপিক এর সাথে এর সামঞ্জস্যের ক্ষেত্রেও ব্যবধান আছে- যেমন ব্যবধান 'ইলিযাড' এবং 'ওডিসি'র মধ্যে। 'ইলিয়াডে' বিষয় ঘটনা এবং চরিত্রের ব্যাপ্তি, ওডেসিতে ব্যক্তির অভিজ্ঞতার প্রসারতা ও গভীরতা। 'ক্ষুধা ও আশা' ব্যক্তির গভীরতর অন্তর্জীবনের এপিক।'[২২] 'ক্ষুধা ও আশা' তাই দুর্ভিক্ষ-লাঞ্ছিত গ্রাম থেকে শহরে বাঁচার অভিপ্রায়ে আসা কেবল হানিফ পরিবারের কাহিনী নয়, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ প্রভাবিত, ক্ষুধা ও দুর্ভিক্ষ পীড়িত বাংলাদেশের সমাজজীবনের কথকতাও।

২.

'ক্ষুধা ও আশা' প্রধাণত এপিক কর্মের উপন্যাস হলেও এর প্লট বিন্যাস, চরিত্রায়ন, ঘটনার কার্যকারণ শৃঙ্খলা নির্মাণে ঔপন্যাসিক নির্দ্বন্দ্ব ছিলেন না। উপন্যাসের চরিত্রগুলো সময়শাসিত, ঘটনানিয়ন্ত্রিত। ক্ষুধা তাদেরকে তাড়া করেছে, ঘটনা যেন চরিত্রকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। ঔপন্যাসিক সময়ের বাস্তবতাকে অধিক গুরুত্ব দিতে গিয়ে, চরিত্রের প্রতি যত্নশীল হতে পারেননি। অথচ উপন্যাসকে জীবন বাস্তাবতার শিল্পরূপ হতে গেলে চরিত্রকে গুরুত্ব দিতে হয়, উপন্যাস কাহিনীতে বিধৃত চরিত্রের মাধ্যমে ঔপন্যাসিকের জীবনসংক্রান্ত বোধ ও অভিজ্ঞতা প্রকাশ পায় এবং ঔপন্যাসিক তার সৃজনীশক্তি দিয়ে চরিত্রের উপর ব্যক্তিত্ব আরোপ করেন :

'The term character refers to one of the persons in the story the end product of the writer's effort to create a distinct personality. charectarization. on the other hand refers to the means of author employs to creat the the sum of traits and actions which constitute character.'[২৩]

ঔপন্যাসিকের জীবনার্থ সন্ধান ও রূপকল্প নির্মার্ণের প্রধান উপাদান চরিত্র। ঘটনার তাৎপর্যময় শৃঙ্খলা নির্মাণের ক্ষেত্রেও চরিত্রের ভূমিকাই মূখ্য। 'ক্ষুধা ও আশা' উপন্যাসের কোনো চরিত্র ঔপন্যাসিকের হাতে তেমন পরিচর্যা পায় নি। ঔপন্যাসিকের একমাত্র লক্ষ্য সময়-বাস্তবতার স্বরূপ উন্মোচন। তাই ক্ষুধাতাড়িত হানিফ পরিবারের পাশে স্থাপন

Dhaka University Institutional Repository

করেছেন চৌধুরী পরিবারের জীবনপ্যাটার্ন। হানিফ পরিবারের রয়েছে পেটের ক্ষুধা সঙ্গতিপূর্ন চৌধুরী পরিবারের ছেলে বাদশার রয়েছে যৌনক্ষুধা। তাই জহু কাজের সন্ধানে চৌধুরী বাড়িতে গেলে বাদশা বলে :

'আমার লগে ওপরে যাইবে তুই ?
ট্যাহা দিমু।'[২৪]

এবং মায়ের মার খেয়ে জহু বাদশার ঘরে আশ্রয় নিলে বাদশা তাকে ধর্ষণ করে এবং শেষবার ধর্ষণে সময় জহু অজ্ঞান হয়ে গেলে তাকে অন্য জায়গায় স্থানান্তর করে । উপন্যাসের কাহিনী বিন্যাসে এ ঘটনা তাৎপর্যপূর্ন। দুর্ভিক্ষ পীড়িত, সংকটদীর্ণ সময়ের প্রেক্ষাপটে ব্যক্তি ও সমষ্টির জীবন কিভাবে বিপর্যস্ত হয়, তার স্বরূপ অবলোকনের শিল্প বিন্দুকে আলাউদ্দিন আল আজাদ 'ক্ষুধা ও আশা' উপন্যাসের কেন্দ্রে স্থাপন করেছেন। প্রথাগত আঙ্গিকের অনুসরণ সত্ত্বেও 'ক্ষুধা ও আশা'য় ঔপন্যাসিকের অঙ্গীকারের পরিধি যুদ্ধোত্তর শিল্পরীতি পর্যন্ত প্রসারিত। দৃষ্টিকোণ ও পরিচর্যা, প্লটবিন্যাস, চরিত্রায়ণ, সময়ের ব্যবহার এমন কি ভাষারীতি প্রতিটি ক্ষেত্রেই যুদ্ধোত্তর নব আঙ্গিকের অনুসরনের পরিচয় সুস্পষ্ট।'[২৫] কল্লোল (১৯২৩) এর সাহিত্য রুচি ও মার্ক্সীয় জীবন দৃষ্টি আলাউদ্দিন আল আজাদ 'ক্ষুধা ওআশা' উপন্যাসের বিষয়ভাবনা ও জীবন ঘনিষ্ট রূপ নির্মাণে সাহায্য করেছে। উপন্যাসটির শুরু হয়েছে এভাবে :

'ভোরের আলো ফোটার আগে,শেষ রাতের অন্ধকারে বেরুবার সময়
ছিল এক পরিবার, কিন্তু সূর্য ওঠার পর কয়গ্রাম পিছনে ফেলে তেরাস্তার
বটগাছের তলায় এলে রীতিমতো এক জনতা। বটগাছটা যেন সাত
গাঁয়ের সীমারেখা;এখান থেকেই শুরু হয়েছে ডিষ্ট্রিকট্ বোর্ডের সড়ক।'[২৬]

অভাবের তাড়নায় অনাহার ক্লিষ্ট মানুষ বেঁচে থাকার অনিবার্য প্রয়োজনে শহরের দিকে যাচ্ছে। গ্রাম তাদের কাছে মন্বন্তর,ক্ষুধা;শহর তাদের কাছে স্বপ্ন, বাঁচার একমাত্র আশা। ক্ষুধা থেকে বাঁচার জন্য স্বপ্নময় আশা নিয়ে গ্রাম থেকে শহর অভিমুখি একটি পরিবার বাবা: হানিফ, মা: ফাতেমা, পুত্র: জোহা, কন্যা: জোহু-কে নিয়ে উপন্যাসের প্লট বিন্যস্ত। ঔপন্যাসিক কাহিনীর পটভূমিতে রেয়েছেন মন্বন্তর এবং কৃষিভিত্তিক গ্রামীন পরিবেশ থেকে বৃন্তচ্যুত নিরন্ন জীবন। ক্ষুধাকে পেছনে ফেলে যন্ত্রণাক্লিষ্ট গ্রামের স্মৃতিকে অতিক্রম করে অনেক কষ্টে হানিফ পরিবার ট্রেনে চ্‌কেড় শহরে পৌছে। প্রথমে ফুটপাতে, পরে বস্তিতে মাসিক দু'টাকায় ভাড়ায় একটা হোগলার বেড়া দেয়া ঘরে তারা ওঠে। জোহা কাজের সন্ধানে, খাদ্যের সংস্থানে বের হয়। ফাতেমা ও মেয়ে জোহু কাজ নেয় চৌধুরী মঞ্জিলে। একদিন বুড়ো হানিফ ঘর থেকে বের হয় কিন্তু আর ঘরে ফেরার পথ খুঁজে পায় না। নগর পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য সরকারী লোকেরা বুড়ো হানিফকে ট্রাকে তুলে নগরের বাইরে নিয়ে যায়। বিকেলে বস্তিতে ফিরে স্বামী হানিফকে না দেখে ফাতেমা মেয়ে জোহুকে মারধর করে। জোহু ঝড় বৃষ্টির মধ্যে দৌড়ে গিয়ে ওঠে বাদশার বাড়িতে। সে রাতে বাদশা তাকে দু'বার ধর্ষণ করে। সংজ্ঞাহীন অবস্থায় বাদশার নির্দেশে হোসেন,জোহুকে ছোরার ভয় দেখিয়ে নিয়ে যায় অন্য ঠিকানায়। জ্ঞান ফিরলে জোহু দেখতে পায় অনেক বিছানা পাতা। রাতের বেলায় কতগুলো মেয়েকে সাজিয়ে কোথায় নিয়ে যাওয়া হয় এবং ভোর রাতে আবার নিয়ে আসে। শেষ পর্যন্ত জোহুকেও এই কাজে বাধ্য করে।

Dhaka University Institutional Repository

এদিকে বাবা হানিফকে খোঁজার জন্য জোহা তিন সঙ্গীকে নিয়ে বের হয়, কিন্তু সেও হানিফের মত সরকারী পরিচ্ছন্ন অভিযানের শিকার হয়ে ট্রাকে ওঠে, পরে নারায়নগঞ্জের পথে ছাড়া পায় এবং ফেরার পথে দুর্ঘটনায় নিহত পিতার ছিন্নভিন্ন লাশ দেখতে পায়। পিতার মৃত্যুর খবর প্রথমে মাকে জানাতে ভরসা পায় না জোহা, পরে চৌধুরী কন্যা লীনার পরামর্শে পিতার নিহত হওয়ার খবর মাকে জানায়। হানিফ পরিবারের কাহিনীর আরো হৃদয়গ্রাহী করার জন্য লেখক শাখা কাহিনী হিসেবে চৌধুরী পরিবারকে এনেছেন। লেখক সম্ভবত একটানা ক্ষুধা-দারিদ্র, মৃত্যু, নিপীড়ন ইত্যাদির বর্ণনায় স্বস্তি পাচ্ছিলেন না, তাই চৌধুরী কন্যা লীনা,সেলিনা এবং মোহাম্মদ আলীর প্রেমের উপাখ্যান যুক্ত করেন। অবশ্য এ পরিবারটির মাধ্যমে লেখক সমকালীন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর স্খলন,পতন, রাজনৈতিক অবস্থান ও চিন্তা/ চেতনাকে স্পর্শ করেছেন। কলেজের ছাত্রী লীনা ভালোবাসে মোহাম্মদ আলীকে, কিন্তু আলী অরুণের বোন সুজাতার প্রেমে পড়ে তাকে পাওয়ার জন্য আকুল। রাজনীতিতে লীনার বড় ভাই রেজা, আলীকে সহ্য করতে পারে না। কারণ, সে মুসলিম লীগ করলেও দলের সব সিদ্ধান্ত প্রশ্নহীনভাবে মেনে নিতে পারে না। রেজা ভবিষ্যতে পাকিস্তানের মন্ত্রী হবার আশায় রাজনীতি নিয়ে মেতে থাকে। এদিকে আলীকে ডেকে সুজাতার বাবা উকিল অঘোরবাবু সুজাতার সঙ্গে তাকে মিশতে নিষেধ করে। অপর দিকে লীনার বাবা একরাতে মেয়ের বিয়ের প্রস্তাব করে এবং যথারীতি পিতার নির্বাচিত পাত্রকে লীনা বিয়ে করে কিন্তু বাসর রাতে লীনা আলীর দেয়া মালা গলায় পরে ঘুমের বড়ি খেয়ে আত্মহত্যা করে। এদিকে ফাতেমা শহরে আসার সময় গর্ভে যে সন্তান নিয়ে এসেছিল, তার ভূমিষ্ট হতে আর বিলম্ব নেই। সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে জোহাকে নিয়ে সে গ্রামের বাড়ি ফিরে যেতে চায়-

'দেশে হয়ত তখন নতুন ধান উঠেছে।'

গ্রামে ফেরার আগে জোহাকে খুঁজে বের করা দরকার। জোহুকে খুঁজতে জোহা চট্টগ্রামে যায় এবং পতীতা পল্লীতে সে অনেকটা জোহুর মত একটা মেয়েকে দেখতে পেয়ে, তার সঙ্গে কথা বলে। মেয়েটির দেয়া তথ্য অনুসারে যে পথে ট্রাকে মিলিটারি ছাউনিতে মেয়েদের নিয়ে যাওয়া হয় সে পথের পাশে দাঁড়ায়। অন্ধকার রাত্রিতে পাহাড়ি পথে হাঁটতে গিয়ে সে প্রসব বেদনায় অস্থির এক রমনীকে দেখে এবং তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে যায়। জোহা তাকে নিয়ে শহরের হাসপাতালের উদ্দেশ্যে হাঁটতে থাকে, কিন্তু পথেই ঐরমনীর সন্তান ভূমিষ্ট হয়ে যায়। জোহা দেশলাই জ্বেলে শুকনো পাতা দিয়ে আগুন জ্বেলে উত্তাপ দেয় নবজাতককে। একসময় জোহা বুঝতে পারে সদ্য প্রসবিনীর এই সন্তান বৈধ নয়, তবু সে প্রসবিনীকে নিজের গায়ের কম্বল দেয়, কম্বলের একটি অংশ দিয়ে সদ্যজাত শিশুকে গরম রাখে। উপন্যাসের এ পরিণতিতে দেখা যায় কিশোর নায়ক জোহা নতুনের প্রতি আগ্রহে মানবতার মহান আদর্শের আলো সঞ্চার করে, সে প্রভাতের আলোর প্রতীক্ষা করে।

কৃষিজীবন থেকে উম্মূলিত হানিফ পরিবারের সন্তান, কিশোর জোহার জীবন অভিজ্ঞতার দর্পনে প্রতিবিম্বিত হয়েছে সময়ের ক্ষতবিক্ষত ছবি, তবু সে নতুন জীবনের সহযাত্রী, নতুন আলোর প্রত্যাশী।' ঔপন্যাসিকের সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণের সঙ্গে জোহার অবলোকন ও উপলব্ধির সমন্বয় 'ক্ষুধা ও আশা'র শিল্পীশৈলীকে করেছে অভিনব ও স্বতন্ত্র। দুর্ভিক্ষের আগ্রাসী টানে হানিফ, ফাতেমা এবং তাদের দুই সন্তান জহু এবং জোহা গ্রাম জীবনমূল ছিন্ন হয়ে শহরের দিকে ধাবিত হয়। কিন্তু একমাত্র জোহা ছাড়া পরিবারের অন্য সবাইকে গ্রাস করে কংক্রিকেটর শহর।'[২৭]

Dhaka University Institutional Repository

তুলনায় শহীদুল্লা কায়সারের 'সংশপ্তক' সময় ও ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে বিশাল আয়তনের বহির্বাস্তবতার মহাকাব্যিক উপন্যাস, অন্যদিকে 'ক্ষুধা ও আশা' মন্বন্তরের পটভূমিতে সময়ের সংকটদীর্ণ ব্যক্তির অন্তর্বাস্তবতার এপিক উপন্যাস। চরিত্রের উপলব্ধি ও অন্তঃভাষ্য প্রয়োগে ঔপন্যাসিক চিত্রশৈলীর (pictorial) সঙ্গে প্রতীকশৈলীর (Symbolic treatment) পরিচর্যা করেছেন। উপন্যাসের তৃতীয় পরিচ্ছদে জোহুর ধর্ষিত হওয়ার মুহূর্তে প্রকৃতির চিত্রকে প্রতীকী ব্যঞ্জনায় উপস্থিত করেছেন :

> 'কড়কড়াৎ করে আবার বাজ পড়ে কাছেই, আসমানটা যেন আচমকা ফেটে চৌচির হয়ে যায়। এবং মাটি বিদ্ধ হয়ে থরথর কাঁপতে থাকে।... সঙ্গে কান্নার মতো শোঁ শোঁ শব্দ, প্রকৃতির অন্তমূল থেকে বেরিয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। কতক্ষণ পর জানে না, জহু আস্তে আস্তে চোখ মেলে তাকায় তাকিয়ে শুধু শোনে এই শব্দ , হু হু কান্নার মতো বাতাসের শব্দ।'[২৮]

এই পরিচর্যা 'ক্ষুধা ও আশা' উপন্যাসের শিল্পরূপকে প্রগাঢ় করেছে। ঔপন্যাসিক বিবরণ কিংবা বিশ্লেষণে সমর্পিত না করে উদ্ভাসিত করেছেন প্রগাঢ় অনুভূতি সংহত চিত্রময়তায়। সময় লাঞ্ছিত, পরিবেশধৃত মানুষের জীবন তরঙ্গ এভাবে পুষ্পিত হয়েছে অসীম আকাঙ্ক্ষার চিত্রকল্পে।

'ক্ষুধা ও আশা' উপন্যাসের চরিত্র চিত্রণে দুর্বলতা উপন্যাসের গঠনকাঠামোকে অনেকাংশে বিপর্যস্ত করেছে। ক্ষুধা থেকে বাঁচার আশায় শহরে এসে বুড়ো হানিফ দুর্ঘটনায় মৃত্যু বরণ করেন। মেয়ে জহু পেটের ক্ষুধা থেকে বাঁচতে এসে যৌনক্ষুধার শিকারে পরিণত হয় বাদশার হাতে এবং বাদশার নির্দেশে হোসেন ছোরার ভয় দেখিয়ে নিয়ে যায় পতিতা পল্লীতে, জহু চরিত্রের কোনো বিকাশ,পরিণতি লক্ষ করা যায় না। ফাতেমা তার গর্ভের অনাগত সন্তানের আশায়, নতুন ফসলের স্বপ্ন দেখে আবার গ্রামে ফিরে যেতে চায়। বেঁচে থাকার তীব্র আশা নিয়ে শহরে এলেও সে তার নতুন সন্তানের আশ্রয় হিসেবে শহরকে নিরাপদ ভাবতে পারেনা। মূলত জোহা চরিত্র ও তার দৃষ্টি দিয়ে ঔপন্যাসিক 'ক্ষুধা ও আশা' উপন্যাসের জীবন উপলব্ধি এবং সময়ের বাস্তবতা প্রকাশ করতে চেয়েছেন। কিন্তু সে প্রচেষ্টা সর্বাংশে সফল হয়নি। জোহার শ্রেণীগত অবস্থান, বয়স অনুযায়ী মানসগড়ন সঙ্গতিপূর্ণ নয়। উপন্যাসের শেষে জোহা যে জীবনবোধ ও আত্ম-উপলব্ধিতে পিতৃপরিচয়হীন নবজাত শিশু ও তার জননী পাশে দাঁড়ায় এবং ভোরের প্রতীক্ষা করে, তা মোটেই তার কৈশোরক চরিত্রের কাজ নয়। ঔপন্যাসিকের ভাষায় :

> 'জীবন্ত মাংসের গন্ধেই বুঝি শৃগালের ডাকে হিংস্র উল্লাস ঝরে, কিন্তু আশ্চার্য কোন অজানা রহস্যে জানে না, যে এখন যেন বাঘের চেয়ে সাহসী; জননীর গায়ে গা চেপে এবং শিশুটিকে পরম যত্নে আগলে দারুন শীতে অন্ধকারে বসে থাকে ভোরের প্রতীক্ষায়।'[২৯]

Dhaka University Institutional Repository

বস্তুত উপন্যাসের শেষে জোহা যেন বালক নয়, কিশোর নয়, মানবীয় গুণের অধিকারী দায়িত্বশীল এক নাগরিক, যে সমস্ত প্রতিকূলতার মধ্যেও জীবনের পক্ষে, মানবিকতায় দীপ্ত। বয়সের তুলনায় ও শ্রেণীগত অবস্থানের দিক থেকে বিবেচনা করলে জোহার এই চেতনা অগ্রগামী বৈ কি? অন্য চরিত্রগুলোর মধ্যে আলী, রেজা, লীমা, সুজাতা, তাদের প্রেম রাজনীতি, দ্বন্দ্ব সবই স্বশ্রেণীর চরিত্রানুসারেই রূপায়িত।

বিস্তৃত পটভূমি ও বাস্তব সমাজ পরিপ্রেক্ষিতে রচিত হলেও 'ক্ষুধা ও আশা' উপন্যাসের অনেক চরিত্রের আচরণই বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠেনি। যেমন, পাগলা মাস্টার ও বাদশা গুন্ডার চরিত্রের বিকাশ ঘটাতে ঔপন্যাসিক সফল হননি, এদুটো চরিত্র অনেকটাই রিপোর্টধর্মী বলে মনে হয়। মন্বন্তরের পটভূমিতে রচিত বলে- ক্ষুধা থেকে বাঁচার আশায় শহরে এসে হানিফ দুর্ঘটনায় ক্ষত বিক্ষত হয়ে যাওয়ার মধ্যে 'ক্ষুধা ও আশা' উপন্যাস একটি প্রতীকী ব্যঞ্জনা লাভ করেছে।

৩.

ভাষাকে যারা শৈলীবিজ্ঞানের একমাত্র বিষয় মনে করেন, তাদের সঙ্গে সাংগঠনিক শৈলীবিজ্ঞানীদের মত পার্থক্য রয়েছে। 'উপন্যাসের বহির্গঠন ঔপন্যাসিকের শিল্পকলার নির্মাণ স্বরূপ স্পষ্ট করে। আবার ভাষা হলো মনের বিশেষত্বের সেই প্রকাশ, যা বলার কথাকে সুষ্ঠু করে। গঠন যদি হয় মনের বাইরের ফটক, তবে অন্দরমহলের প্রকাশরূপ হলো ভাষা।'[৩০] 'ক্ষুধা ও আশা' উপন্যাসে ভাষা ব্যবহারে ঔপন্যাসিক চিত্রশৈলী (pictorial manner) এবং বিশ্লেষণশৈলী (analylical manner) প্রয়োগ করেছেন।

ক. চিত্রশৈলী (pictorial manner) ঃ

> 'কড়কড়াৎ করে আবার বাজ পড়ে কাছেই, আসমানটা যেন আচমকা ফেটে চৌচির হয়ে যায়। এবং মাটি বিদ্ধ হয়ে থরথর কাঁপতে থাকে। আর বিজলির পরে বিজলি, হাওয়ার পরে হাওয়া, বিজলি জেগে উঠে মিলিয়ে যায়, হাওয়া দমকে দমকে অদৃশ্য সমুদ্রের তরঙ্গের মতো উচ্ছ্বসিত উদ্ভ্রান্ত। সঙ্গে কান্নার মতো শোঁ শোঁ শব্দ, প্রকৃতির অন্তর্মূল থেকে বেরিয়ে চারদিকে ছাড়িয়ে পড়েছে।'[৩১]

উদ্ধৃতাংশে চিত্রানুগ শব্দকে কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যেমন :

কড়কড়াৎ, শোঁ, শোঁ থরথর, দমকে দমকে (ধ্বন্যাত্মক বা ধ্বনিব্যঞ্জক শব্দ)

মাটি বিদ্ধ, ফেটে চৌচির (দৃশ্য জ্ঞাপক শব্দ)

সমুদ্রের তরঙ্গের মতো (তুলনা বাচক শব্দ)

বাক্য ছোট বড়-অসমান। চরিত্রের অন্তর্জীবনের সঙ্গে প্রাকৃতিক পরিবেশকে সমন্বিত করে ভাষাশৈলী গঠন করেছেন ঔপন্যাসিক। ফলে আঞ্চলিক শব্দ (কড়কড়াৎ, আচমকা, আসমানটা) স্বল্পপ্রচলিত শব্দ 'দমকে দমকে' এবং চলিত শব্দের মিশ্রণে বাক্য গঠন করা হয়েছে। তৎসম শব্দের চেয়ে তদ্ভব শব্দের প্রয়োগ অধিক।

Dhaka University Institutional Repository

খ. বিশ্লেষণশৈলী (analytical manner) ঃ

'ক্ষুধা ও আশা' উপন্যাসে ভাষাশৈলীর ক্ষেত্রে বিশ্লেষণশৈলী প্রয়োগ অধিক। চরিত্রের অন্তঃউপলব্ধির প্রকাশে এ শৈলীর সাফল্য প্রশ্নাতীত। চরিত্রের আত্মকথনেও এ বিশ্লেষণীশৈলীর প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। যেমন :

> 'ইতিহাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ে আমরা বাস করছি। আমাদের জন্মটা হয়তো আকস্মিক, তবু অস্তিত্বটা তো সত্যি? তার মাঝে, যুগচক্রের মধ্যে নিজেদের অজ্ঞাতেই লতাতন্তুর মতো আমরা জড়িয়ে পড়েছি। প্রাচীনকালে মহাবাহু নৃপতিদের রাজ্যলিপ্সার দরুন বহু নগর জনপদ দেশ রাজ্য জাতি ধ্বংস হয়েছে, কিন্তু এখন আমরা যা দেখছি তার তুলনা নেই। এ এক প্রচণ্ড অগ্ন্যুৎপাত, খণ্ড প্রলয়।'[৩২]

আমাদের বিবেচনায় 'ক্ষুধা ও আশা' উপন্যাসের প্লটগঠন নিম্নোক্ত রূপে কল্পিত।

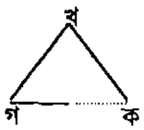

'ক'=জোহা পরিবার দুর্ভিক্ষের পটভূমিতে বাঁচার আশায় শহরের দিকে যাত্রা-কাহিনীর উৎস।

'খ'=ঢাকা শহর, কাহিনীর কেন্দ্রভূমি।

'গ'=জোহার বোন জহুকে চট্টগ্রামে স্থানান্তর এবং নায়ক জোহা এক নবজাতকের পাশে আগুন জ্বেলে ভোরের প্রতীক্ষা।

তথ্যনির্দেশ ও টীকা

১. Ralf Fox ; *The novel and the people*, 1944. Londo, Eagle publication. P.2

২. ড. জলি মল্লিক বন্দ্যোপাধ্যায় ; *বাংলা মহাকাব্যিক উপন্যাস*,প্র:প্র: ১৯৯১, কলকাতা পুস্তক বিপণি, পৃ. ৪

৩. W. Somarset mougham, *Ten Novels aned their outhors* (1954), 1969 Great Britain, Penguin Books, Ltd. P. 258.

৪. দ্রষ্টব্য :

ক. ড. জলি মল্লিক বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, প্রস্তাবনা, পৃ. ১১

খ. সৈয়দ আকরম হোসেন, *প্রসঙ্গঃ বাংলা কথাসাহিত্য*, ১৯৯৭, ঢাকা, মাওলা ব্রাদার্স, পৃ. ১১৪

গ. রফিকউল্লাহ খান, *বাংলাদেশের উপন্যাস : বিষয় ও শিল্পরূপ*, ১৯৯৭, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, পৃ. ১৯১

৫. *বাংলাদেশের উপন্যাস : বিষয় ও শিল্পরূপ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯১

৬. *প্রসঙ্গঃ বাংলা কথাসাহিত্য*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৪

৭. শহীদুল্লা কায়সারের *'সংশপ্তক'* ১৯৬৫ সালে সেপ্টেম্বরে প্রথম প্রকাশিত হয় ঢাকায়। বর্তমান সন্দর্ভে সপ্তম সংস্করণ ১৯৯১, ঢাকা মুক্তধারা-এর পাঠ গৃহীত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

৮. *'সংশপ্তক'* পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৬

৯. Robert Scholes and Robert Kellogg, *The Nature of Narrative,* 1966, NewYork, Oxford University Press. P.209.

১০. *বাংলাদেশের উপন্যাস : বিষয় ও শিল্পরূপ,* পূর্বোক্ত,পৃ. ১৯৬

১১. *'সংশপ্তক'* পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৩

১২.Percy Lobbock, *The craft of Piction* (1921), 1968, London, Jonathan Cape, P.25

১৩. *'সংশপ্তক'* পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৩৭

১৪. W.J.Harvey, *Character and the novel* , 1965, Ithaca, NewYork, Cornall University Press, P.23

১৫. *বাংলাদেশের উপন্যাস :বিষয় ও শিল্পরূপ,* পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯৮

১৬. অপূর্বকুমার রায়, *শৈলীবিজ্ঞান,* ১৯৮৯, কলকাতা, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, পৃ. ৪৫

১৭. *'সংশপ্তক'* পূর্বোক্ত,পৃ. ৪৬

১৮. *'সংশপ্তক'* পূর্বোক্ত,পৃ. ৪৭

১৯. *'সংশপ্তক'* পূর্বোক্ত,পৃ. ১

২০. আলাউদ্দিন আল আজাদের *'ক্ষুধা ও আশা'* প্রথম প্রকাশিত ১৯৬৪ সালে ঢাকায়। বর্তমানে সন্দর্ভে দ্বিতীয় প্রকাশ ১৯৭৪, ঢাকা, মুক্তধারা - এর পাঠ গৃহীত হয়েছে।

২১.আলাউদ্দিন আল আজাদ, *শিল্পীর সাধনা,* ১৯৭৪, ঢাকা, পৃ. ১০৮

২২. *প্রসঙ্গ: বাংলা কথাসাহিত্য,* পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৪

২৩. Blaze o. Bonazza. Emil Roy, *Studis in Fiction,* 1965, NewYork, Harper ande Row Publishers, P.5

২৪. *ক্ষুধা ও আশা,* পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৭

২৫. *বাংলাদেশের উপন্যাস : বিষয় ও শিল্পরূপ,* পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯৯

২৬. *ক্ষুধা ও আশা,* পূর্বোক্ত, পৃ. ১

২৭. বাংলাদেশের উপন্যাস : বিষয় ও শিল্পরূপ, পূর্বোক্ত, পৃ. ২০০

২৮. *ক্ষুধা ও আশা,* পূর্বোক্ত, পৃ. ৯২-৯৩

২৯. *ক্ষুধা ও আশা,* পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪১

৩০. আশিস্কুমার দে, *সাহিত্যালোচনা ও শৈলীবিজ্ঞান,* ১৯৯২, কলকাতা, সাহিত্য প্রকাশ , পৃ. ১২৮

৩১. *ক্ষুধা ও আশা,* পূর্বোক্ত, পৃ. ৯২-৯৩

৩২. *ক্ষুধা ও আশা,* পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৮

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায় : চেতনাপ্রবাহ শিল্পশৈলীর উপন্যাস

ক. চাঁদের অমাবস্যা

খ. কাঁদো নদী কাঁদো

Dhaka University Institutional Repository

চেতনাপ্রবাহ শিল্পশৈলীর উপন্যাস

পরিবর্তনশীল সমাজ ও প্রবহমান সময়-স্রোতের প্রেক্ষাপটে সৃষ্টিশীল ব্যক্তিচৈতন্যের রূপান্তরও অনিবার্য। 'যেহেতু বহমান বর্হিবস্তুজগত এবং স্রষ্টার অনুভবসংবেদন মন-এ দুয়ের জটিল বাস্তবতা একাত্ম হয়ে প্রকাশ ঘটায় রূপের; সে কারণে উপন্যাসের ফর্ম নির্মাণের ক্ষেত্রে সাধিত হল জটিলতর রূপান্তর।'[১] উপন্যাসের প্রথাগত ধারণা-প্লট, চরিত্র, সময়, বিষয়, ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রেও সাধিত হয় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন। নিরীক্ষাপ্রবণ ঔপন্যাসিকগণ রচনা করলেন anti-plot, anti hero, anti-time উপন্যাস। কারণ সমাজকাঠামোর পরিবর্তনের সঙ্গের স্রষ্টার মনোজাগতিক ইতিহাসও জড়িত। সমাজের দ্বন্দ্বজটিল পরিস্থিতি স্রষ্টার মনোলোকে যে প্রতিবিম্বন তৈরি করে, সেই বাস্তব-ভাবসত্য প্রকাশের অন্তর্গরজে তাকে আবিষ্কার করতে নিয়ে হয় প্রয়োজনানুগ শিল্পশৈলী। বিশশতকের প্রথমার্ধে সংগঠিত দুই বিশ্বযুদ্ধের অভিজ্ঞতা, নানা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার,ফ্রয়েডের The interpretation of Dreams (1913), The Psychology of Everyday life (1914) এবং on Dream (1914) হ্যাভলক এলিস-এর Studies in the psychology of sex (1897-1928) ইত্যাদি মনোঃসমীক্ষণতত্ত্ব বিশ্বব্যাপী মানব মনে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে। ফ্রয়েড প্রথম সন্ধান দিলেন যে, চেতন এবং অচেতনের মাঝখানে মানব মস্তিষ্কে অবচেতন মনেরও একটি ব্যাপার আছে। অবচেতন মনের এই স্তরটি চরম বিশৃঙ্খল ও অরাজগতার লীলাভূমি। শুধু তাই নয়, অবচেতনের এই স্তরটির মূল উৎস হচ্ছে Sex যৌনানুভূতি। Sex is the main spring of our unconsious life. ফয়েডের এই আবিষ্কারের ফলে মানুষের ব্যক্তিত্বের রূপটি পাল্টে যায়।

'মানুষের বহিরঙ্গের অনুপুঙ্খ বিবরণধর্মী বাস্তবতার পরিবর্তে অন্তর্জীবনের গভীরতর বাস্তবতার (inner reality) সন্ধান, অবচেতন আকাঙ্ক্ষার রূপায়ণ, চরিত্র-অঙ্কনের পরিবর্তে ব্যক্তির আত্মান্বেষণ (Searcho of indentity), চেতনাপ্রবাহ (Stream of consciousneses)কিংবা অন্তঃসংলাপ (interior monologue) রীতির ব্যবহার প্রচলিত সময় ধারণার পরিবর্তে সময়ের ভগ্ন-ক্রম বিন্যাস, সূক্ষ্ম সংকেত প্রতীক ও নিগূঢ় চিত্রকল্পের ব্যবহার এই সব কুললক্ষণে যুদ্ধপরবর্তী বাংলা কথাসাহিত্য সূচিহ্নিত।'[২] জাঁ পল সার্ত্রের (১৯০৫-১৯৮০) অস্তিত্ববাদী দর্শন নতুন শিল্পসূত্রের জন্ম দেয়। লেখা হয় চেতনাপ্রবাহশৈলীর উপন্যাস। জেমস্ জয়েস (১৮৮২-১৯৪১) ভার্জিনিয়া উলফ (১৮৮২-১৯৪১) এবং ডরোথি রিচার্ডসন বিশশতকের প্রথম ও দ্বিতীয় দশকে চেতনাপ্রবাহ ধারার প্রথম সফল প্রয়োগ করেন। চেতনাপ্রবাহ পদ্ধতিটি একটি বিস্তৃত কর্মকান্ডের পরিচায়ক। পূর্ববর্তী উপন্যাসের সরলরৈখিক প্লট ও আনুপূর্বিক সময়-ব্যবহারের বিরুদ্ধে গিয়ে চরিত্রকে প্লটের নিয়ন্ত্রক করে তার মনের ভুবনকে উন্মোচিত বা ব্যাখ্যা করার পদ্ধতিকেই চেতনাপ্রবাহশৈলী বলা হয়। এই পদ্ধতিতে চরিত্রের সময় হয়ে দাঁড়াল ঘটমান ও চলমান। বাহিরের বস্তু জগতে চলমান ঘটনা মানুষের সতত-সঞ্চরণশীল মননক্রিয়ার উপর প্রভূত প্রভাব ফেলে। কারণ মানুষের মন কোনো স্থির নির্দিষ্ট বস্তু নয়, তা নিয়ত পরিবর্তনশীল। প্রতিটি মুহূর্ত মানুষের চেতনাকে একটি নতুন বিন্যাসে স্থাপন করে, এই মুহুর্মুহু ভেঙে পড়া চেতনাস্রোতকে বাইরের বস্তু জগতের চলমান ঘটনার সঙ্গে সমান্তরাল করে একই সূত্রে গ্রথিত করার বিশেষ শৈলীকেই চেতনাপ্রবাহশৈলী বলা হয়। ডরোথি রিচার্ডসনের একটি উপন্যাসের আলোচনা প্রসঙ্গে মে সিনক্লেয়ার ১৯১৮ সালে প্রথম Stream of conciousness বা চেতনাপ্রবাহ কথাটি ব্যবহার করেন। রিচার্ডসন যে উপায়ে মুহূর্ত থেকে মুহূর্তে চরিত্রের চেতনাবোধ উপলব্ধি-অভিজ্ঞতা-অনুধাবনকে গড়িয়ে যেতে দেন, তা বর্ণনা

Dhaka University Institutional Repository

করতে গিয়ে সিনক্লেয়ার Stream of conciousness এর সংজ্ঞাটি দেন। এই শৈলীতে লেখা উপন্যাস প্রথমে ভেঙ্গে দেয় প্লট ধারণা এবং চরিত্রের একরৈখিক বিন্যাস।

জেমস্ জয়েসের 'ইউলিসিস' মাত্র চব্বিশ ঘন্টার কাহিনী। তাতে তিনটি চরিত্র বিভিন্নভাবে পরস্পরের কাছে আসে, দূরে যায়, আবার কাছে আসে। প্লট বলতে ঐ তিন চরিত্রের, প্রধানত দু'জনের মুহূর্ত থেকে মুহূর্তে গড়িয়ে যাবার বিবরণ। ভার্জিনিয়া উলফ-এর ' টু দি লাইট হাউস'-এ প্রথাগত প্লট বলতে কিছু নেই। একটি পরিবার ছুটি কাটাতে এসে এক স্থান থেকে নৌকা করে আরেক স্থানে যাবে কি যাবে না এভাবনা হচ্ছে গল্প ; এর মধ্যে মিসেস র‍্যামজে ও তার স্বামী ও পরিবারের সঙ্গে তার সম্পর্ক নিয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনা এবং খুটিনাটি যে চিত্র তৈরি করে, তাতে ঐ গল্পহীন গল্পের মানুষগুলো বেড়ে ওঠে। আমরা একটি প্রধান চরিত্রের চেতনাধারার বিকাশকে দেখি, তার অনুভূতির আলোকে বিশ্বকে প্রত্যক্ষ করি। অর্থাৎ চেতনাপ্রবাহশৈলীর উপন্যাসে প্লটকাঠামো ভেঙ্গে যায় এবং এশৈলীর উপন্যাসে সময় একবারে খন্ডিত, আনুপূর্বিক বলতে কিছু নেই, কারণ সময়ের পরম্পরা নির্ধারিত হয় চরিত্রের চেতনাপোলব্ধি থেকে। এজন্য সময় অতীত,বর্তমান, ভবিষ্যতের সীমারেখায় বন্দি না থেকে সময়, চরিত্রের চেতনায় একাকার হয়ে যায়; সময় বিন্যস্ত হয় ভগ্নক্রম শৈলীতে। উইলিয়াম জেমস্ (১৮৪২-১৯১০) তার 'প্রিন্সিপলস অফ সাইকোলজি' (১৮৯০) গ্রন্থে দার্শনিক দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যক্তির ক্রমপরিবর্তনশীল মনের অবস্থা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে Stream of consciousness শব্দটি ব্যবহার করেছেন। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্বের চেতন অবচেতন মনের সূত্র। ফরাসী দার্শনিক বের্গসঁ এর বিখ্যাত তত্ত্ব duration বা স্থিতিকাল এবং চেতন হচ্ছে মানুষের মনোজাগতিক চলিষ্ণুতা। চেতনাপ্রবাহশৈলীর উপন্যাসে ব্যক্তির মনস্তাত্ত্বিক পর্যবেক্ষণই প্রধান; ব্যক্তির চেতনা অবচেতন মনের ধূসর অঞ্চলের জটিল গ্রন্থি আবিষ্কারই এশিল্পশৈলীর উপন্যাসের লক্ষ্য। তাই এর ভাষা হয় আত্মকথন মূলক interior monologue)। ব্যক্তি মনেজগতের দ্রুত-বিলিয়মান দিগন্ত রেখা আবিষ্কার যেহেতু চেতনা প্রবাহশৈলীর উপন্যাসের অন্যতম লক্ষ্য তাই চরিত্রের আত্মকথনে অনেক সময় বহির্বাস্তবের কার্যকারণসূত্র খুঁজে পাওয়া যায় না।

চাঁদের অমাবস্যা

বাংলাদেশের উপন্যাস-সাহিত্যে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ (১৯২২-১৯৭১) প্রথম পাশ্চাত্য জীবনদৃষ্টি ও শিল্পবোধকে আত্মস্থ করে চেতনাপ্রবাহশৈলীর শিল্পসফল উপন্যাস রচনা করেন। 'চাঁদের অমাবস্যা' (১৯৬৪) এবং 'কাঁদো নদী কাঁদো' (১৯৬৮) উপন্যাসে তিনি প্রয়োগ করেছেন অস্তিত্ববাদী জীবনদর্শন কিন্তু ব্যবহার করেছেন চেতনাপ্রবাহ শিল্পশৈলী । আঙ্গিক চেতনায় এই নতুনত্ব এবং জীবনদর্শনে আন্তর্জাতিকতা তাঁকে সমকালীন অন্য লেখকদের থেকে আলাদা করেছে। বিরুদ্ধ সমাজ সময়ে পীড়িত, আত্মবন্দি ব্যক্তিমানসের যন্ত্রণা, উৎকণ্ঠা, শঙ্কা, মনস্তাপের আত্মবিবরে নিমজ্জিত ব্যক্তি মনের গহন গোপন প্রতিক্রিয়া আবিষ্কারের ঐকান্তিকতায় এই আঙ্গিক, বাংলাদেশের উপন্যাস-সাহিত্যে নতুন মাত্রা সংযোজন করেছে। 'সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর উপন্যাস আমাদের নিয়ে যায় অস্তিত্বের প্রগাঢ় অন্ধকার থেকে আলোর দিকে, বিমিশ্র সত্তা থেকে শুদ্ধসত্তার অভিমুখে।'[৩] তাঁর প্রত্যেকটি উপন্যাসই একজন প্রতিভাবান শিল্পীর প্রযত্ন প্রয়াস সহজে চোখে পড়ে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-উত্তর ইউরোপীয় উপন্যাসের শিল্পশৈলীর দৃষ্টিকোণ থেকে 'চাঁদের অমবস্যা'

Dhaka University Institutional Repository

উপন্যাসের আঙ্গিক বিবেচনা করা যায়। 'দৃষ্টিকোণ, পরিচর্যা,চরিত্রায়ণ, সময়ের বিন্যাস, ভাষাশৈলী প্রতিটি ক্ষেত্রেই 'চাঁদের অমাবস্যা'প্রথাগত উপন্যাস থেকে আলাদা।'[৪] উপন্যাসের ঘটনাস্রোত সর্বত্রই উর্ধ্বমুখী, বর্ণাঢ্য, উচ্চগ্রামে বাঁধা, চরিত্রের আত্মজিজ্ঞাসা-প্রশ্ন-প্রতিউত্তর, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও বিবরণের মধ্য দিয়ে কাহিনী পরিণামমুখী হয়েছে। ঔপন্যাসিকের পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা, অভিজ্ঞতা-পরিমন্ডলের ঐশ্বর্য, উদ্ভাবনী-স্বাচ্ছন্দ্য, মানসিক সর্তকতা ও একাগ্র নিষ্ঠা সুস্পষ্ট। যুবক শিক্ষক আরেফ আলীর আত্মখননময়, উদ্বেগাকুল পরিস্থিতির সঙ্গে যে কোনো পাঠক সহমর্মী ও সহযাত্রী হয়ে ওঠে। 'আপাতভাবে লেখকের সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণ ব্যবহৃত হলেও, এ-উপন্যাসে, মূলত শিল্পপ্রক্রিয়ায় কার্যকর থেকেছে ভীতসন্ত্রস্ত, আতঙ্কশিহরিত আরেফ আলীর আতসংবেদনশীল প্রেক্ষণবিন্দু। অস্তিত্বগত প্রান্তিক পরিস্থিতির তীক্ষ্ণমুখ আঘাতে আরেফ আলী আত্ম-যন্ত্রণাকাতর, চেতন-অবচেতনায় রক্তাক্ত, সত্যানুসন্ধানে আত্মখননকারী, জটিল ও স্তরবহুল; অভিজ্ঞতায় ক্রমসংকুচিত। তার অস্তিত্বসংকটের এই অন্তর্ময় তীব্র তীক্ষ্ণ, প্রগাঢ় সংরাগ ও সংক্ষোভময় দৃষ্টিকোণের জন্যই সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহ 'চাঁদের অমাবস্যা'য় অনেকাংশে এক্সপ্রেশনিষ্ট।'[৫] কেন্দ্রীয় চরিত্রের প্রেক্ষণবিন্দু দ্বারাই উপন্যাসের ফর্ম নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। উচ্চারিত, অনুচ্চারিত প্রশ্নমালায় আরেফ আলীর আত্ম সমগ্র উদ্ভাসিত।

বড় বাড়িতে আশ্রিত যুবক-শিক্ষক আরেফ আলী এক জ্যোস্নাপ্লাবিত রাতে বাঁশ ঝাড়ে এক যুবতী নারীর অর্ধ উলঙ্গ মৃতদেহ প্রত্যক্ষ করে । সে যে বাড়ির আশ্রিত সে বাড়ির দরবেশ নামে খ্যাত কাদের ঐ যুবতী নারীর ধর্ষণকারী এবং হন্তারক। হত্যাকারীকে শনাক্ত করার পর সত্যপ্রকাশের প্রশ্নে যে দ্বিমুখী সংকটের সম্মুখীন হয়- যদি সে বিবেকের তাড়নায় সত্য প্রকাশ করে, তবে তার অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়বে। কারণ পরিণামে তাকে বড়বাড়ির আশ্রয়, স্কুলের চাকুরী সবই হারাতে হবে। এমন কি তার জীবনও বিপন্ন হবার আশঙ্কা রয়েছে। অন্যদিকে সে যদি এ হত্যাকান্ডের কথা গোপন রাখে তবে তার মানবিক চেতনা, দায়িত্ববোধ অবহেলিত হয়ে এবং বিবেকের আত্ম যন্ত্রণা থেকেও সে মুক্তি পাচেছ না । এই অস্তিত্ব সংকট ও বিবেকী দংশনের দ্বিবিধ দ্বন্দ্বজটিল পরিস্থিতির পরিণামে তার সত্য প্রকাশের দায়ই জয়ী হয়। 'চাঁদের অমাবস্যা'র যুবক-শিক্ষক আরেফ আলীর এই প্রান্তিক পরিস্থিতিকে সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহ চেতনাপ্রবাহের পথে ব্যক্তিমনের জটিল অন্ধিসন্ধির কুশলী উদ্‌ঘাটন-প্রশ্ন ও যুক্তির অসাধারণ বিন্যাস লক্ষ্য করা যায় :

> "অকস্মাৎ তার মনে নানা প্রকার প্রশ্ন জাগতে শুরু করে। খই ফোটার মত, একটির পর একটি। ... প্রথম রাতে কাদের কেন মাঠে ঘাটে একাকী ঘুরে বেড়াচ্ছিল, সে কথাই তাকে প্রথম জিজ্ঞাসা করতে হবে। প্রত্যুত্তরে কাদেরও তাকে জিজ্ঞাসা করতে পারে, সে-ই বা কেন শীতের গভীর রাতে বাইরে ঘুরাঘুরি করছিলো। কিন্তু প্রশ্নটির উত্তর দিতে সে প্রস্তুত। সে দ্বিধা না করে স্বীকার করবে। কাদেরকেই সে অনুসরণ করেছিলো।... একটা কথায় যুবক শিক্ষকের মনে শীঘ্র খটকা লাগে। কেন সে কাদেরকে তার ভ্রমণের কথাটি জিজ্ঞাসা করতে চায়? একটি বিষয়ে সে নিঃসন্দেহ: যুবতী নারীর মৃত্যুর সঙ্গে কাদেরের কোন সম্বন্ধ নাই। সে-বিষয়ে নিঃসন্দেহ না হলে তার সঙ্গে সাক্ষাতের কোন প্রয়োজনীয়তা সে বোধ করতো না, তার মনে হঠাৎ মেঘ কেটে আলোও প্রাকশ পেত না। বস্তুত, তাকে কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজনও সে দেখতো না। তবে কেন সে প্রশ্নটি তার প্রশ্নতালিকার শীর্ষে বসিয়েছে? অবিশ্বাস সত্ত্বেও সে কী বিশ্বাস করে কাদের দরবেশ? সে-কথাই কী সে প্রথম যাচাই করে নিতে চায়?"[৬]

উপন্যাসের 'পাঁচ' অংশে এভাবে আরেফ আলীর ভয়-বিহবল চিত্তে পাঁচটি প্রশ্ন জাগে এবং তার এই আত্মজিজ্ঞাসার মধ্যে ব্যক্তিমনের নানাদ্বন্দ্ব, শঙ্কা, একাকীত্ব, নিঃসঙ্গতা, অনিশ্চয়তা, অপরাধবোধ ও সত্য অন্বিষ্ঠা লক্ষ করা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

চন্দ্রালোকিত রাতে বাঁশঝাড়ে যুবতী নারীর মৃতদেহ প্রত্যক্ষ করেছে, যে অভিজ্ঞতার সঙ্গের জড়িতবোধ করলেও সে আসলে জড়িত নয়। তবু সে নিজের অভিজ্ঞতার অর্থ বোঝার চেয়ে কাদেরের সঙ্গে একটা সম্পর্ক স্থাপন করার জন্য ব্যস্ত হয়ে ওঠে। অনেক ভেবেও তার মনের খটকা যায় না। তার কাছে এই প্রথম প্রশ্নটি বিশেষ প্রয়োজনীয় মনে হয়, কারণ প্রশ্নের উত্তর তার মনের অশান্তি, বিশৃঙ্খলতা এবং মনের অন্ধকার দূর করতে পারে। শুধু এ প্রশ্ন নয়, অন্যান্য প্রশ্নের উত্তর কাদেরের মনের পরিচয়ও দেবে। কাদেরকে বুঝতে না পারলে বিচিত্র অভিজ্ঞতাটির রহস্য উন্মোচন হবে না। তাই অন্যান্য প্রশ্নও তার মনে জেগে ওঠে এবং তাকে অস্থির করে তোলে :

> 'দ্বিতীয় প্রশ্নঃ কাদের কী যুবক শিক্ষককে হত্যাকারী বলে সন্দেহ করেছিলো? ঘটনাটি সে কাদেরের দৃষ্টিতে ভেবে দেখে। প্রথম রাতে কাদের তাকে বাঁশঝাড় থেকে বেরিয়ে আসতে দেখে। দু-জনে মুখোমুখি হলে যুবক শিক্ষক হঠাৎ ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালিয়ে যায়। তখন কৌতুহলী হয়ে কাদের বাঁশঝাড়ে প্রবেশ করলে মৃতদেহটি দেখতে পায়। তারপর যুবক শিক্ষককে হত্যাকারী বলে সন্দেহ করাই তার জন্য স্বাভাবিক নয় কী?
> এখানে যুবক শিক্ষক একটু ইতস্তত করে। সে বুঝতে পারে না, ভূমিকা না দিয়ে প্রশ্নটি করা সমীচীন হবে কি না।'[৭]

আরেফ আলী নিজেই মনে মনে উত্তর তৈরি করে- কাদের যদি তাকেই হত্যাকারী সন্দেহ করে, তবে সে পুলিশকে খবর দেয়নি কেন বা অন্য কারো কাছে হত্যার কথা প্রকাশ করেনি কেন? এভাবে যুক্তির শৃঙ্খল-বিশৃঙ্খলতা আরেফ আলীকে বিবরবাসী, আতঙ্কগ্রস্ত করে তোলে। কাদের যে হত্যাকারী এ-কথাটা সে পুলিশের কাছে কীভাবে প্রকাশ করবে? সে যে বাড়ির আশ্রিত, কাদের সে বাড়িরই লোক। কথাটা তার পক্ষে প্রকাশ করা সহজ হবেনা। পশ্চাতে আশ্রয়হীন অস্তিত্ব বিপন্নের আশঙ্কা তাকে বিহ্বল করে তোলে। আত্মবিবরে ডুব দিয়ে যুবক শিক্ষক ভাবে, বাঁশঝাড়ের কথাটি কারো কাছে প্রকাশ করা যায় না। 'সে-টি কাদের আর তার মনের গোপন কথা। শরীরের গোপন স্থানে গুপ্তক্ষতের মত। এমন কথা কাউকে বলা যায় না।' মনের গহিন গুহা থেকে আবার ভেসে ওঠে প্রশ্ন :

> 'কাদের যে হত্যাকারী সে-ধারণা কী করে যায়? যে ধারণা পরদিন দুপুরবেলা পর্যন্ত তাকে ভীত-নিপীড়িত করেছে, সে-ধারণা থেকে কোন যুক্তি-সাক্ষ্য-প্রমাণের সাহায্যে সে মুক্তিলাভ করে?
> এপ্রশ্নও যুবক শিক্ষক ঠক্কর খায়। কি এ প্রশ্নে কী কোন বোধগম্য উত্তর আছে? সবই বিশ্বাস। দোষী, সেটাও বিশ্বাস; নির্দোষ, সেটাও বিশ্বাস। বিশ্বাসের উপরই কী সমগ্র মানবজীবন নির্ভর করে নাই?... এ উত্তরই কী যথেষ্ট? সব বিশ্বাসেরই কোন-না-কোন হেতু থাকে। জীবনের একমাত্র অবলম্বন হোক, তবু তার মধ্যে একটা যুক্তির কাঠামো থাকে।
> না, তার এ-বিশ্বাসের কোনই যুক্তি নাই।'[৮]

> 'তৃতীয় প্রশ্ন: সে-রাতে কাদের তার ঘরে কেন এসেছিলো? যুবক শিক্ষকই হত্যাকারী কিনা সে-কথা নিশ্চয় করে দেখার উদ্দেশ্যে কী? বা গভীর রাতে একটি অসহায় মৃতদেহ দেখে মনে পরম নিঃসঙ্গতা বোধ করলে সঙ্গলিপ্সা সান্ত্বনা আশ্বাসের জন্যে?'[৯]
> 'কাদের সাব্যস্ত করে, যুবতী নারীর মৃতদেহটি গুম করে দেবে। কেন? .. .. যুবতী নারীর যে প্রাণ নিয়েছে তার শাস্তির কথা কি কাদের ভাবে নাই? দেহ গুম করে দিয়ে সে খুনীর অপরাধও নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে। তার শাস্তির চেয়ে যুবতী নারীর মান-মর্যাদাই কি তার কাছে বড় ঠেকেছে?.. .. যুবক শিক্ষক ঠিক করে, এ- বিষয়ের কাদেরকে প্রশ্ন করতে হবে।'[১০]

Dhaka University Institutional Repository

'অতএব পঞ্চম প্রশ্নঃ সাহায্যের জন্যে কাদের তারই কাছে কেন আসে? .. .. শ্রান্তভাবে যুবক শিক্ষক আপন মনে স্বীকার করে, তার চারধারে ঘোর অন্ধকার, যে অন্ধকারের মধ্যে অন্ধের মতই সে প্রশ্নগুলি তৈরি করেছে।'[১০]

আরেফ আলীর অর্ন্তমুখী চেতনাস্রোত, সত্তা-আতঙ্কিত জিজ্ঞাসা তার অস্তিত্বমূলকে প্রবলভাবে প্রকম্পিত করে। তার অন্তর্দ্বন্দ্বময়, রক্তাক্ত মননক্রিয়াকে ঔপন্যাসিক এক্সপ্রেশনিস্ট চিত্রশিল্পীর মত মেধাবী চিত্রকল্পে বিন্যস্ত করেছেন।[১২] চরিত্রের আত্মকথনে (interior monlogue) ভাষা হয়ে উঠেছে চিত্রকল্পময় :

(ক)'ওপরে ঝলমলে জ্যোৎস্না, কিন্তু সামনে নদী থেকে কুয়াশা উঠে আসছে। কুয়াশা না আর কিছু, হয়তো সে ঠিক বোঝে না। হয়তো একদল সাদা বকরী দেখে, যার শিং-দাঁত-চোখ কিছুই না। হয়তো মনে হয় রাত্রি গা-মোড়ামুড়ি দিয়ে উঠে বসেছে, চোখ-ধাঁধানো অন্তহীন জ্যোৎস্নালোকে জীবনের আভাস দেখা দিয়েছে।'[১৩]

(খ)'যুবক শিক্ষক জ্যান্ত মুরগি-মুখে হাল্কা তামাটে রঙের শেয়াল দেখেছে, বুনো বেড়ালের রক্তাক্ত মুখ দেখেছে, মানুষের দুঃখ-কষ্ট মহামারি-হাহাকার দেখেছে, কিন্তু কখনো বিজন রাতে বাঁশঝাড়ের মধ্যে যুবতী নারীর মৃতদেহ দেখে নাই। হত্যাকারী দেখে নাই।'[১৪]

বহির্বাস্তবতা রূপায়ণে ঔপন্যাসিকের এই চিত্রকল্পময় পরিচর্যা চরিত্রের মনোবিশ্লেষণের সঙ্গে সমীকৃত। জীবনে যে অভিজ্ঞতার মুখোমুখি আরেফ আলী হয়নি-'বিজন রাতে বাঁশঝাড়ের মধ্যে যুবতী নারীর মৃতদেহ দেখে নাই। হত্যাকারী দেখে নাই।' অপ্রত্যাশিতভাবে সেই দৃশ্যের মুখোমুখি হয়ে আরেফ আলীর 'মহাভয়' 'প্রাণভয়' হতে থাকে। 'ভয়' ক্রমাগত ভিন্ন চেহারায় রূপ নেয়- 'সাদা বকরী' 'যার শিং-দাঁত-চোখ কিছুই নাই। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর উপন্যাসত্রয়ের পঙক্তিপ্রবাহে 'ভয়' এবং ভীতিঅনুষঙ্গস্পর্শী শব্দ পুঞ্জের ব্যবহার যেমন মননে আবেগে জাগ্রত ও সুচিন্তিত , তেমনি নির্মিত ও নির্মীয়মান মানবসত্তা উন্মোচনে সচকিত ও আগ্রহী। 'ভয়' এবং ভীতিঅনুষঙ্গবাহী শব্দ 'লালসালু'তে ব্যবহৃত হয়েছে ৭০ বার; 'চাঁদের অমাবস্যা'য় ১৫০ বার এবং 'কাঁদো নদী কাঁদো' উপন্যাসে ১৭৫ বার। তুলনাসূত্র ও আভ্যন্তর উপাদান-সাক্ষ্য অনুসারে এ-তথ্য স্পষ্ট যে, 'লালসালু'র ভয় ও ভীতি শিহরণ অস্থির অন্তর্জ্বালাময় ও অস্তিত্ব-জিজ্ঞাসা 'চাঁদের অমাবস্যা'য় ঘণিভূত, বলয়িত ও তত্ত্বলগ্ন।'[১৫] ভীতি বিহ্বল, শঙ্কাগ্রস্ত আরেফ আলীর অস্তিত্বের স্বরূপ-নির্ণয়ে ঔপন্যাসিক পতঙ্গের উদাহরণ ব্যবহার করেছেন। দ্বিতীয় রাতে যুবতী নারীর মৃতদেহ সরানোর কাজে সে কাদেরকে প্রশ্নহীনভাবে সাহায্য করার পর আরেফ আলী আপন অস্তিত্বের স্বরূপ প্রত্যক্ষ করে এভাবে :

ক. 'কাদেরের পায়ের তলে সে যেন ঘৃণ্য বস্তু, শিড়দাঁড়হীন নপুংসক কীটপতঙ্গ কিছু।'
খ. 'যুবক শিক্ষক যেন তুচ্ছ কীটপতঙ্গ।'

আতঙ্ক-শিহরিত ব্যক্তি-অস্তিত্বের এস্বরূপ উন্মোচনের অন্তর্যাত্রা আবিষ্কারে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ অসাধারণ শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। বহির্বাস্তবতা ও অস্তিত্বকাঠামোর আনুভূমিক বৈশিষ্ট্য রূপায়ণে তিনি ব্যবহার করেছেন —

Dhaka University Institutional Repository

অভিব্যক্তিবাদী (expressionistic) পরিচর্যা কৌশল। ব্যক্তির একক অস্তিত্ব তখনই প্রতীয়মান হয়, যখন তা অপর সত্তায় প্রতিবিম্বিত হয়। আরেক আলীর আতঙ্কগ্রস্ত অস্তিত্ব আলোকিত হয়েছে কাদেরের ব্যক্তিসত্তার প্রতিস্মরণে। সত্তা ও অপরতার এই বাঙ্ময় সমীকরণে উন্মোচিত হয়েছে আরেফ আলীর অস্তিত্ব। মোট 'ষোল' অংশে বিন্যস্ত আরেফ আলীর আত্ম-অনুসন্ধান ও সংকটদীর্ণ অস্তিত্বের মননক্রিয়া প্রতিফলিত কাদেরের সঙ্গে উচ্চারিত অনুচ্চারিত সংলাপে। মূল ঘটনাস্থল হয়ে ওঠে আরেফ আলীর চেতনালোক, তাই বর্হিবাস্তবের আপাত পারম্পর্যহীন শৃঙ্খলা তার মস্তিষ্কের বিভ্রম-বাস্তবতার চেতনাপ্রবাহে বিন্যস্ত হয়। ঘটনার এই অন্তঃপ্রবাহসূত 'চাঁদের অমাবস্যা' উপন্যাসকে প্রথাগত প্লটবিন্যাসরীতি থেকে স্বতন্ত্র করেছে। 'ঔপন্যাসিক হিসেবে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ তত্ত্ব আশ্রয়ী নন ফর্ম-আশ্রয়ী। তত্ত্ব বা দর্শনশাসিত মনের কাছে চরিত্রচেতনা কিংবা পূর্বনির্ধারিত চিন্তাই মুখ্য মূল্য পায়। কিন্তু উপন্যাসের শিল্পগত সাফল্যের মূলে রয়েছে চেতনা ও কর্মের অন্তর্বয়ন।'[১৬] অবশেষে যুবক শিক্ষক অস্তিত্বের মানবিক দায়িত্ববোধ থেকে আত্মমীমাংসায় উপনীত হয়। কাদের যে হত্যাকারী কথাটা প্রকাশ না করে তার নিস্তার থাকে না।

> 'কথাটা প্রকাশ না করে তার উপায় নাই। উপায় থাকলে যে বলতো না। বাঁশঝাড়ে একটি নারী অর্থহীনভাবে জীবন দিয়েছে। তার বিশ্বাস, মানুষের জীবন এত মূল্যহীন নয়।'[১৭]

সর্বজনীন মানবিক বোধ থেকে যে হত্যাকান্ডের নেপথ্য কাহিনী প্রথমে দাদাসাহেবের কাছে ও পরে পুলিশের কাছে প্রকাশ করে। হত্যাকান্ডের কথা প্রকাশের মধ্য দিয়ে আরেফ আলীর আত্মজিজ্ঞাসা ও ক্রমমুক্তির তপস্যা হয়েছে পরিণামমুখী। 'মনে মনে যে-সব সম্ভাবনা সে দেখেছিলো, তা সত্যে পরিণত হয়ে তার সিদ্ধান্তকে অর্থপূর্ণ করেছে। .. সে সংগ্রাম পরের বিরুদ্ধে মনে হলেও আসলে নিজেরই বিরুদ্ধে ছিলো, সে-সংগ্রামে সে জয়লাভ করেছে।' এভাবেই 'চাঁদের অমাবস্যা' হয়ে উঠেছে অস্তিত্ববাদী উপন্যাস। অস্তিত্ববাদেরমূল কথা হচ্ছে, ব্যক্তি চৈতন্যে যা সত্য বলে উপলব্ধি করবে, তার দায় তাকে অবশ্যই বহন করতে হবে। আরেফ আলী নিজের নিরাপদ আশ্রয়, চাকরি, বিপন্ন অস্তিত্বের কথা পরিত্যাগ করে সত্য প্রকাশের দায়ে দাদা সাহেব ও পুলিশের শরণাপন্ন হয়েছে।

সে হয়ত ভেবেছিল, তার কথা কেউ বিশ্বাসই করবেনা কিংবা বিশ্বাস করলেও গ্রহণ করবে না অথবা সে চক্রান্তের শিকার হতে পারে, এমন কি বিচারের তার ফাঁসী পর্যন্ত হয়ে যেতে পারে। সত্য প্রকাশের পর আরেফ আলীর পরিণতি আমাদের সমাজের গূঢ় সত্য উন্মোচনে আরো ইঙ্গিতবাহী :

> 'পুলিশ-কর্মচারীর চোখ একবার ক্রোধে সঙ্কুচিত হয়ে ওঠে।.. .. সোজা হয়ে বসে কঠিন দৃষ্টিতে তাকিয়ে যুবক শিক্ষককে প্রশ্ন করে 'আপনার আর কিছু বলার নাই?'
>
> যুবক শিক্ষক উত্তর দেয় না।
>
> 'শুনছেন?' সাব ইন্সপেক্টর বলে। কনস্টেবলের বুটের আওয়াজ হয়।'[১৮]

পুলিশের 'ক্রোধ সঙ্কুচিকত চোখ' এবং 'বুটের আওয়াজ' থেকেই আরেফ আলীর পরিণতি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। হত্যাকারী কাদেরের পেছনে রয়েছে 'দরবেশ' অভিধা এবং অভিজাত পারিবারিক পটভূমি। তাছাড়া 'দাদাসাহেব' ধর্মপ্রাণ মানুষ।

Dhaka University Institutional Repository

চাকুরি জীবনে 'বিধর্মী' মনিবের প্রতি বিতৃষ্ণার রেশ ধরে গ্রামের বাড়িতে অবসর জীবনযাপন করতে এসে তিনি কঠোর হাতে তাঁর পরিবারে ধর্মীয় বিধিনিষেধ আরোপ করেন এবং গড়ে তোলেন একটি ধর্মীয় পরিমন্ডল। বাড়ির ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের ধর্মীয় নৈতিক শিক্ষাদানে তিনি সদা-সর্তক। কাদেরের মধ্যে একটা দরবেশি ভাব আছে সে-কথা তিনিই প্রচার করেন। কাদেরের পরিবারের এই সামাজিক ও ধর্মীয় মর্যাদার কাছে দরিদ্র স্কুল শিক্ষক আরেফ আলীর কথা যে মিথ্যা প্রমাণিত হবে এতো স্বাভাবিক।

২.

'চাঁদের অমাবস্যা' উপন্যাসটি যে শিল্পশৈলীর জন্য বিশিষ্ট, তা হচ্ছে Stream of coniousness বা চেতনাপ্রবাহশৈলী। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ জীবনদর্শন ও শিল্পাভিপ্রায়ে সন্দেহাতীতভাবে ছিলেন পাশ্চাত্য অনুসা রি। ঔপন্যাসিকের বক্তব্য থেকে জানা যায়-'উপন্যাসটির বেশির ভাগ ফ্রান্সের আলপস্ পর্বত অঞ্চলে পাইন-ফার-এলম গাছ পরিবেষ্টিত ইউরিয়াজ নামক একটি ক্ষুদ্র গ্রামে'বসে লেখা। একজন নিরাসক্ত সত্যদ্রষ্টা শিল্পীর দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলাদেশের সমজসত্যের অন্তর্মূলে প্রবেশ করতে গিয়ে তিনি এই শিল্পশৈলীর আশ্রয় গ্রহণ করা খুব স্বাভাবিক। যুদ্ধোত্তর পাশ্চাত্য ঔপন্যাসিক-ফ্রান্‌ৎয্ কাফ্কা (১৮৮৩-১৯২৪), আলবেয়ার ক্যামু (১৯১৩-৬০),ভার্জিনিয়া উলফ্ (১৮৮২-১৯৮১),উইলিয়াম ফক্‌নার (১৮৯৭-১৯৬২), জেমস্ জয়েস (১৮৮২-১৯৪১) প্রমুখ চেতনাপ্রবাহ ধারায় উপন্যাস রচনা করেন। পাশ্চাত্য শিল্পাদর্শ-স্নাত সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ বাংলা উপন্যাসে এই শৈলী প্রয়োগ করতে গিয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন আমেজ সৃষ্টি করেছেন।

জয়েসের'ulysses'(১৯২২) -এর Stephen,'To The Lighthouse'এর Mrs. Ramsay-র মনন বিন্যাসের সঙ্গে আরেফ আলীর মানস ক্রিয়ার কোনো মিল নেই। জয়েসের ulysses এর মত 'চাঁদের অমাবস্যা'-তেও কোনো নাটকীয়তা নেই। হত্যা এবং হত্যাকারীকে আমরা প্রথম অধ্যায়ে জেনে ফেলি,তারপর কাহিনীর যে অগ্রগতি তা হত্যাকারী নয় হত্যার দৃশ্য অবলোকনকারী বা একমাত্র সাক্ষী আরেফ আলীর মনন ক্রিয়াতেই বিন্যস্ত। সাক্ষী হিসেবে তার দায়ই বেশি, কারণ হত্যার দৃশ্যটি তার সমস্ত জীবনের নির্মল অভিজ্ঞতাকে আঘাত করেছে এবং তার স্বাভাবিক জীবনের সমস্ত শান্তি নষ্ট করে দিয়েছে।

প্রথামাফিক প্রাত্যহিক কাজগুলো করতে গিয়ে হঠাৎ তার বিচ্যুতি ঘটে। শ্রেণী কক্ষে ভূগোল পড়াতে গিয়ে সে অন্যমস্ক হয়ে পড়ে :

> ক. 'আরেফ আলী অনেকক্ষণ অন্যমস্ক হয়ে থাকে। একসময়ে হঠাৎ সচেতন হয়ে সে লক্ষ্য করে, ছাত্রদের কোলাহল ঝড়ের বেগ ধারণ করেছে।... .. অন্যদিন তীক্ষ্ণ গলায় তবু হৃদ্যতার সঙ্গে শিক্ষক আরেফ আলী আঙুল নেড়ে শাসন করতো। আজ কেমন শ্রান্ত গলায় বলে,"না না, গোলমাল করো না।"[১৯]

> খ. 'একটি দৃশ্যই কেবল তার চোখে ভাসে। সে-দৃশ্য থেকে তার নিস্তার নাই, তার মনে প্রাণে ও দেহের রন্ধ্রে রন্ধ্রে বিভীষিকাময় ছায়া।'[২০]

Dhaka University Institutional Repository

(গ)'হঠাৎ সচেতন হয়ে যুবক শিক্ষক লক্ষ্য করে, ক্লাসঘরে অখণ্ড নীরবতা। .. .. এধার ওধার তাকিয়ে অবশেষে আমজাদকে জিজ্ঞাসা করে 'কী ? বলেছ উপদ্বীপের নাম ?' আমজাদ প্রতিবাদ করার আগেই সজোরে মাথা নেড়ে বলে, 'কী বলছি ! উপদ্বীপ নয়, নদীর নাম।'

আমজাদ নিরুত্তর হয়ে থাকলে পেন্সিল দিয়ে টেবিলে আওয়াজ করে কৃত্রিম বিস্ময়ের সঙ্গের আরেফ আলী বলে 'কী ? ভুলে গেছ সব ?' কয়েক মুহূর্ত নীরবতার পর আমজাদ শিক্ষকের দিকে সোজা তাকিয়ে গম্ভীরভাবে প্রশ্ন করে, "স্যার, আপনার আজ শরীর ভালো নয় ?"[২১]

বহির্বাস্তবতার সঙ্গে এভাবে আরেফ আলী অসংলগ্ন হয়ে ওঠে। ক্রমশ সে পরিপার্শ্ব বিচ্যুত হয়ে মনন অভিযাত্রায় অগ্রসর হয়। আরেফ আলীর এই চেতন-অবচেতন-সচেতন মনের দ্বন্দ্ব জটিল পরিস্থিতিকে ঔপন্যাসিক চেতনাপ্রবাহশৈলীতে বিন্যাস্ত করেছেন। চেতনাপ্রবাহশৈলীর উপন্যাসের দুই শিল্পকৌশল- অন্তর্বিশ্লেষণ (internal analysis) এবং অনুচ্চারিত মনোকথন (interior monologue), 'চাঁদের অমাবস্যা' উপন্যাসে এই উভয় শৈলীই ব্যবহৃত হয়েছে। এই দুই শৈলীর পরিচর্যার আরেফ আলীর সংকটদীর্ণ, ভীত-বিহ্বল মনের আত্ম-অন্বেষণ, ক্রমমুক্তির তপস্যা ও জাগ্রত বিবেকের রক্তাক্ত চেতনা বিম্বিত।

ক. অন্তর্বিশ্লেষণ (internal analysis) :

'ঘটনাটি প্রকাশ না করার পক্ষে যে সব যুক্তি সে পরিষ্কারভাবে ভাবতে সাহস পায় নাই, এবার সে-সব যুক্তি বিশ্লেষণ করে দেখতে তার আর বাধে না। চারপাশে খোলা মাঠ, আর বাধা কোথায়? প্রথমত, সে নিজের কথা ভাবে। কে সে? একজন দারিদ্র শিক্ষকমাত্র। .. .. কার জন্যই বা সে নিজের সর্বনাশ করবে? যুবতী নারী তার আত্মীয় বন্ধু নয়, তার মৃত্যুতে সে ব্যক্তিগতভাবে কোন প্রকারে ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই। এই হতভাগা দেশে কত কত যুবতী নারীর জীবন অর্থহীনভাবে এবং অকারণে শেষ হয়। কে প্রতিবাদ করে, কে একবার ফিরে তাকায় ? সেখানে জীবন মূল্যহীন সেখানে আরেকটি জীবন শেষ হয়েছে। কিভাবে হয়েছে, তাতে কোন অন্যায় অবিচার হয়েছে কি না, সে বিষয়ে মাথা ঘামিয়ে সে নিজের উপর বিপদ ডেকে আনবে কেন ?

তারপর কাদেরের কথা। হোক তার অপরাধ অতি গুরুতর বা যুবতী নারীর সঙ্গে তার সম্পর্কের কারণ পশুবৎ বাসনা, হোক সে নির্মম-নির্দয় মানুষ। তবু সে যুবক শিক্ষকের কোন ক্ষতি করে নাই। তাছাড়া, কাদের তার বন্ধু না হোক, সে তার শত্রুর নয়; তার প্রতি সে হিংসাদ্বেষ বা প্রতিহিংসার ভাব বোধ করেনা। কাদেরের সঙ্গে লড়াই করে তার কি লাভ হবে, কারইবা সে মঙ্গল করবে?[২২]

আরেক আলীর এই অন্তর্বিশ্লেষণ চেতনাপ্রবাহশৈলীর একটি উল্লেখযোগ্য পদ্ধতি। 'চাঁদের অমাবস্যা' উপন্যাসে আরেফ আলীর আত্মদ্বন্দ্ব এবং আতঙ্ক-শিহরিত মনের যুক্তিকে এই অন্তর্বিশ্লেষণের সাহায্যে উপস্থিত করেছেন লেখক। আরেক আলী কখনো হত্যার ঘটনা প্রাকশের পক্ষে আত্মযুক্তির বাঁধাহীন পথের সন্ধান পায় আবার অকস্মাৎ তার মনে সামাজিক বাঁধার শঙ্কাময় যুক্তি সে পথকে রুদ্ধ করে ফেলে।

খ. অনুচ্চারিত মনোকথন (interior monologue) পদ্ধতিতের ঔপন্যাসিক আরেফ আলীর সংকটদীর্ণ মনের এই পরিস্থিতি তুলে ধরেছেন :

'যুবক শিক্ষক একটি বিচিত্র কথা লক্ষ্য করে। .. .. না বলার পক্ষে কারা অতি আগ্রহের সঙ্গে সে-সব যুক্তি জুগিয়ে দিয়েছে ? জীবিত মানুষেরা। জীবিত মানুষরা তাদেরই কথা বলছে, মৃতমানুষের কথা বলছেনা। তারপর আরেকটি কথা সে বুঝতে পারে,

Dhaka University Institutional Repository

জীবিত মানুষের পক্ষে জীবিত থাকার জন্যে আকুল আকাঙ্ক্ষা, বা জীবন থেকে যতটুকু পারা যায় লাভ-সুবিধা আদায় করার তীব্রবাসনা আপত্তিজনক নয়, কিন্তু যারা যুক্তিগুলি পেশ করছে তারা যেন নামেই শুধু জীবিত। আসলে তারা মৃত, তাদের জীবনও ধার-করা জীবন। তা না হলে তারা মৃত নারীর প্রতি কোনো সমবেদনা বোধ করবে না কেন, যে মানুষ তার মৃত্যু ঘটিয়েছে তার প্রতি ঘৃণাবোধ করবেনা কেন ? জীবনের ব্যাপারে তারা প্রতারক বলেই তাদের মনে এত ভীতি, সত্য ঘটনাটি লুকাবার জন্যে এত অধীরতা, এত শঠতা।'[২৩]

এই অনুচ্চারিত মনোকথনের মধ্যে আরেক আলীর আত্মদ্বন্দ্ব কাটিয়ে তার বিবেকী জাগরণ ও আত্মমুক্তির প্রত্যাশা যেমন লক্ষ্য করা যায়, তেমনি, সামাজিক বাধার দিকও প্রতিফলিত হয়। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ অসাধারণ শিল্পকৌশলে তা বিন্যস্ত করেছেন। ইউরোপীয় দুই ঔপন্যাসিক, আলবেয়ার কাম্যুর 'দ্য আউট সাইডার' এবং ফ্রানৎয্ কাফ্‌কার 'দ্য ট্রায়াল'-এর সঙ্গে কিছুটা মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

ক.কখন সে মৃতদেহ প্রথম দেখে ? একঘন্টা, দু ঘন্টা আগে ? হয়তো ইতিমধ্যে এক প্রহর কেটে গেছে, কিন্তু যুবক শিক্ষক সে কথা বলতে পারবেনা।[২৪]

খ.সেখানে আলো-অন্ধকারের মধ্যে যুবক শিক্ষক একটি যুবতী নারীর অর্ধ-উলঙ্গ মৃতদেহ দেখতে পায়। অবশ্য কথাটা বুঝতে তার একটু দেরি লেগেছে, কারণ তা ঝট্ করে বোঝা সহজ নয়। .. .. তারপর বাঁশির আওয়াজ সুতীব্র হয়ে ওঠে। অবশ্য বাঁশির আওয়াজ সে শোনে নাই।[২৫]

আলবেয়ার কাম্যুর 'দ্য আউট সাইডার'-এর চরিত্রের কাছেও এই বিভ্রম চেতনার বিন্যাস লক্ষ করা যায় :

'আমার মা মারা গিয়েছেন। আজ না বিগতকাল, আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারব না।'[২৬]

শিল্পশৈলীর প্রশ্নে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর এই অনুস্মরণ 'চাঁদের অমাবস্যা'র উপন্যাসের গঠন কাঠামো ও বক্তব্য প্রকাশে অধিক সাহায্য করেছে। সর্বোপরি যুক্তির শৃঙ্খলা ও আরেক আলীর দ্বিধাদীর্ণ মনোজাগতিক রহস্য উন্মোচনে এই শৈলীর প্রয়োগ ছিলো অবিকল্প, অনিবার্য। ঘটনা কিংবা চরিত্র নয়, ঘটনা-উত্তর ঘটনার প্রতিক্রিয়া আবিষ্কারে চেতনাপ্রবাহ শৈলীর তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। আরেক আলীর দ্বিধামুক্তি তথা হত্যার ঘটনা প্রকাশের মধ্য দিয়ে তার বিবেকী জাগরণে একথা প্রমাণিত হয়েছে যে, অমাবস্যার অন্ধকার ক্ষণস্থায়ী, আলোই একমাত্র সত্য, স্থায়ী এবং উপন্যাসের নামার্থ ব্যঞ্জিত হয়েছে এভাবে।

৩.

উপন্যাসের ভাষা, তার শিল্পকাঠামোরই একটি অংশ। 'চাঁদের অমাবস্যা' চেতনাপ্রবাহ শিল্পশৈলীর উপন্যাস, এর ভাষা অনুসৃত শিল্পশৈলী অনুসারেই বিন্যস্ত। দু'জন সমালোচক বলেছেন, 'এ উপন্যাসের যে ভাষার ব্যবহার লেখক করেছেন তাতে ফরসি আঙ্গিকে বাংলায় তার একটি নিজস্ব লেখ্যভঙ্গি তৈরি হয়েছে।'[২৭] চেতনাপ্রবাহশৈলী ব্যবহারের ফলে এ উপন্যাসের ভাষা পাঠকের সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যম হারিয়ে ফেলেছে।[২৮] দু'টি অভিমতের কোনটিই

Dhaka University Institutional Repository

গ্রহণযোগ্য নয়। বস্তুত বিষয় ও শিল্পশৈলীর অনিবার্য প্রয়োজনে ঔপন্যাসিক বিশেষ ভাষাশৈলী গ্রহণ করেছেন। এসম্পর্কে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ বলেছেন- 'এই বইয়ের ভাষা আমি ইচ্ছাকৃতভাবেই 'ফলটরিং' (faltering) করেছি। দ্বিধাগ্রস্ত যুবক শিক্ষকের বিলম্বিত চৈতন্যকে ফুটিয়ে তোলার জন্য কিছুটা হোঁচট খাওয়ার ভঙ্গি তৈরি করতে হয়েছে। আমি অবশ্য আরো জটিল করতে পারতাম ফক্‌নারের 'দি সাউন্ড অব ফিউরী'-র মত। কিন্তু ইংরেজী ভাষা, বিশেষ করে গদ্য ভাষা যে সমস্ত শিল্পগত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ,বাংলা তো তা নয়; বাংলা লিখিত গদ্যের চলাচলও দীর্ঘ নয়। তাই একটা সীমাবদ্ধতার মধ্যে আমাকে কাজ করতে হয়েছে। একবার ভেবেছিলাম, ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের গদ্যভঙ্গির সঙ্গের আধুনিক গদ্যভঙ্গির মিশ্রণ ঘটিয়ে চরিত্রের দ্বিধা-দ্বন্দ্বকে স্পষ্ট করব, কিন্তু গল্পের গ্রহণযোগ্যতা নষ্ট হবার ভয়ে সে দিকে অগ্রসর হইনি।'[২৯] ঔপন্যাসিকের এই স্বীকারোক্তি থেকে বোঝা যায়, উপন্যাসের শিল্পশৈলীর উপযোগী একটি ভাষার কথা সচেতনভাবে চিন্তা করেছেন। বলেছেন, 'ইচ্ছাকৃতভাবে ফলটারিং (faltering) করেছি।' অর্থাৎ ভয়ে বা দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে ভগ্নস্বরে বলা- ভাষাভঙ্গিকে তিনি 'চাঁদের অমাবস্যা' উপন্যাসে ব্যবহার করেছেন।

উপন্যাসের কাহিনীকেন্দ্রে চরিত্রের সংখ্যা মাত্র তিন- যুবক শিক্ষক আরেফ আলী, কাদের এবং দাদাসাহেব। তিনটি চরিত্রের মধ্যে দাদাসাহেবের চরিত্রটির তেমন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেই- পারিবারিক আভিজাত্য ও ধর্মীয়, আধ্যাত্মিক আবহ সৃষ্টির নেপথ্য ছায়া হিসেবে তাকে কাহিনীর পটভূমিতে স্থাপন করা হয়েছে। কাদেরকে দরবেশ বলে প্রচার করা এবং তার দরবেশি লাভের বৃত্তান্ত সবই দাদাসাহেব কথিত। কাদেরের বিকৃত স্বভাব ও অসামাজিক আচরণকে দাদাসাহেব এমন এক ধর্মীয় মাহাত্ম্য আরোপ করেছেন যে, তার প্রতি কোনো মন্দ ধারণা পোষণ করা যায় না। ঔপন্যাসিক, দাদাসাহেব প্রতিষ্ঠিত ধর্মমূল্যাশ্রয়ী সামাজিক ধারণার কেন্দ্রমূলে আঘাত করেছেন, কারণ সে ধারণা মিথ্যা, আরোপিত। দাদাসাহেব প্রসঙ্গে বর্ণিত ঔপন্যাসিকের ভাষা যথার্থই তার চিন্তা ও চরিত্রের অনুগামী। তৎকালীন বাঙ্গালি মুসলমান সমাজের উদ্ভট ঐতিহ্যবোধ ও অলিক জাত্যাভিমানী মনোভাবের প্রতিনিধি :

> 'আজ সে ধন-সম্পদ বা মানইজ্জত নাই, কিন্তু এককালে চারধারে তাঁদের বড় নাম-ডাক ছিলো। তখন তারা বিশাল জমিদার মালিক ছিলেন। তাদের ঘোড়াশালে তখন ঘোড়াছিল, হাতিশালে হাতি। খিল্লাত পরিধান করে রেশমের খরিতায় পত্রাদি বাঁধতেন; খাশমহল, আতর-বাইদমস্কের সুগন্ধিতে ভরপুর করতো এবং বিশেষ উৎসবের দিনে বাদশাহি কায়দায় পথে-ঘাটে মোহর ছড়াতেন। তখন আবাদর-চোবদার রাখতেন গণ্ডায় গণ্ডায় সবের-সেবন্দিও পুষতেন। আজ সেদিন আর নাই।'[৩০]

আরবি-ফারসি শব্দের বহুল ব্যবহার- 'মানইজ্জত (সম্মান, সম্ভ্রম, সতীত্ব, আবরু) মালিক (অধিকারি, প্রভু) খিল্লাত (রাজদত্ত সম্মানসূচক পোষাক) খরিতায় (রেশম কাপড়ের তৈরি থলি বিশেষ) বাদশাহি কায়দায় (রাজকীয় নিয়মে) মোহর (স্বর্ণের তৈরি মুদ্রা বিশেষ) আবাদার (বায়না) চোবদার (ভারি অস্ত্রের বাহক) সবের-সেবন্দি (শুশ্রূষাকারী, পরিচারক, ভৃত্য, ভক্ত ইত্যাদি) উদ্ধৃতির মোট তেত্রিশটি শব্দের ছয়টি বাক্যের মধ্যে তেরিটি শব্দ ফারসি এবং দুইটি শব্দ (জমিদার, মালিক) আরবি। শব্দ ব্যবহারের এই পরিসংখ্যান থেকে বোঝা যায় সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহ চরিত্রের আবহ অনুযায়ী ভাষা তৈরিতে কতটা সর্তক ছিলেন।

ঔপন্যাসিকের বর্ণনায় 'কাদের সম্পূর্ণভাবে নিষ্কর্মা। অত্যন্ত স্বল্পভাষী এবং অসামাজিক বলে তার মনের পরিচয় পাওয়া দুষ্কর, কিন্তু তার বাইরের চেহারা স্বভাবত নিদ্রালস। নিদ্রালস ভাব কাটলে চরম উদাসীনতা নামে তার মুখে।'

Dhaka University Institutional Repository

কাদেরের এই পরিচয় থেকে তার চরিত্রের স্বরূপ বোঝা যায়। উপন্যাসে তার সংলাপও স্বল্প, দূরাগত, কখনো প্রসঙ্গহীন, রহস্যময় এবং খনখনে গলার :

> "কী বললেন ?"
>
> কাদের দৃষ্টি পূর্ববৎ লণ্ঠনের ওপর নিবদ্ধ। একটু চুপ থেকে সে কেমন খনখনে গলায় বলে, "তোস্‌তারী কিংখাবের কথা বলছিলাম।"
>
> *আরেকটি বিসদৃশ জিনিশ: খনখনে গলা। মুখের সঙ্গে মানায় না!*
>
> "তোস্‌তারী কিংখাব ?"
>
> "শোনেন নাই"
>
> গলা আরো নম্র করে যুবক শিক্ষা উত্তর দেয় "না।"
>
> "পুরানো আমলের জিনিস। সিন্ধুকে তালা বন্ধ থাকে।"
>
> *যুবক শিক্ষক বোঝে, উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত কোন মূল্যবান বস্তু'র কথা কাদের বলছে, কিন্তু সে-কথার আকস্মিক উত্থাপনের অর্থ সে বোঝে না।* '[৩১]

'তোসতারী কিংখাব' আসলে সামন্ত মূল্যবোধ ও নানা বিধি-নিষেধের ক্ষয়িষ্ণু প্রতীক। বড় বাড়ি দরবেশ নামে পরিচিত স্বল্পভাষী, অমিশুক কাদের জ্যোৎস্নারাতে বাঁশ ঝাড়ে একটি হত্যাকান্ড ঘটানোর পর দ্বিতীয় রাতে আরেফ আলীর কাছে আসে এবং প্রায় প্রসঙ্গহীনভাবে 'তোসতারী কিংখাব'-এর কথা বলে, তখন বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, কাদের তার পরিবারের সম্ভ্রান্ত ঐতিহ্যের কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চায় যুবক শিক্ষককে। পুরো উপন্যাসে তার ভাষা প্রায় প্রসঙ্গহীন, ছেঁড়া, ছেঁড়া, ইঙ্গিতময়। আরেফ আলীর আত্মদ্বন্দ্বময়, আতঙ্ক শিহরিত মনন অভিযাত্রার বিপরীতে কাদেরের ছেঁড়া ছেঁড়া, ইঙ্গিতময় সংলাপের বিন্যাস উপন্যাসের শিল্পশৈলীকে বাঙ্ময় করে তুলেছে :

> "মেয়েলোকটাকে চিনতেন ?"
>
> .. .. .. সে বলে, "না"
>
> "সে বেঁচে না বা কীভাবে মরেছে, তাতে আপনার কি ?"
>
> .. .. .. কাদেরথেমে আবার বলে, "কিন্তু দুর্ঘটনার কথা কাউকে বললে আমার কি হবে জানেন ?"
>
> .. .. .. "ফাঁসী।" থেমে আবার বলে, "তাতে আপনার লাভ কি হবে ?"

আরেফ আলী এবং কাদেরের এ সংলাপের ভাষা সাবলীল কিন্তু শানিত। 'চাঁদের অমাবস্যা' উপন্যাসে আরেফ আলীর মনের চেতন-অবচেতন লোকের ভাবনাধারা প্রকাশে যে ভাষাশৈলী ব্যবহার করেছেন, ঔপন্যাসিকের স্বীকারোক্তি মতে তা 'ফলটারিং (falterting)' অর্থাৎ দ্বিধা বা আতঙ্কগ্রস্ত মনের ভাষা :

Dhaka University Institutional Repository

ক. 'তারপর বাঁশীর আওয়াজ সুতীব্র হয়ে ওঠে। অবশ্য বাঁশীর
আওয়াজ সে শোনেনি।
খ. কখন সে মৃতদেহ প্রথম দেখে ? একঘন্টা, দুঘন্টা আগে ?
হয়তো ইতিমধ্যে একপ্রহর কেটে গেছে, কিন্তু যুবক শিক্ষক
সে কথা বলতে পারবে না।

আরেফ আলীর দ্বন্দ্বময় মনের পরিস্থিতি উদ্‌ঘাটনে এই 'হাঁ' এবং 'না' বোধক বাক্যবন্ধ যথার্থ। আত্মজিজ্ঞাসায় ক্রম-অগ্রসরমান যুবক শিক্ষকের মনোকথনের ভাষা :

'বাড়ি ফেরবার পথে যুবক শিক্ষকের তৃপ্ত-মনে হঠাৎ অপ্রীতিকর একটি সন্দেহের ছায়া উপস্থিত হয়। যুবতী নারীর হত্যাকারী কে, সে নিজেই নয় ? সে যদি কাদেরকে অনুসরণ না করতো, অপ্রত্যাশিতভাবে এবং অকারণে বাঁশঝাড়ের সামনে উপস্থিত না হতো, তবে দুর্ঘটনাটি ঘটতো না।
একটু ভেবে সে নিজেকে দোষমুক্ত করে। একথা-সত্য যে বাঁশঝাড়ে সে উপস্থিত না হলে মর্মান্তিক দুর্ঘটনাটি ঘটতো না, কিন্তু অন্যদিন অন্যখানে অন্য কোন প্রকারে হয়তো এমন একটি অকর্মের সৃষ্টি হতো। আসল হত্যাকারী সে নয়, কাদেরের মনের গভীর ভীতি। সে ভীতির মূলে সিন্দুকে লুকানো তোস্‌তারী কিংখাব হতে শুরু করে নানাবিধ নিষেধাজ্ঞা।' [৩১]

'সে নিজেই নয়' 'না করতো' 'না হতো' - 'তবে দুর্ঘটনাটি ঘটতো না'- এভাবে না-অব্যয় ক্রিয়াপদের পূর্বে বসিয়ে যুবক শিক্ষক আত্মনিরীক্ষা ও আত্মজিজ্ঞাসায় নিজেকে দোষী সাব্যস্ত করা এবং মুহূর্তে আবার দোষমুক্ত ভাবার মধ্যে ভাষার তীর্যকতা প্রকাশ পেয়েছে। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর গদ্যের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বর্ণনা নয় বিশ্লেষণ। আরেফ আলীর ভাষা হয়ে উঠেছে বিশ্লেষণাত্মক, তাই বাক্যের গঠন কখনো দীর্ঘ কখনো ছোট,কখনো সাধুক্রিয়া (তখনো কুয়াশা নাবে নাই, সে শোনে নাই) কখনো আঞ্চলিক শব্দের পাশে চলতি শব্দের মিশ্র প্রয়োগ (সাধারণ জীবনের নকসার সঙ্গের তার জীবনের মিলজুক নাই, শিয়াল কিংবা মাঠালী ইঁদুর, মাটির দলায় হুমড়ি খেয়ে পড়ে) লক্ষ্য করা যায়। অর্থাৎ সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ 'চাঁদের অমাবস্যা' উপন্যাসের ভাষাশৈলীর ক্ষেত্রেও চেতনাপ্রবাহ শিল্পশৈলী উপযোগী এ স্বতন্ত্র গদ্যভাষা উদ্ভাবন করেন।

প্রকৃতপক্ষে উপর্যুক্ত দৃষ্টিকোণ, প্রকরণপরিচর্যা, পরিমার্জিত জীবনবোধ ও হৃদয়ধর্মের বিচিত্র জাগরশক্তি হিসেবে মানুষকে চিহ্নিত করেছেন সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ 'চাঁদের অমাবস্যা' উপন্যাসে। মানুষের হৃদয়ধর্মের অপার শক্তি অনুধাবনে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ পাশ্চাত্য শিল্পশৈলী ও অস্তিত্ববাদী,জীবনবোধাশ্রয়ী। এক্ষেত্রে তিনি সমকালীন অন্য ঔপন্যাসিকদের থেকে স্বতন্ত্র পথচারী,বিবেককেন্দ্রিক আত্মজাগরণের পক্ষপাতী। তাঁর উপন্যাসের গঠনকাঠামো সুনিপুণ, ভাষা-শৈলী নির্মাণে প্রযত্ন প্রয়াসী, জীবনার্থ সন্ধানে ভাবাবেগমুক্ত, মনোবিশ্লেষণে প্রোজ্জ্বল। 'চাঁদের অমাবস্যা' একই সঙ্গে অস্তিত্বাশ্রয়ী, চেতনাপ্রবাহশিল্পশৈলীর উজ্জ্বল শিল্পকর্ম।

Dhaka University Institutional Repository

কাঁদো নদী কাঁদো

'কাঁদো নদী কাঁদো (১৯৬৮) বাংলাদেশের সাহিত্যে চেতনাপ্রবাহশৈলীর অন্যতম সফল উপন্যাস এবং একাধিক অর্থে ব্যতিক্রম, স্বতন্ত্র। এ উপন্যাসের বিষয়, ভাষা, গঠনকাঠামো,শিল্পশৈলী-প্রতিটি ক্ষেত্রেই প্রথা-অতিক্রমী, এমন কি, সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহ (১৯২২-৭১) তাঁর পূর্ববর্তী উপন্যাস সমূহকেও অতিক্রম করে গেছেন এখানে। 'কাঁদো নদী কাঁদো' উপন্যাসের আলোচনা প্রসঙ্গের সমালোচকগণ জাঁ পল সার্ত্র (১৯০৫-৮০) ও আলবেয়ার কাম্যুর (১৯১৩-১৯৬০) দর্শনচিন্তা ও শিল্পপ্রভাবের কথা উল্লেখ করলেও একথা অনস্বীকার্য যে, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ এ উপন্যাসের আঙ্গিক বিন্যাস ও শিল্পভাবনায় পরিস্রুত,স্বয়ম্ভু চিন্তার স্বাক্ষর রেখেছেন। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর জীবনদর্শন ও শিল্প অবিপ্রায়ে যুদ্ধোত্তর পাশ্চাত্য প্রভাব সক্রিয়ছিল। সৃষ্টিশীল জীবনের দীর্ঘসময় [৩৩] তিনি ফ্রান্সে অবস্থান করেন এবং সমকালীন ফরাশি শিল্প-আন্দোলন সমূহের সঙ্গে যুক্ত ও অনেক লেখক শিল্পীর সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত যোগাযোগ ছিলো। তাঁর 'প্যারিস আগমনের কিছু পূর্বে, বর্তমান শতাব্দীর পাঁচ দশক থেকেই ফরাসি সাহিত্যে বিশেষত উপন্যাস ও নাটকে নতুন চিন্তাকে প্রাধান্য দানের প্রচেষ্টা লক্ষণীয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালের নিরীশ্বর অস্তিত্ববাদী ঔপন্যাসিক-নাট্যকারদের পাশাপাশি নাতালি সারেৎ (জন্ম১৯০২), ক্লদ সিমঁ (জন্ম ১৯১৩), আল্যা রব গ্রীয়ে (জন্ম১৯১২) মিশেল ব্যুতের (জন্ম১৯২৬) প্রমুখ ঔপন্যাসিকের মাধ্যমে 'নুভো রমাঁ' বা নব্য-ঔপন্যাসিক আন্দোলন বিস্তার লাভ করে।'[৩৪] 'কাঁদো নদী কাঁদো' উপন্যাসের আঙ্গিক গঠন ও শিল্পচেতনায় ঐসব অভিজ্ঞতা নিশ্চয় সক্রিয় ছিলো। সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহর শিল্পস্বভাবে যে ক্রম-উত্তরণ লক্ষ্য করা যায়। তার মূলে রয়েছে ইউরোপের উপন্যাসশিল্পের বিষয় ও আঙ্গিক চেতনার অঙ্গীকার। 'কাঁদো নদী কাঁদো' উপন্যাসের আন্তঃসম্পর্কযুক্ত ঘটনাপ্রবাহের (chin of interlinked events) বিন্যাসে ঘটনা ও চরিত্রের বহির্শৃঙ্খলা ও বহিরাচরনের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন ঔপন্যাসিক। চরিত্র সমূহের অন্তমুখ-চেতনা উন্মোচনসূত্রেই এ-উপন্যাসের ঘটনা বিধৃত হয়েছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তীকালে উদ্ভূত চেনাপ্রবাপহ পদ্ধতিমূলক (Stream of consciousness method) উপন্যাসের প্রকরণ-বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে 'কাঁদো নদী কাঁদো'র সাদৃশ্য আবিষ্কার অনায়াসসাধ্য। কিন্তু স্মরণীয় যে, চেতনাপ্রবাহ শব্দটি উনিশ শতকীয় মনোবিজ্ঞানী উইলিয়াম জেমসের (১৮৪২-১৯১০) উদ্ভাবনা। ফ্রয়েডের স্বপ্নসূত্র ব্যাখ্যার বৈপ্লবিক প্রভাব এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর সময় স্বভাবের আন্তরক্রিয়ায় চেতনাপ্রবাহরীতির উপন্যাস শিল্পস্বীকৃতি লাভ করে।'[৩৫] 'কাঁদো নদী কাঁদো' উপন্যাসের ফর্ম-পরিচর্যায় এই শিল্প-অভিজ্ঞতার পরিচয় স্পষ্ট। অস্তিত্বের দ্বিবিধ মাত্রা অর্থাৎ এক সত্তার দর্পণে আরেক সত্তার প্রতিবিম্বন, স্মৃতি ও চেতনার সাহায্যে অতীত-বর্তমানের অন্তর্বয়ন, সমষ্টিজীবনের সঙ্গে ব্যক্তির বিচূর্ণসত্তাকে বস্তুলোকের জীবনকাঠামোর সঙ্গে অন্বিত করে অভিন্ন উপন্যাসের শিল্পায়তনে বিন্যস্ত করেছেন সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ।

২.

'কাঁদো নদী কাঁদো' উপন্যাসের কাহিনী বিন্যস্ত হয়েছে সত্তা এবং অপরতার উপলব্ধির মাধ্যমে।সত্তা তখনই অস্তিত্ববান ও তাৎপর্যময় হয়ে ওঠে, যখন সে অপর সত্তার দপর্ণে বিম্বিত হয়। এই প্রক্রিয়াকে মিখাইল মিখাইলভিচ বাখতিন (১৮৯৫-১৯৭৫) বলেছেন দ্বিবাচনিকতা (dialogism)। The Dialogical Imagination[৩৬] গ্রন্থে বাখতিন বলেছেন, মানুষের পৃথিবীতে কোনো কিছুই নিজে নিজে সম্পূর্ণ নয় ; উপন্যাস গড়ে ওঠে কেন্দ্র ও পরিধির টানাপোড়েনে, সত্তা ও অপরতার বিবর্তনশীল সম্পর্কের বিন্যাসে। দ্বিবাচনিক জীবন-বীক্ষণ অনুযায়ী জীবন মানে

Dhaka University Institutional Repository

অভিব্যক্তি আর অভিব্যক্তি মানে তাৎপর্যের সন্ধান। 'কাঁদো নদী কাঁদো' উপন্যাসে মুহাম্মদ মুস্তফার চরিত্রটি প্রতিফলিত ও উন্মোচিত করার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে অপর সত্তার আলো। অর্থাৎ কথক-১ 'আমি' (মুহাম্মদ মুস্তফার চাচাতো ভাই) কথক-২, তবারক ভূইঞার স্মৃতি ও চেতনার অর্ন্তবয়নে (intertextuality) বিচ্ছুরিত আলো দিয়ে মুহাম্মদ মুস্তফার অন্তঃজীবন ও আপাত বিচ্ছিন্ন কুমুরডাঙ্গা নামক জন পদের স্বরূপর ব্যাখ্যা করেছেন। জীবন যেহেতু সময় এবং পরিধির মধ্যে অবস্থান করে, তাই কোনো উচ্চারণই একবাচনিক নয়, দ্বিবাচনিক, সত্তা এবং অপরতার দ্বিবাচনিক প্রক্রিয়া ঘটে ভাষা-বয়নে, আখ্যান গ্রন্থনায়, চরিত্র উপস্থাপনায় সত্তা এবং অপরতার দ্বিবাচনিক প্রক্রিয়ায় সহসা বিস্মিত সমাজ বা ক্যুমিউনিটি তথা বহির্বাস্তবতার বহুধা পরিস্থিতি। বাখতিন, উপন্যাসের এই দ্বিবাচনিকতা (dialogism) থেকে বহুবাচনিকতায় উত্তীর্ণ হওয়াকে স্বরসঙ্গতি (polyphony) বলেছেন। 'এ-উপন্যাসের গঠন প্রক্রিয়া লক্ষণীয়, তবারক ভুইঞার সংলাপাশ্রয়ী স্মৃতি-অনুষঙ্গের শব্দরূপ পেয়েছে বহির্বাস্তবময় বিচ্ছিন্ন-কুমরডাঙ্গার আতঙ্কগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর অস্তিত্বভীতি ও ভীতিমুক্তি। অপর পক্ষে তবারক ভুইঞার উচ্চারিত সংলাপে ঔপন্যাসিকের অভিজ্ঞতা আন্দোলিত ও উদ্ভাসিত চেতনাপ্রবাহের শব্দরূপ হলো মুহাম্মদ মুস্তফার মনস্তাপ ও আত্মবিলুপ্তির ইতিকথা।'[৩৭] অভিনিবেশের সঙ্গে লক্ষ করলে দেখা যাবে, এ উপন্যাসের পুরো কাহিনী বলিয়ে নেয়া হয়েছে ঘটনার সঙ্গে সম্পর্কিত দু'জন কথকের (কথক'আমি' ববং তবারক ভুইঞা) মাধ্যমে অথচ দুজন কথকই উপন্যাসের বর্ণিত কাহিনীর গৌণ চরিত্র এবং তারা সক্রিয়ভাবে গল্পের মধ্যে নেই। আবার দু'জনই মূল কাহিনী ও চরিত্রের অনেক কিছুই জানে এবং অনেক ঘটনার সাক্ষী। কথক'আমি'র কথিত কুমরডাঙ্গার ঘটনাবলি এবং কথক তবারক ভুইঞা তাদের ব্যক্তিগত দৃষ্টিকোণ থেকে কাহিনী বর্ণনা করলেও পর্যবেক্ষণ, দৃষ্টিকোণ গোপন থাকে না। এবং তারা লেখকের জীবন-দৃষ্টিতেই ঘটনাধারার ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ করে। এভাবে লেখকের সঙ্গে কথকদ্বয়ের দৃষ্টির সমন্বয় ঘটে, বিশেষ করে কথক 'আমি'র সঙ্গে লেককের দৃষ্টি খুবই নিকটবর্তী। কথক 'আমি' সচেষ্ট হয়েছে উপন্যাসের মূল চরিত্র মুহাম্মদ মুস্তফার প্রতি পাঠকের সহানুভূতি আকর্ষণে। 'আমি'র সীমাবদ্ধতাকে পূরণ করেছে তবারক ভুইঞার বর্ণনা। কাহিনী উপস্থাপনার এই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ভঙ্গি 'কাঁদো নদী কাঁদো' উপন্যাসকে প্রথা-অতিক্রমী ও স্বতন্ত্র করেছে।

'কাঁদো নদী কাঁদো' উপন্যাসের গঠনবিন্যাসে সময়ের ব্যবহার খুব গুরুত্বপূর্ণ। উপন্যাসের বাস্তব সময়কাল-এক অপরাহ্ন থেকে শুরু করে গভীর রাত পর্যন্ত মাত্র কয়েক ঘন্টা। কিন্তু উপন্যাসের বর্ণিত কাহিনীর সময় (fictional time) মাত্র কয়েক ঘন্টার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বর্তমান থেকে তা সুদূর অতীত পর্যন্ত বিস্তৃত। জেমস জয়েস (১৮৮২-১৯৪১) এর 'ইউলিসিস' (১৯২২)-এর কাহিনীগত সময় মাত্র চব্বিশ ঘন্টা কিন্তু এর মধ্যে তিনটি চরিত্রের পরস্পরের কাছে আসা আবার দূরে সরে যাওয়া, মুহূর্ত থেকে মুহূর্তে গড়িয়ে যাওয়া সময় বর্তমান থেকে দূর অতীত পর্যন্ত প্রসারিত। কারণ, 'চেতনাপ্রবাহের উপন্যাসে সময় একেবারেই খন্ডিত; আনুপূর্বিক বলতে কিছু নেই, সময়ের পরম্পরা নির্ধারিত হয় চরিত্রের চেতনাপোলব্ধি থেকে। এজন্য অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কোনো সময়গত সীমারেখায় বন্দী থাকে না, চরিত্রের চেতনায় একাকার হয়ে যায়।.. .. ঘটমান বর্তমানে অতীত ও ভবিষ্যৎ বিলীন হয়ে যায়। চেনাপ্রবাহের অনেক চরিত্র সময়কে উপেক্ষা করে তন্দ্রা, আচ্ছন্নতা এবং স্বপ্নের সাহায্যে-অথবা তন্দ্রা বা স্বপ্নের জগৎই অনেক ক্ষেত্রে অনেক বেশি প্রকৃত হয়ে পড়ে।'[৩৮] সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ কাহিনী বিন্যাসে, সময় ব্যবহারে, চরিত্রের তন্দ্রা-আচ্ছন্নতা, সর্বত্রই চেতনাপ্রবাহ পদ্ধতির প্রতি বিশ্বস্ত থেকেছেন। চলন্ত স্টিমারের ঘর্মাক্ত পরিবেশ,

Dhaka University Institutional Repository

অপরাহ্নের তন্দ্রালস মানস ; স্টিমারের ডেকের উপরে কাহিনীর সূচনা এবং সমাপ্তি কিন্তু কথক 'আমি' ও তবারক ভুইঞার বর্ণনায়, স্মৃতি ও চেতনার অনুষঙ্গে কাহিনী স্থান কালের গণ্ডি অতিক্রম করে গেছে :

> 'লোকটিকে যখন দেখতে পাই তখন অপরাহ্ন, হেলে পড়া সূর্য গাঁ-ঘেঁষাঘেঁষি হয়ে থাকা অসংখ্য যাত্রীর উষ্ণ নিঃশ্বাসে দেহতাপে এমনিতে উত্তপ্ত তৃতীয় শ্রেণীকে আরো উত্তপ্ত করে তুলেছে।.. ..
>
> তারপর লোকটির বিষয়ে বিস্মৃত হয়ে পড়ি, আমার চোখে আবার ঘুমের আমেজ ধরে। অনেকক্ষণ পর একটি কণ্ঠস্বর শুনতে পাই নিম্ন শান্ত কণ্ঠ, কিছু সঙ্কোচের আভাস তাতে। .. .. লোকটির কথা মন দিয়ে শুন ছিলাম। একবার মনে হয়, তার কথা আমার স্মৃতির পর্দায় কোথায় যেন ঈষৎ আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। .. .. তারপর সহসা সে একটি শহরের নাম নেয় যে নাম শুনে প্রথমে চমকিত হই, তারপর একথা বুঝতে পারি যে তখন স্মৃতির পর্দায় অকারণে দোলা লাগেনি। তবে লোকটি কী তবারক ভুইঞা ? তাকে কখনো স্বচোক্ষে দেখিনি, কিন্তু সহসা কেমন নিঃসন্দেহ হয়ে পড়ি যে সে তবারক ভুইঞাই হবে। .. .. উত্তেজিত হয়ে ভাবি তবে লোকটির মুখে মুহাম্মদ মুস্তাফার কথা শুনতে পাবো কী ? আমি জানি মুহাম্মদ মুস্তফার সঙ্গে লোকটির পরিচয় হয়েছিল। '[৩৯]

অর্থাৎ কথক 'আমি' প্রথমে শ্রোতা। তবারক ভুইঞার কথা শুনে তার 'স্মৃতির পর্দায়' 'আলোড়িন সৃষ্টি' করে। তার মুখে 'একটি শহরের নাম' শুনে 'চমকিত' হয়। নিঃসন্দেহ' ভাবে বুঝতে পারে লোকটি আসলে তবারক ভুইঞা তারপর 'উত্তেজিত' হয়ে ভাবে তার মুখে মুহাম্মদ মুস্তফার কথা শুনতে পাবে কি-না, কারণ সে জানে 'মুহাম্মদ মুস্তফার সঙ্গে লোকটির পরিচয়' ছিল। উপন্যাসে একসময় 'আমি' শ্রোতা থেকে বক্তার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। একদিকে কথক 'আমি' শুনছে তবারক ভুইঞা বর্ণিত কাহিনী। অন্যদিকে সে কাহিনী শুনতে শুনতে 'আমি'র মনে জেগে উঠছে স্মৃতি। এভাবে শ্রুতি, স্মৃতি ও ভাবনানুষঙ্গে চেতনাপ্রবাহশৈলীর প্রকাশ ঘটেছে। ঔপন্যাসিক শুধু মুহাম্মদ মুস্তফার ব্যক্তিজীবনের অন্তর্লোক নয়, কুমরডাঙ্গার জনগোষ্ঠীর মানস প্রতিক্রিয়াও ফুটিয়ে তোলার প্রয়াস পেয়েছেন এ পদ্ধতিতে।

নদীকে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ এ উপন্যাসে কাঠামো মটিফ করেছেন, তিনি নিরীক্ষা করতে চেয়েছেন বহমান নদীর মৃত্যু হলে , নদী-নির্ভর জীবনের সংকট ও শঙ্কা কিরূপ হয় এবং অন্বেষণ করতে চেয়েছে নির্লিপ্ত জীবনও কীভাবে বিপর্যয়ের শিকার হয়। মৃত-অস্তিত্ব কেমন করে জীবিত অস্তিত্বে ছায়া ফেলে তাকে শঙ্কাগ্রস্ত করে তোলে। 'কাঁদো নদী কাঁদো'-তে তিনটি কৌতূহল স-প্রধান। এক. বাকাল নদী যেদিন মরতে বসল এবং স্টীমার চলাচল বন্ধ হল, কুমুরডাঙ্গা বাসীরা কেমনভাবে নিয়েছিল ঘটনাটিকে ? আশা-আকাঙ্ক্ষার মূলটিতে টান পড়লে কেমনভাবে নেয় তাকে মানুষ ? দুই. মুহাম্মদ মুস্তফার নির্লিপ্ত জীবনও কোন বিপর্যয়ের শিকার হল? শামুকে গুটানো নিভৃত জীবনও কি ব্যাধের লক্ষ্য হয় ? তিন. তবারক কি মুহাম্মদ মুস্তফার কোন উল্লেখ করবে? উপন্যাসটি যদিও সরাসরি কোন রূপক নয়, তবুও স্তরে স্তরে বিচার করলে এর মূল অর্থটি সহজেই ধরা যায়। .. .. উপন্যাসটিতে ভাব ও ফর্মের কোন বিচ্ছেদ নাই। উপরোল্লিখিত কৌতূহলগুলি এমনভাবে মিশে গেছে উপন্যাসটির ভাবধারার সাথে যে তারা ভিন্ন কোন বিবেচনার দাবী তোলে না।'[৪০] স্বতন্ত্র ফর্ম চেতনা ছাড়াও ঔপন্যাসিকের সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণ ও একাধিক চরিত্রের সুকথনশৈলীর ব্যবহার, চেতনাপ্রবাহের স্বীকৃত পদ্ধতি। 'কাঁদো নদী কাঁদো' উপন্যাসের অন্তর্ময় স্বগতকথনশৈলীর (interior monologue) অনেকান্ত (multiple) ব্যবহার অনেকাংশে স্যামুয়েল বেকেটের (১৯০৬-১৯৮৯) Malone Dies (১৯৫১) উপন্যাসের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। একাধিক দৃষ্টিকোণের ব্যবহার,অতীত ও বর্তমানের অন্তর্বয়নের মধ্য

Dhaka University Institutional Repository

দিয়ে ঘটনার অগ্রগতি, চরিত্র-ভূমিকার অবস্থান বদল প্রভৃতি বিচারে 'কাঁদো নদী কাঁদো' বেকেটের শিল্পশৈলীর সন্নিকটবর্তী। বিশেষ করে মৃত্যুর জন্য অপেক্ষমান 'মালোন' চরিত্রের সঙ্গে মুহাম্মদ মুস্তফার পরিণতির সাদৃশ্য উল্লেখযোগ্য।'[৪১] মুহম্মদ মুস্তফার অনুশোচনাজাত ভীতি ও মর্মঘাতি আতঙ্কের পেছনে রয়েছে খোদেজার আত্মহত্যার ঘটনা। খোদেজার মৃত্যুকে সে আকস্মিক দুর্ঘটনা হিসাবে বার বার উড়িয়ে দিতে চাইলেও ক্রমশ সুতীব্র এক দায়িত্বচেতনায় সে সমর্পিত হতে থাকে। সে ভাবতে থাকে, খোদেজার প্রতি তার কর্তব্য এড়ানোই খোদেজার আত্মত্যার কারণ। তার বাবা এসময় কিছু না ভেবেই খোদোজের সঙ্গে তার বিয়ে দেবেন বলেছিলেন। বড় হয়ে মুহম্মদ মুস্তফা ছোট হাকিমের চাকরী পেলে খোদেজাকে বিয়ে করা তার সম্ভব হয়ে ওঠে না। বাড়ির লেখকেরাও সে প্রতিশ্রুতির কথা প্রায় ভুলে যায়। পিতার প্রতিশ্রুতির উপেক্ষা করে বিয়ে করতে গিয়ে বার বার ব্যর্থ হয়ে মুহম্মদ মুস্তফা ভীত হয়ে পড়ে। এক ছুটিতে বাড়ি এলে, বাড়ির লোকজন প্রকাশ্যে কিছু না বললেও নানা আচরণ দিয়ে বুঝিয়ে দেয় যে, মুহম্মদ মুস্তফার জন্য খোদেজা শ্যাওলা আবৃত পুকুরে ডুবে আত্মহত্যা করেছে। খোদেজার মৃত্যুর দায় নিজের উপর আরোপ করার পর মুহম্মদ মুস্তফার অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়ে। মনোস্তাপ ও অনুশোচনাজনিত আতঙ্ক তার অস্তিত্বকে গ্রাস করে ফেলে।সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ নানাভাবে মুহম্মদ মুস্তফার চরিত্রের মধ্যে অস্তিত্ববাদী দর্শনকে মূর্ত করে তুলেছেন। অস্তিত্ববাদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে :

> ক. আত্মতা-শরীরে ও মনে প্রত্যেকটি মানুষ স্বতন্ত্র,একক ও আলাদা। প্রত্যেকের সমস্যা সমাধান করতে হবে নিজস্ব পথে। প্রত্যেক মানুষ ব্যক্তিগত অঙ্গীকারে আবদ্ধ।
>
> খ. কর্ম-অস্তিত্ববাদ নিষ্ক্রিয়তার দর্শন নয়, কর্মের দর্শন। মানুষ তখনই অস্তিত্ববান, যখন সে নিজেকে তার সিদ্ধান্ত অনুসারে নির্মাণ করে।
>
> গ. দায়িত্ব- কর্মপন্থা নির্বাচন করতে গিয়ে মানুষ একটি দায়িত্ববোধে জড়িত হয়ে পড়ে। এ দায়িত্ববোধ প্রত্যেকের স্বতন্ত্র ও ব্যক্তিগত। প্রচলিত সামাজিক, রাজনৈতিক ও নৈতিক প্রথার বাইরেও মানুষ যেতে পারে ঐ ব্যক্তিগত দায়িত্বের কারণে।
>
> ঘ. আত্মমুক্তি- নিজের অস্তিত্বকে অর্জন করতে গিয়ে মানুষ নিজের গণ্ডি অতিক্রম করে এবং তার মধ্য দিয়েই অন্য সকলের সঙ্গে যুক্ত হয়। আমাদের ব্যক্তিসত্তার দায়িত্ব থেকে সমগ্র মানবজাতির দায়িত্ব এসে পড়ে। অস্তিত্ববাদী ব্যক্তি/ মানুষ সমগ্র মানবজাতির সঙ্গে যুক্ত।'[৪২]

মুহাম্মদ মুস্তফার চরিত্রের মধ্যে উপর্যুক্ত অস্তিত্ববাদের বৈশিষ্ট্যগুলো লক্ষ করা যায়। মুহাম্মদ মুস্তফা নির্লিপ্ত, নির্বিবাদী চরিত্র হলেও তার মধ্যে আত্ম-উপলব্ধির একটা সচেতন মন রয়েছে। অস্তিত্ববাদী দর্শন অনুযায়ী সে খোদেজার মৃত্যু দায় নিজের উপর টেনে নেয়,ক্রমশ সে গভীর দায়িত্ববোধের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করে ফেলে। 'মুহাম্মদ মুস্তফা ক্রমাগত অস্তিত্ব উপলব্ধির যন্ত্রণা ও মর্মদাহের উত্তাপে, অস্তিত্ববোধের অসহনীয় দায়িত্বের পরভূত হতে শুরু করে। উত্তপ্ত ও বিভ্রান্ত-মস্তিষ্ক মুহাম্মদ মুস্তফার মনে এই বিশ্বাস জন্মে যে, 'খোদেজা একটি প্রতিহিংসা পরায়ণ আত্মায় পরিণত হয়েছে, যে আত্মা সারাজীবন তাকে পদে পদে অনুসরণ করবে, অদৃশ্যভাবে ছায়ার মধ্যে মিশে থেকে , হয়তো বা তাকে এক সময় ধ্বংসও করবে।' অনুতাপ, অনুশোচনা-=ভীতিরও পরিণতি থাকে।'[৪৩] এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বাঁকাল নদীতে চর পড়ায় বিচ্ছিন্ন-কুমুরডাঙ্গার অধিবাসীদের অস্তিত্ব সংকট ও ভয়সঙ্কুল পরিস্থিতি। মুহাম্মদ মুস্তফার অস্তিত্বশীল ব্যক্তিত্বের (Existent of individual) সঙ্গে কুমুরডাঙ্গার অধিবাসীদের সমষ্টিগত অস্তিত্বকে

Dhaka University Institutional Repository

(Existent of community) পরিণামস্পর্শী করে সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহ সৃষ্টিশীলতার প্রজ্ঞাময় দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন। মুহাম্মদ মুস্তফার অস্তিত্বগত উপলব্ধিতে খোদেজার আত্মহত্যার দায় অনুভব করার পর সে দায়িত্ববোধে জড়িয়ে পড়ে, কর্মচঞ্চল হয়ে উঠে, ক্রমশ সে আত্ম-বিযুক্ত, মানব-বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। 'বিবক্ত নিঃসঙ্গ একাকী মুহাম্মদ মুস্তফা তীব্র ও ক্ষীপ্রভাবে আবর্তীত হয়েছে প্রেম এবং ঘৃণা-এই দুই মৌল অনুভূতিতে।'[৪৪] অস্তিত্ববাদের দর্শন অনুযায়ী সে দায়িত্ববোধে জড়িয়ে যাওয়ার পর আপন সিদ্ধান্তে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয় এবং আত্মমুক্তি অর্জনের জন্য সচেষ্ট হয়ে ওঠে। মুহাম্মদ মুস্তফা আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত নেয়, আত্মহত্যার জন্য একটা উপযুক্ত জায়গা খুঁজতে থাকে। নিচের কোনো ঘর পছন্দ হওয়ায় সে চিলেকোঠায় যায়। সেখানে খোদেজার উপস্থিতি ও তার চুড়ির অস্পষ্ট ঝঙ্কার অনুভব করে তার শিরদাঁড়া শীতল হয়ে উঠে। সিদ্ধান্তটি সেসময় কার্যকর করা সম্ভব হয় না। তবারক ভূইঞার আসার শব্দ পেয়ে সে দড়িটা লুকিয়ে ফেলে। খোদেজার মৃত আত্মার উপস্থিতির আতঙ্ক থেকে সাময়িকভাবে সুস্থির হলেও সর্বগ্রাসী আতঙ্ক থেকে সে মুক্তি পায় না। অপ্রত্যাশিতভাবে তার কলিজার কথা মনে পড়ে :

> 'সুটকেসের দিকে তাকিয়ে রয়েছে এমন সময় সেটি অকস্মাৎ কাঁপতে শুরু করে : সুটকেসটি যেন একটি শুষ্করক্ত গাঢ় রঙের কলিজায় পরিণত হয়েছে। সে দৃষ্টি সরিয়ে নেয়। হয়তো একবার দরজার নিকটে স্থাপিত লণ্ঠনের দিকে তাকায়। তবে কলিজাটি তার দৃষ্টি অনুসরণ করে সেখানেও হাজির হয় এবং আকারে সহসা ছোট হয়ে লণ্ঠনের গায়ে পতঙ্গের মত ডানা ঝাপটাপতে শুরু করে। মুহাম্মদ মুস্তফা কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে এই আশায় যে, পতঙ্গটি, পুড়ে মারা যাবে, তার চঞ্চল ক্ষুধার্ত ডানা স্তব্ধ হবে, কিন্তু পতঙ্গ স্তব্ধ হয় না। এবার মেঝের দিকে তাকালে সেখানেও কলিজাটি দেখতে পায় ; মেঝের ওপর সেটি ডাঙ্গা তোলা মাছের মত ধড়ফড় করছে যেন। সে আশা করে পানির অভাবে শীঘ্র মাছটির ধড়পড়ানি শেষ হবে, তার দেহ স্থির হয়ে পড়বে, কিন্তু তাও হয় না, পতঙ্গের মত মাছটিও ধড়ফড় করতে থাকে। বিচিত্র কলিজাটি সত্যই অমর : আগুনে দগ্ধ হয় না, দম বন্ধ হলেও তার শ্বসনকার্য থামে না।'[৪৫]

পরবাস্তববাদী শিল্পমাত্রায় বিন্যাস্ত সুকেসটি গাঢ় রক্তের 'কলিজায়' পরিণত হয় এবং তার দৃষ্টিকে অনুসরণ করে 'সহসা ছোট হয়ে লণ্ঠনের গায়ে পতঙ্গের মত ডানা ঝাপটাতে শুরু করার মধ্যে মুহাম্মদ মুস্তফার অস্তিত্ব প্রতীকায়িত হয়েছে। যেখানেই সে দৃষ্টিপাত করে সেখানেই দেখে একজোড়া চোখ, না হয় থরথর করে কাঁপা একটি কলিজা। সে অনুভব করে যে, খোদেজা আত্মহত্যা করে একটি প্রতিহিংসা পরায়ণ আত্মায় পরিণত হয়েছে। তাঁর নিজের উপর নিজের নিয়ন্ত্রণ থাকে না, নিজের কার্যকলাপ আর তার ক্ষমতা অধীন নয়, মেয়েটির আত্মা তার মন দখল করে তার ইচ্ছাশক্তিকে কাবু করে ফেলেছে, তাকে পরিচালিত করেছে নির্দয় ধ্বংসকারিণীর রূপ নিয়ে।'[৪৬] মানব-বিযুক্ত, বিভ্রান্ত-মস্তিষ্ক মুহাম্মদ মুস্তফা মনস্তাপজনিত ভীতিতে সন্ত্রস্ত হয়ে পরিণামে অস্তিত্ব বিলুপ্তর পথে অগ্রসর হয়:

> 'ইতিমধ্যে মুহাম্মদ মুস্তফা একটি অতল গহবরের প্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছে : যারা তেমন একটি গহবর থেকে বহুদূরে তারা তার অস্তিত্বের কথা ভাবতেও পারে না। পরদিন তখনো সূর্য ওঠেনি, এমন সময় মুহাম্মদ মুস্তফার মা আমেনা খাতুনের মর্মান্তিক আর্তনাদ শুনতে পাই। তেমন একটি আর্তনাদ শুনেছিলাম বেশ কয়েক বছর আগে, চাঁদবরণঘাটে ; সেদিনও আমেনা খাতুনই আর্তনাদ করে উঠেছিলো। আর্তনাদ শোনামাত্র বুঝতে পারি। তবে তখন আর করার কিছু ছিলো না; কেউ আর কিছু করতে পারতো না। যখন বাড়ির পশ্চাতে উপস্থিত হই তখন দেখতে পাই, যে তেঁতুলগাছের তলে-বাল্যবয়সে একটি অদৃশ্য সীমারেখা

Dhaka University Institutional Repository

> পেরিয়ে গিয়েছিলো সে গাছ থেকে মুহাম্মদ মুস্তফার নিষ্প্রাণ দেহ ঝুলছে, চোখ খোলা। সে চোখ শ্যাওলা আবৃত ডোবার মত ক্ষুদ্র পুকুরে কী যেন সন্ধান করছে।'[৪৭]

অনুশোচনায় তাড়িত মুহাম্মদ মুস্তফার আত্মহত্যার মধ্যদিয়ে অস্তিত্ব বিলুপ্তি তথা উপন্যাসের পরিসমাপ্তি দেখালেও সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ জীবন বিমুখ বা নৈরাশ্যবাদী শিল্পী নন। বরং তিনি জীবনমুখী, অস্তিত্ববাদী, মানব-প্রেমী এক অসাধারণ শিল্পী। উপন্যাসের শিল্প-পরিসরে তিনি মৃত্যুকে একটি শিল্পমাত্রা হিসেবে ব্যবহার করেছেন, কারণ মৃত্যু মানে জীবনের সমাপ্তি নয়। 'চাঁদের অমাসব্যা'র আরেফ আলী এবং 'কাঁদো নদী কাঁদো' উপন্যাসের মুহাম্মদ মুস্তফার চরিত্রের চেতনাপ্রবাহ ও মনো-বীক্ষণের মধ্য দিয়ে তিনি দেখাতে চেয়েছেন যে, মৃতমানুষের আত্মা, জীবিত মানুষের অস্তিত্বকে আতঙ্কিত, ভীত ও সংকটময় করে তুলতে পারে, তাকে আত্মবিলুপ্তির পথের নিয়ে যায়। অস্তিত্বর সংকট ও শঙ্কামুক্তির কথা তাঁর উপন্যাসের নানা জায়গায় উচ্চারিত হয়েছে। 'কাঁদো নদী কাঁদো' উপন্যাসে খতিব মিঞার উপলব্ধিতে এই শঙ্কামুক্ত অস্তিত্বের জীবনমুখীতার পরিচয় স্পষ্ট :

> 'এ শহরে তার জন্ম হয়নি, ঘরবাড়ি নেই, আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধব বলেও কেউ নেই, তবু এক নাগাড়ে পাঁচ-পাঁচটি বছর কাটিয়েছে। এ শহরে থেকে গেলাম কুমুরডাঙ্গায় পা দিয়েই বুঝেছিলাম এ মাটিতে ভয় নেই। .. .. কুমুরডাঙ্গা সম্বন্ধে এমন সব কথা কেউ কখনো বলেনি। সহসা সেদিন থেকে সকলের মধ্যে নূতনভাবে জীবনসঞ্চার হয়, নৈরাশ্য নিরানন্দভাব দূর হয়।'[৪৮]

খতিব মিঞার এই ভয়হীন জীবন অনুভবের মধ্য দিয়ে সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহর মৃত্যু অধিক জীবনবাদী শিল্পীর পরিচয় পাওয়া যায়। 'ভয়-আশঙ্কা-মনস্তাপ-নৈরাশ্য ইত্যাদি অনুভূতির মাঝ দিয়ে কুমুরডাঙ্গার মানবপরিস্থিতি যে হয়ে ওঠে সুস্থির, বিশ্বস্ত ও ভবিষ্যৎ সঞ্চায়ী তার উৎস দ্বিবিধ, যেমন{১} মানব প্রেমানুভূতি এবং {২} জনমানব সংযুক্তি। ভয়, আতঙ্ক ও একাকিত্ব প্রভৃতি border line situation এর মাঝ দিয়েই ব্যক্তি তার অস্তিত্বকে অনুধাবন ও উপলব্ধি করে। এভাবে পরিস্রুত হয়েই উজ্জ্বলতর হয়ে ওঠে প্রাতিস্বিক অস্তিত্ব (personal existace)। সমগ্র মানব অভিযাত্রা, সভ্যতার দায়স্থিতি, মানবতন্ত্র ও কল্যাণবোধ-এসবের সূক্ষ্মতর দায়িত্ব ও স্বাধীন মুক্তচৈতন্যে সুস্থিত হয়েই 'অস্তিত্ববাদ' মানবতাবাদী দর্শনে উত্তীর্ণ।'[৪৯] 'কাঁদো নদী কাঁদো' উপন্যাসের আঙ্গিক বিন্যাসে, অন্তর্বয়নে ও শিল্প-অভিপ্রায়ে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ এই বোধ সর্বদা জাগরুক ছিলো। 'কাঁদো নদী কাঁদো' উপন্যাসের কাহিনী গ্রন্থনে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ দুইজন কথকের (narratorial voice) সাহায্য নিয়েছেন। কথক 'আমি' এবং কথক 'তবারক ভুইঞা'- এদু'টি চরিত্রকে Fantional character বা বর্ণনাকারী চরিত্র বলা যায়। উভয় কথকের বর্ণিত প্রতিবেদনে (narratorial discourse) বিচ্ছিন্ন জনপদ কুমুরডাঙ্গা, চাঁদবরণঘাট এবং কেন্দ্রীয় চরিত্র মুহাম্মদ মুস্তফার অন্তর্বাস্তবতা, বর্হিবাস্তবতা বিধৃত হয়। কথক 'আমি' প্রথমে দর্শক এবং শ্রোতা। তার বর্ণনা অনুসারে-'লোকটিকে যখন দেখতে পাই, তখন অপরহ্ন,হেলে-পড়া সূর্য, এবং 'লোকটির কথা মন দিয়েশুনছিলাম।' এই লোকটি তবারক ভুইঞা। তার চরিত্র সম্পর্কে বলতে গিয়ে লেখক বলেছেন 'ছোটবেলায় নাম পড়েছিল পেঁচা।.. .. না, চোখের জন্যে নয়, স্বভাবের জন্যে।' কারণ :

Dhaka University Institutional Repository

ক. ছোটবেলাতেই লোকটির মধ্যে কৌতুহলটা দেখা দিয়েছিলো। তার সমবয়সী ছেলেরা যখন মাঠে-মাঠে খেল করে গৃহস্থের বাড়ির ফলমূল চুরি করে নদী পুকুরে সাঁতার কেটে সময় কাটাতো তখন সে সবকিছু ভুলে ঘন্টারপর ঘন্টা মানুষের জীবনযাত্রা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতো। সে- সময়ে কত দেউড়ি-খিড়কির পথ দিয়ে সে যে ছায়ার মতো আসা-যাওয়া করেছে এ বাড়ি সে বাড়ি গিয়ে কত নরনারীর দৈনন্দিন জীবননাটকে মশগুল হয়ে সময় কাটিয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। সে জন্যেই চক্ষু-সর্বস্ব নিশাচর পাখির নাম পেয়েছিলো।"[৪০]

বাল্যকালের কৌতুহলী দৃষ্টি (তার পেঁচা-চোখে আর পলক পড়েনি) বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কমে না গিয়ে দিনে দিনে বেড়েই যায়। তবারক ভুইঞার পেঁচা-স্বভাবের পর্যবেক্ষণ শক্তি যেমন অসাধারণ, তেমনি তার কাহিনী বর্ণনার শক্তি শ্রোতাদের সম্মোহিত করে। উপন্যাসের বিশেষ কাঠামোর প্রয়োজনে ঔপন্যাসিক এই চরিত্রটি সৃষ্টি করেছেন তাই তবারক ভুইঞার চরিত্রের বিকাশে কিংবা পরিণতির কোনো সুযোগ ছিলনা। কিন্তু ঔপন্যাসিকের বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের অর্থাৎ ফাংশনাল (Fantional) চরিত্র হিসেবে সে অনিবার্য ভূমিকা পালন করে। তবারক ভুইঞার মধ্যে একজন অভিজ্ঞ জীবন দ্রষ্টাকে খুঁজে পাওয়া যায়। কথক 'আমি' গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র মুহাম্মদ মুস্তফার চাচাতো ভাই। সে প্রথমে দর্শক এবং শ্রোতা, পরে নিজেই কথক হয়ে ওঠে। কথক তবারক ভুইঞার মুখে কুমুরডাঙ্গার নাম শুনে সে উৎকর্ণ হয় এবং 'উত্তেজিত' হয়ে ভাবে'তবে লোকটির মুখে মুহাম্মদ মুস্তফার কথা শুনতে পাবো কি ?' কারণ 'আমি জানি মুহাম্মদ মুস্তফার সঙ্গে লোকটির পরিচয় হয়ে ছিলো।' তবারক ভুইঞার মুখ দিয়ে যে সব কথা বলা সম্ভব হয়নি কিংবা যেসব কথা তবারক ভুইঞার বর্ণনায় বাদ পড়েছে, সেসব কথাকে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ কথক 'আমি'র মুখে স্থাপন করেছেন। বিশেষত, চাদবরণঘাট ও মুহাম্মদ মুস্তফার শৈশবকৈশোর, পারিবারিক এবং অন্তর্জীবনের কথা। তবারক ভুইঞা মূল কাহিনী বর্ণনা করলেও মুহাম্মদ মুস্তফার নাম উচ্চারণ করে না শেষ পর্যন্ত। খোদেজার আত্মহত্যা ও আত্মহত্যার দায়জনিত মনোস্তাপ, মুহাম্মদ মুস্তফার শেষ পরিণতি বর্ণিত হয় কথক 'আমি'র কণ্ঠে। ঔপন্যাসিক কথক 'আমি'র কোন নাম উল্লেখ করেন নি। উত্তম পুরুষ বর্ণিত এই কাহিনীতে মুহাম্মদ মুস্তফার চরিত্রে অন্তর্বাস্তবতা অঙ্কনে এই ফাংশনাল চরিত্রের সাহায্য নিয়েছেন। ঔপন্যাসিকের উদ্দেশ্য বাহনে এই চরিত্র যথার্থ ভূমিকা পালন করে। যদিও দেখা যায়, কাহিনীর একটি সূত্রে সে নিজেও জড়িত। তার মতে খোদেজা মুহাম্মদ মুস্তফাকে নয়, তাকেই ভালোবাসতো। একদিন অগ্রহায়ণ মাসের নির্জন সন্ধ্যায় খোদেজা ভীরু ভীরু কণ্ঠে 'আমি'কে জানায় :

'মুস্তফা ভাইকে বড় ভয় করে..

আমাকে করে না ?

সজোরে মাথা নেড়ে সে উত্তর দেয়'না'।"[৪১]

স্পষ্ট বোঝা যায়, মুস্তফার প্রতি তার ভয়মিশ্রিত শ্রদ্ধা থাকলেও ভালোবেসে ছিল 'আমি'কে। আত্মহত্যার আগে মুহাম্মদ মুস্তফা শেষবারের মত উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে গ্রামের বাড়িতে এসেছিল শুধু একটি কথা জানতে। সবাই খোদেজার মৃত্যুর জন্য তাকে দায়ী ভাবলেও তার চাচাতো ভাই 'আমি' এসম্পর্কে কি ভাবে ?

খোদেজা আত্মহত্যা করেছে, নাকি তার মৃত্যু একটা দুর্ঘটনা :

'সত্য উত্তর মুখে এসেও মুখেই থেমে গিয়েছিলো।

কেবল বলেছিলাম,

'কি করে বলি ? আমি তখন বাড়ি ছিলাম না।"[৪২]

Dhaka University Institutional Repository

কথক 'আমি' সত্য উত্তরটি জানাতো। কিন্তু সত্য উত্তরটি তার মুখে আসেনি, কারণ মুহাম্মদ মুস্তফার প্রতি সে ক্রোধান্বিত ছিলো।

সত্য কথাটি সে মুহাম্মদ মুস্তফাকে না বলার দরুনই মুস্তফা আত্মহত্যা করেছে। তার আত্মকথন থেকে জানা যায়, ম্যাট্রিক ফেল করার পর সে আর লেখাপড়া করেনি। বক্তার ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেও সে দ্রুত চিন্তাশীল ও স্মৃতিচারণে অভ্যস্ত এবং মানুষের জীবনের বাইরে-ভেতরে প্রবেশ করার অসাধারণ ক্ষমতা রয়েছে তার। তবু কথক 'আমি' শেষ পর্যন্ত এক রহস্যময় ব্যক্তি।

'কাঁদো নদী কাঁদো' উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র মুহাম্মদ মুস্তফা, তাকে ঘিরেই সমস্ত ঘটনা ও চরিত্রের আয়োজন, কুমুরডাঙ্গার সমাজ-পরিবেশ,বিচিত্র পেশার মানুষ, খোদেজার মৃত্যু এবং মৃত্যুকে নিয়ে মুস্তফার বিপন্ন অস্তিত্বের অর্ন্তবয়ন। ছোট বেলা থেকেই মুহাম্মাদ মুস্তফা ছিলো শান্ত, নির্লিপ্ত, নির্বিকার। শৈশবে পিতা খেদমত উল্লাহর কাছ থেকে স্নেহ-মমতার বদলে পাওয়া নির্মম নিষ্ঠুরতা তার মনকে ভীত-সন্ত্রস্ত করে তুলেছিল। পিতার হত্যাকান্ড ও হত্যাকারীর নাম শুনতে পেলেও সে সম্পর্কে তার প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায় না। ঝড় বৃষ্টিতে পথ ভুলে সে অন্ধকারে পিতার হত্যাকারী কালু মিঞার বাড়ির সামনে উপস্থিত হলে সবাই আশা করেছিল এবার সে একটা কিছু করবে। এমন কি কালু মিঞা মসজিদে গিয়ে পিতা খেদমত উল্লাহর হত্যার অভিযোগ অস্বীকার করে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করার সময় ক্ষুব্ধ চাচা চিৎকার করে বলেছিল- 'সে মানুষ খোদার বান্দাকে খুন করতে ভয় পায় না, সে মানুষ খোদার ঘরে মিথ্যা বলতে ভয় পাবে কেন ?' তবু মুহাম্মদ মুস্তফার মনে কোনো প্রতিক্রিয়া হয় না।

মুহাম্মদ মুস্তফা ব্যক্তি পরিচয়ে কুমুরডাঙ্গার ছোট হাকিম বা বিচারক। হাকিম সাধারণত বিবেক তাড়িত হয়, কিন্তু তার চরিত্র যুক্তিশীল বিবেকের কোনো উপস্থিতি লক্ষ করা যায় না। খোদেজার মৃত্যু আত্মহত্যা না দুর্ঘটনা-এ ব্যাপারটি সে যুক্তি দিয়ে বিচার করতে উদ্যোগী হয় না। খোদেজা তার কারণে আত্মহত্যা করেছে বাড়ির লোকদের অমূলক ধারণাকেও উন্মোচিত করে না। যুক্তি দিয়ে, বুদ্ধি দিয়ে মৃত্যুর ঘটনা বিশ্লেষণ না করে বরং আবেগ আর কল্পনার আশ্রয় নেয়। তার ধারণা হয় 'খোদেজা একটি প্রতিহিংসাপরায়ণ আত্মায় পরিণত হয়েছে।'

বস্তুত, খোদেজার মৃত্যুকে সত্যগ্রাহ্য যুক্তি-সাহায্যে বিশ্লেষণ ও অনুসন্ধান করাই তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হওয়া সঙ্গত ও প্রত্যাশিত ছিলো কিন্তু খোদেজার মৃত্যু সম্পর্কে সে তার কল্পনার বাইরে উত্তর খোঁজেনি। খোদেজার মৃত্যু তার অন্তর্জগতে নানা উদ্ভট কল্পনার জন্ম দিলেও, রহস্য উদ্‌ঘাটনে উদ্যোগী ভূমিকা না নিয়ে হত্যার দায় নিজের উপর আরোপ করে অনুশোচনা, মনোস্তাপ, আত্মযন্ত্রণায় বিভ্রান্ত হওয়ার মধ্যে মুহাম্মদ মুস্তফার নিষ্কর্মক (possive) চরিত্রের বৈশিষ্ট্যই ফুটে উঠেছে। মুহাম্মদ মুস্তফা ছোট হাকিম। সে যে যুক্তি দিয়ে, বুদ্ধি দিয়ে খোদেজার মৃত্যুকে বিচার করে না ; আবেগ দিয়ে বিচার-এটি তার আচরণগত অসঙ্গতি। সত্যকে আবিষ্কারের উদ্যোগ তার নেই, বরং বাড়ির লোকেরা তার সম্পর্কে কীভাবে, তবারক ভুইঞা বাড়ির লোকদের মত সমর্থন করে কি-না, খোদেজার মৃত্যুর জন্য তার চাচাতো ভাই কথক 'আমি' তাকে দায়ী করে কি-না এসবের উপর সে মাত্রাতিরিক্ত গুরুত্ব দেয় এবং এ সবের ফলে তার চারিত্রের আচরণগত অসঙ্গতি স্পষ্ট হয়ে ওঠে।[৫৩]

Dhaka University Institutional Repository

মুহাম্মদ মুস্তফার চরিত্রে এই অসঙ্গতি থাকলেও তার অর্ন্তলোক, অনুভব সচেতন মনের পরিচয় স্পষ্ট। সাধারণভাবে সে নির্লিপ্ত, নির্বিকার হলেও হত্যার দায় নিজের আরোপ করার পর, সে দায়িত্ববোধ থেকে আত্মমুক্তি অর্জনের জন্য আত্মহত্যা করতে সচেষ্ট হতে দেখা যায় এবং আত্মহত্যা করেও। মোদ্দাকথা, মুহাম্মদ মুস্তফা ছোট হাকিম হলেও তার জীবনে কোনো সুস্থ্ তা ছিলোনা। তার জীবন যেন নিয়তি নির্ধারিত, ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত, কোনো ঘটনার গূঢ় অর্থ আবিষ্কারে সে যুক্তিশীল পথে অগ্রসর না হয়ে স্বকল্পিত পথে পরিচালিত হয়। বিয়ে করার জন্য ঢাকা যাওয়ার সময় স্টিমার চলাচল বন্ধ হয়ে যাওয়া, তারপর জ্বর আসা, তসলিমের চিঠির উত্তর না দেওয়া- এসবের মধ্যে সে খোদেজার প্রতিহিংসা পরায়ণ দুষ্ট আত্মার অবিমিশ্র জিঘাংসার ও অশুভ তৎপরতা দেখতে পায়। তার দৃষ্টিবিভ্রমও ঘটে, যেদিকে তাকায় এক জোড়া চোখ অথবা থরথর করে কাঁপা গাঢ় রঙের কলিজা দেখতে পায় এবং একসময় সে নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। আত্মহত্যার আগে সে শেষবারের মত উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে গ্রামের বাড়ি এসেছিল শুধু একটি কথা জানতে। সবাই খোদেজার আত্মহত্যার তাকেই দায়ী করলেও তার চাচাতো ভাই কথক 'আমি'র এ বিষয়ে অভিমত কি ? সেও বিশ্বাস করে খোদেজা আত্মহত্যা করেছিল ? কথক 'আমি'র সত্য উত্তরটি জানা ছিলো কিন্তু সে মুস্তফাকে সত্য কথাটি বলেনি। 'কী করে বলি ? তখন আমি বাড়ি ছিলাম না।'এ উত্তরে মুহাম্মদ মুস্তফার স্পষ্ট ধারণা হয়েছিল, খোদেজা তার জন্যই আত্মহত্যা করেছে। চরিত্র বিন্যাসে মুহাম্মদ মুস্তফার স্বকল্পিত ধারণার প্রতি অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহ। ফলে মুহাম্মদ মুস্তফার চরিত্রের অস্বাভাবিকত্ব ও অসঙ্গতিজনিত ত্রুটি দৃষ্টি এড়ায় না। 'কাঁদো নদী কাঁদো' উপন্যাসে সক্রিয়ভাবে উপস্থিত না থেকেও যে চরিত্রটি সবেচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং কাহিনীর কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করে, তার নাম খোদেজা। নিভৃতচারিনী, মাতৃহারা এই নারী মামা খেদমত উল্লাহ্ বাড়িতে আশ্রিতা ছিলো। শ্যামলা, ক্ষীণদেহী, দীর্ঘাঙ্গী মেয়েটি সম্পর্কে মুহাম্মদ মুস্তফার ফুফাতো বোন ছিলো। মামা খেদমত উল্লাহর প্রতিশ্রুতির কথা সে জনতো, তবে নির্লিপ্ত, নির্বিকার স্বভাবের জন্য হোক বা ভয় মিশ্রিত শ্রদ্ধার কারণে হোক মুহাম্মদ মুস্তফার সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক গড়ে ওঠে না। মুহাম্মদ মুস্তফার বিয়ের সংবাদে বাড়ির পেছনে শ্যাওলা আবৃত পুকুরে ডুবে সে আত্মহত্যা করেছে নাকি তার মৃত্যু নিছক দুর্ঘটনা-এটি অজ্ঞাত থেকে যায়। রন্ধন এবং গৃহকাজে অধিক নিপুণ খোদেজা সাঁতার জানতো কিনা, একথা উপন্যাসে জানা যায় না। খোদেজার মৃত্যু খবর মুহাম্মদ মুস্তফার মধ্যে প্রথমে প্রতিক্রিয়া না হলেও ক্রমশ তার মধ্যে গভীর অনুশোচনা ও মনোস্তাপজনিত প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায় এবং একসময় স্বকল্পিত ধারণার উপনীত হয় যে, খোদেজা তার জন্যই আত্মহত্যা করেছে। অন্য যে সব চরিত্রে উল্লেখ 'কাঁদো নদী কাঁদো' উপন্যাসে পাওয়া যায় তাদের মধ্যে, স্টেশন মাস্টার খতিব মিঞা, উকিল কফিল উদ্দিন, ডাক্তার বোরহান উদ্দিন, থানার দারোগা, খেদমত উল্লাহ, মুস্তফার মা আমেনা খাতুন, কালু মিঞা , মোক্তার মোছলেহ উদ্দিনের মেয়ে, সকিনা খাতুন-যাকে মুস্তফা খোদেজা বলে ভুল করে এবং নদীর কান্না প্রথম শুনেছিল। এই চরিত্রগুলো জীবনবাস্তবতা নিয়ে স্ব স্ব স্থানে অনিবার্য ভূমিকা পালন করে। বিশেষত, তবারক ভুইঞার শেষ উক্তি- 'নদী কী তার নিজের দুঃখে কেঁদেছিলো ? নদী কেঁদেছিলো তাদের দুঃখেই।' এবং কথক 'আমি' ও আত্মবিশ্লেষণ-'আমার মনে হয় নদী যেন নিষ্ফল ক্রোধেই কাঁদছে। হয়তো নদী সর্বদা কাঁদে, বিভিন্ন কন্ঠে, বিভিন্ন সুরে, কাঁদে সকলের জন্যেই। মনে মনে বলি : 'কাঁদো নদী কাঁদো'[৫৪] এই অভিব্যক্তি উপন্যাসের নামর্থকে অভিব্যঞ্জিত করেছে। নদী নিজের দুঃখে নয়, কেঁদেছিলো কুমুরডাঙ্গার আপাত বিচ্ছিন্ন অসহায় অধিবাসীদের দুঃখেই নদী কেঁদেছিলো মুহাম্মদ মুস্তফার অনুশোচনায় দগ্ধ, মনোস্তাপজনিত, ভীত-সন্ত্রস্ত অসহায়, নিঃসঙ্গ, মানব-বিযুক্ত, অস্তিত্ব বিলুপ্তির দুঃখে। নদী জীবনের চলিষ্ণুতার প্রতীক। বাকাল নদীতে চড়া পড়ার দরুন স্টিমার চলাচল বন্ধ হয়ে

Dhaka University Institutional Repository

যাওয়ায় কুমুরডাঙ্গারঅধিবাসরা প্রথমে নানা অপবিশ্বাস ও সংস্কারে পরিচালিত হলে পরে নিয়তিরঅশুভ চক্রান্ত ভেবে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। বাকাল নদীতে চড়া পড়ায় কুমুডাঙ্গার অধিবাসীর জীবনে যে বিপন্ন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিলো, তেমনি মুহাম্মদ মুস্তফার নির্বিকার জীবনেও খোদেজার আত্মহত্যার ঘটনা সমান পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছিল। দু'টি ঘটনাই সমান্তরাল। ঔপন্যাসিক দু'টি ঘটনাকে সমান শিল্পমাত্রায় স্থাপন করে উপন্যাসের 'কাঁদো নদী কাঁদো' নামকে সার্থক ব্যঞ্জনা দান করেছেন।

৩.

'কাঁদো নদী কাঁদো' অবিমিশ্রভাবে চেতনাপ্রবাহশৈলীর উপন্যাস। চেতনাপ্রবাহ শিল্পশৈলীর উপযোগী গদ্য-ভাষা নির্মাণের সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর সচেতন প্রয়াস লক্ষণীয়। এ উপন্যাসের ভাষা উচ্ছ্বাসবর্জিত স্বচ্ছ, স্বল্প সংলাপে আত্মকথনশৈলীর বর্ণনায় একটা প্রবহমানতা রয়েছে। কখনো কখনো অপেক্ষকৃত অপ্রচলিত শব্দ এবং জটিল বাক্য প্রয়োগ করলেও তাঁর গদ্যভঙ্গির সাবলীলতা নষ্ট হয়নি। তবে ভাষা প্রশ্নে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ ধ্রুপদী রুচির অধিকারী। তাঁর উপন্যাসের চরিত্ররা মহাকাব্যের মত নারী-পুরুষ, অভিজাত-অনভিজাত, পেশা, জাত নির্বিশেষে একই ভাষায় কথ বলে । বাক্যগঠনে ঈষৎ সাধু মিশ্রিত তৎসমবহুল, সমাসবদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও ক্রিয়াপদে কখনো আঞ্চলিক উচ্চারণ স্পষ্ট :

> ক. বজ্রাহত মানুষের মত বাপজান কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে থাকে, তারপর তার দৃষ্টি যায় মুহাম্মদ মুস্তফার দিকে। ততক্ষণে বাপজানের চোখে খুন চড়েছে। উন্মাদের মত চীৎকার করে সে বলে,"চুপ করে দাঁড়িয়ে আছো কেন ? তুমি মরদ না মাগী, বুক একটু হিম্মত নাই ?"[৫৫]
>
> খ. "কাল সকালের জন্যে একটি নৌকা ঠিক করে দেন"

'বজ্রাহত' সমাসবদ্ধ পদ, 'বাপজান' আঞ্চলিক 'দৃষ্টি' সাধু কিন্তু বাক্যের গঠন ধ্রুপদী। পরবর্তী সংলাপে বাক্যের গঠন সাধুরীতির হলেও আঞ্চলিক শব্দের ব্যবহার লক্ষ্যণীয়- 'চুপ' 'মরদ' 'মাগী' 'হিম্মত' কিন্তু ক্রিয়াপাদ 'নাই' যথারীতি সাধু।

উদাহরণ 'খ' এ মুহাম্মদ মুস্তফার সংলাপে-'কেন' ক্রিয়াপদটিতে আঞ্চলিক উচ্চারণের ছাপ স্পষ্ট এবং 'একটা' নয় 'একটি' ব্যবহৃত হয়েছে। অথচ আঞ্চলিক ক্রিয়াপদের রীতি অনুযায়ী হওয়ার কথা ছিল 'একটা'।

'কাঁদো নদী কাঁদো' উপন্যাসের ভাষার প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এর গতিশীলতা। প্রবহমান নদী মতই এ উপন্যাসের ভাষা চলিষ্ণুতা বিদ্যমান। তবারক ভুইঞা প্রসঙ্গে কথক 'আমি'র অভিমত স্মরণীয়-'বস্তুত তার বাক্য স্রোত রীতিমত একটি নদীর ধারায় পরিণত হয়।' এর তাৎপর্য হচ্ছে কমা, সেমিকোলন, অসমাপিকা ক্রিয়া ব্যবহার করে বাক্যকে দীর্ঘ এবং পিনদ্ধ করা হয়েছে :

Dhaka University Institutional Repository

'তারপর,মুহাম্মদ মুস্তফা যখন প্রস্থান করে, সে-সময়েও তবারক ভূইঞা তাকে কৌতূহল ভরে চেয়ে-চেয়ে দেখে থাকবে : লম্বা কিন্তু শীর্ণ-পাতলা লোক, মাথাটি শরীরের তুলনায় একটি বড় যা দেহের শীর্ণতার জন্যে অযথার্থভাবে বড় মনে হয়, নীরস মুখ, চোখে কেমন সতর্কতা, চলার ভঙ্গিতে একটু অনিশ্চিত ভাব যেন কোথায় যাচ্ছে তা ঠিক জানে না, বাঁ-হাটা ঈষৎ ঘোরানো (সে যখন চেয়ারে - চৌকিতে বসে তখন সে-হাতেই ভর দিয়ে দেহটা একটু হেলিয়ে বসে যেন অদৃশ্য কোন দেয়ালে ঠেস দিয়ে রয়েছে), অন্তরে-অন্তরে লাজুক প্রকৃতির মানুষ যে-লাজুকতা তার জীবনে আকস্মিক পরিবর্তনের ফলে সামরিকভাবে কিছু বৃদ্ধি পেয়েছিলো এই কারণে যে তখনো যে তার নূতন এবং পুরাতন অবস্থার মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করতে সক্ষম হয়নি; দুটির মধ্যে বিরোধিতা ছিলো না, কেবল দুটি তখনো পৃথক সত্তাই ছিলো। [৫৬]

এবাক্যের শব্দ সংখ্যা ১২২, কমা (,)ব্যবহার করা হয়েছে ৯টি, সেমিকোলন (;) ১টি, কোলন (:)১টি, ব্রাকেট (()) ১টি হাইফেন (-)৬টি। অসমাপিকা ক্রিয়া- 'প্রস্থান করে' 'দেখে থাকবে' 'মনে হয়' 'চেয়ারে-চৌকিতে বসে' 'ভর দিয়ে' 'ঠেস দিয়ে' 'স্থাপন করতে' ' হেলিয়ে বসে। দ্বিরুক্ত শব্দ- 'চেয়ে-চেয়ে' 'চেয়ারে-চৌকিতে' 'অন্তরে-অন্তরে' ইত্যাদি। বাক্য গঠন এবং শব্দ প্রয়োগের ক্ষেত্রে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ স্বতন্ত্র অভিজ্ঞান ও নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। বিষয় ও শিল্পশৈলীর প্রয়োজনে কখনো দীর্ঘবাক্য কখনো ছোট বাক্য বন্ধ ব্যবহার করেন এবং প্রায়শ তাঁর বক্যের ধরণ হয় জটিল। অসরল, জটিল বাক্য গঠনই সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর গদ্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য। তবে বিষয় ও বক্তব্য প্রকাশে তাঁর গদ্য অব্যর্থ, শাণিত। কখনো বিবরণের বদলে বিশ্লেষণ কখনো চরিত্রের মনোজাগতিক দ্বন্দ্ব ও প্রশ্নসংকুল আত্মজিজ্ঞাসার কারণে গদ্যেভঙ্গিও হয় সে রকম :

ক. সে ভাবে : চাঁদবরণঘাটে স্টীমার থেকে নেবে খালের এ- পথ দিয়ে চিরদিনই কি তাকে যেতে হবে ? তবে তন্দ্রাচ্ছন্ন মানুষ বিস্ময়কর কথাও বেশিক্ষণ ভাবে না, ভাবছে মনে হলেও তার ভাবনা অগাধ পানির ওপর সমীরণ-আলোড়িত ঈষৎ তরঙ্গমালার মত হাল্কাভাবে খেলা করে, নিচে তন্দ্রা অগাধ পানির মতই স্থির হয়ে থাকে। কিন্তু খাল কোথায় ? একে পুকুর, শ্যাওলা-আবৃত ডোবার মত ছোট পুকুর যার পাড় অসমান, যেন বিশালাকার কোন প্রাণী নখাঘাতে পাড়টির ঐ অবস্থা করছে। তবে পুকুরের পাড়ের দিকে বা পাড়স্থিত গাছপালার দিকে তার দৃষ্টি নেই, দৃষ্টি একটি মুখের ওপর যে-মুখ সে-পুকুরের পানি থেকে ভেসে উঠে এসেছে। সম্পূর্ণভাবে নয়, কারণ ওপরে এসেও আবার কিছু ডুবে রয়েছে যে-জন্যে তা অপরিচিত মনে হয়। তবু সে মুখ অপরিচিত মনে হবে কেন? সে কি খোদেজার মুখ ইতিমধ্যে ভুলে গিয়েছে ? শুধু তার মুখ নয়, ভাবভঙ্গির অপরিচিত ঠেকে ; এমন ভাবভঙ্গি খোদেজার মুখে কখনো লক্ষ্য করেনি। [৫৭]

খ. সহসা মুহাম্মদ মুস্তফার মনে এই বিশ্বাস জন্মে যে খোদেজা একটি প্রতিহিংসাপরায়ণ আত্মায় পরিণত হয়েছে যে আত্মা সারাজীবন তাকে পদে পদে অনুসরণ করবে, অদৃশ্যভাবে,ছায়ার মধ্যে মিশে থেকে, হয়তো বা তাকে এক সময়ে ধ্বংসও করবে। সেদিন রাতে সে যখন তন্দ্রাহীন চোখে বারান্দায় বসেছিলো তখন খোদেজারই উপস্থিতি অনুভব করেছিলো। ভয়টাও তখন জেগেছিলো। এমন ভয় যা মানুষের চোখের সামনে থেকে অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ সমস্ত কিছু নিমিষে নিচিহ্ন করে দেয়। [৫৮]

উল্লেখিত উদ্ধৃতি দুটির প্রতি মনোনিবেশ করলে বোঝা যায়, বিবরণের বদলে তিনি বিশ্লেষণকে অধিক প্রাধান্য দিয়েছেন। কখনো প্রশ্ন পাল্টা প্রশ্ন একই বাক্যে স্থাপন করে গদ্যের মধ্যে একটা প্রবহমান স্পন্দন সৃষ্টি করেছেন। চরিত্রের আত্মদ্বন্দ্ব ও আত্মজিজ্ঞাসা, মনো জাগতিক চেতনা স্রোত প্রকাশেও তিনি একই কৌশল অবলম্বন করেছেন। তাঁর গদ্যের এই বিশ্লেষণ ভঙ্গি দেখে মনে হয়, সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহর গদ্যই গচ্ছে বিশ্লেষণী গদ্য, তাঁর ভাষাই হচ্ছে প্রবহমান চেতনাস্রোত প্রকাশের অব্যর্থ ভাষা। বাংলাদেশের উপন্যাস-সাহিত্যে তাঁর উপন্যাস যেমন বিষয় ও শিল্পশৈলীতে নিঃসঙ্গ ব্যতিক্রম, তেমনি তাঁর উপন্যাসে গদ্যভাষাও স্বতন্ত্র ও প্রাতিস্বিক। তাঁর উপন্যাসে সংলাপের ব্যবহার খুবই স্বল্প। সংলাপের বদলে আত্মকথন, বিবরণ-বর্ণনার বদলে বিশ্লেষণ সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহর গদ্যকে স্ফটিক সংহতি দান করেছে।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যনির্দেশ ও টীকা

১. সৈয়দ আকরম হোসেন, *প্রসঙ্গ: বাংলা কথাসাহিত্য,*১৯৯৭,ঢাকা, মাওলা ব্রাদার্স, পৃ.১১১

২. গোপিকানাথ রায় চৌধুরী, *দুই বিশ্বযুদ্ধ মধ্যকালীন বাংলা কথাসাহিত্য,*১৯৮৬, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং পৃ.২৭-২৮

৩. *প্রসঙ্গ: বাংলা কথাসাহিত্য,* পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৫

৪. রফিকউল্লাহ খান, *বাংলাদেশের উপন্যাস : বিষয় ও শিল্পরূপ,*১৯৯৭,ঢাকা, বাংলা একাডেমী,পৃ.২১০

৫. *প্রসঙ্গ: বাংলা কথাসাহিত্য,* পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৩-৯৪

৬. *চাঁদের অমাবস্যা,* সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ রচনাবলী, প্রথম খন্ড, সৈয়দ আকরম হোসেন, সম্পাদিত, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম পুনমুদ্রণ ১৯৯৩, পৃ.১২৬-১২৭

৭. *চাঁদের অমাবস্যা,* পূর্বোক্ত, পৃ.১২৮

৮. *চাঁদের অমাবস্যা,* পূর্বোক্ত, পৃ.১২৯

৯. *চাঁদের অমাবস্যা,* পূর্বোক্ত, পৃ.১৩০

১০. *চাঁদের অমাবস্যা,* পূর্বোক্ত, পৃ.১৩১

১১. *চাঁদের অমাবস্যা,* পূর্বোক্ত, পৃ.১৩১

১২. 'সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ *'লালসালু'*তে ইমপ্রেশনিস্ট, গীতময়, চিত্রাত্মক ও চিত্রকল্পময় ; ভাবনানুষঙ্গের কখনো প্রতীকস্পর্শী ; *'চাঁদের অমাসব্যা'*য় এক্সপ্রেশনিস্ট, বিশ্লেষণাত্মক, প্রতীকস্পর্শী, মেধাবী-চিত্রকল্পময় ; *'কাঁদো নদী কাঁদো'*তে নতুন এক শিল্পমাত্রায় পরাবাস্তববাদী।' প্রসঙ্গ :বাংলা কথাসাহিত্য,পূর্বোক্ত, পৃ.৯৫

১৩. *চাঁদের অমাবস্যা,* পূর্বোক্ত, পৃ.৯৫

১৪. *চাঁদের অমাবস্যা,* পূর্বোক্ত, পৃ.১০২

১৫. *প্রসঙ্গ: বাংলা কথাসাহিত্য,*পুর্বোক্ত,পৃ.৮২

১৬. *বাংলাদেশের উপন্যাস : বিষয় ও শিল্পরূপ,* পুর্বোক্ত, পৃ.২১২-২১৩

১৭. *চাঁদের অমাবস্যা,* পূর্বোক্ত, পৃ.১৭৪

১৮. *চাঁদের অমাবস্যা,* পূর্বোক্ত, পৃ.১৯৬

১৯. *চাঁদের অমাবস্যা,*পূর্বোক্ত, পৃ.১১৩

২০. *চাঁদের অমাবস্যা,* পূর্বোক্ত, পৃ.১১৪

২১. *চাঁদের অমাবস্যা,*পূর্বোক্ত, পৃ.১১৬-১৭

২২. *চাঁদের অমাবস্যা,*পূর্বোক্ত, পৃ.১৮৮

২৩. *চাঁদের অমাবস্যা,*পূর্বোক্ত, পৃ.৯৫

২৪. *চাঁদের অমাবস্যা,*পূর্বোক্ত, পৃ.৯৫

২৫. *চাঁদের অমাবস্যা,*পূর্বোক্ত, পৃ.৯৫

২৬. আহমদ মাযহার, *"চাঁদের অমাবস্যা, ব্যক্তির অন্তর্জগত"* লালসালু এবং সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহ,মমতাজ উদ্দিন আহমদ সম্পাদিত, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৯, পৃ.১৩৮

২৭. সৈয়দ আবুল মকসুদ, *সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহ জীবন ও সাহিত্য,* দ্বিতীয় খন্ড, ১৯৮৮, ঢাকা, পৃ.১৫৮

Dhaka University Institutional Repository

২৮. আবু রুশ্‌দ, *শওকত ওসমান ও সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহর উপন্যাস,* ১৯৮৮, ঢাকা, সৃজনী প্রকাশনী, পৃ.৫৮
২৯. সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহ, *বই,ষোড়শ বর্ষ,* ১২'শ সংখ্যা, মার্চ ১৯৮১, পৃ.৩
৩০. *চাঁদের অমাবস্যা,*পূর্বোক্ত, পৃ.১০৮
৩১. *চাঁদের অমাবস্যা,*পূর্বোক্ত, পৃ.১১৯
৩২. *চাঁদের অমাবস্যা,*পূর্বোক্ত, পৃ.১২৬-১২৭
৩৩. ১৯৬১ সালের ১লা এপ্রিল থেকে১৯৭১ সালের ১০ই অক্টোবর পর্যন্ত তিনি প্যারিস-এ ছিলেন। মাঝখানে দু'বার ঢাকায় আসেন। ১৯৬৮ সালে ১৮ই ডিসেম্বর স্বপরিবারে দ্বিতীয়বার ১৯৭০ সালে একাকী।
৩৪. জীনাত ইমতিয়াজ আলী, *সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহ : জীবনদর্শন ও সাহিত্যকর্ম,* ১৯৯২, ঢাকা, শিল্পতরু প্রকাশনী, পৃ.২৫
৩৫. *বাংলাদেশের উপন্যাস : বিষয় ও শিল্পরূপ,* পূর্বোক্ত, পৃ.২১৫
৩৬. Mikhail Mikhailovich Bakhtin, *The Dialogic Imagination : Four Essays* (trans.C. Emerson and M.Holquist , ed. M. Holquist) Austin,Tex: University of Texas Press. 1981
৩৭. *প্রসঙ্গ: বাংলা কথাসাহিত্য,* পূর্বোক্ত, পৃ.৮৯
৩৮. সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম, *কতিপয় প্রবন্ধ,* ১৯৯২, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, পৃ.১৫০
৩৯. কাজী মোস্তায়ীন বিল্লাহ, *"স্বস্তিহীন শঙ্কা : সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহর উপন্যাস"* উত্তরাধিকার (সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহকে নিবেদিত সংখ্যা) অক্টোবর-ডিসেম্বর ১৯৮৪, পৃ.৩৭
৪০. *কাঁদো নদী কাঁদো,* পৃ. ১-৭
৪১. *বাংলাদেশের উপন্যাস : বিষয় ও শিল্পরূপ,* পূর্বোক্ত, পৃ.২১৭
৪২. আবদুল মান্নান সৈয়দ, *সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহ,* ১৯৮৬,ঢাকা,মুক্তধারা,পৃ.১৩৪
৪৩. *প্রসঙ্গ: বাংলা কথাসাহিত্য,* পূর্বোক্ত, পৃ.৮৯
৪৪. *প্রসঙ্গ: বাংলা কথাসাহিত্য,* পূর্বোক্ত, পৃ.৮৯
৪৫. *কাঁদো নদী কাঁদো,* পৃ. ৩৪৫-৪৬
৪৬. *কাঁদো নদী কাঁদো,* পৃ. ৩৫৪
৪৭. *কাঁদো নদী কাঁদো,* পৃ. ৩৫৫
৪৮. *কাঁদো নদী কাঁদো,* পৃ. ৩৪৮-৩৫২
৪৯. *প্রসঙ্গ: বাংলা কথাসাহিত্য,* পূর্বোক্ত, পৃ.৯০
৫০. *কাঁদো নদী কাঁদো,* পৃ. ২০২
৫১. *কাঁদো নদী কাঁদো,* পৃ. ৩২৫
৫২. *কাঁদো নদী কাঁদো,* পৃ. ৩৫৫
৫৩. শিরীণ আখতার, *বাংলাদেশের তিনজন ঔপন্যাসিক,* ১৯৯৩, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, পৃ. ২৩৭-২৩৮
৫৪. *কাঁদো নদী কাঁদো,* পৃ. ৩৫৬
৫৫. *কাঁদো নদী কাঁদো,* পৃ. ৩০৪
৫৬. *কাঁদো নদী কাঁদো,* পৃ. ২২৩
৫৭. *কাঁদো নদী কাঁদো,* পৃ. ৩৩৪
৫৮. *কাঁদো নদী কাঁদো,* পৃ. ৩৪০

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায় : মিথ-ইতিহাস-ঐতিহ্যের নবমূল্যায়নধর্মী নতুন শিল্পশৈলীর উপন্যাস

ক. ভাওয়াল গড়ের উপাখ্যান

খ. অভিশপ্ত নগরী

গ. পাপের সন্তান

Dhaka University Institutional Repository

মিথ-ইতিহাস-ঐতিহ্যের পুর্নমূল্যায়নধর্মী নতুন শিল্পশৈলীর উপন্যাস

সময়, সমাজ ও ইতিহাসবোধ যে কোনো সৃষ্টিশীল জাগর চৈতন্যের অনিবার্য অবলম্বন। লেখকের চেতনার গভীরে প্রোথিত ইতিহাস চেতনা এবং সমাজ বোধের স্পর্শে ঐতিহ্যিক উপদানের পুনর্জন্ম ঘটে, সমকালের অভিজ্ঞতার উত্তাপে ঐতিহ্যিক চরিত্রের অনুসরণে সৃষ্টি হয় নতুন নতুন চরিত্র।[১] কল্লোলিত সমকাল থেকে তুলে নেয়া কোনো ঘটনাংশ যখন চেতনাসঞ্চারী ঐতিহ্যের স্পর্শে নতুনমাত্রায় অভিব্যঞ্জিত হয় তখন স্রষ্টার জীবনার্থ সন্ধান ও জাতিসত্তা সন্ধানের পরিচয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বিরুদ্ধ সমাজ-প্রতিবেশ, ও বৈরী রাষ্ট্র-পরিস্থিতিতে বিভাগোত্তর(১৯৪৭-১৯৭১) বাংলাদেশের ঔপন্যাসিকরা সমকাল থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে উপন্যাসের বিষয় সন্ধানে মিথ-ইতিহাস-ঐতিহ্যের আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। 'স্বাধীনতা-পূর্বকালে কলোনি-শোষণ ও সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ ও প্রতিবাদ জ্ঞাপনের বিকল্প উপায় হিসেবে মিথ-ঐতিহ্য ও ইতিহাস অবলম্বী রূপক ও প্রতীকী উপন্যাসের উদ্ভব ঘটে। আধুনিক উপন্যাসের এ-এক মননশীল প্রকরণ। এর শিকড় সংলগ্ন থাকে সংগ্রামী সভ্যতার সময় গর্ভে। মিথ-ঐতিহ্য ও ইতিহাস এক্ষেত্রে উপন্যাসের উপরকণ মাত্র নয়,বরং বিষয়, বা Author's attitude towards life. লোকপুরাণের ফিনিক্স পাখি যেমন নিজের ছাই থেকে নতুন দেহ নিয়ে জেগে ওঠে, তেমনি মৃত ইতিহাস থেকে জেগে ওঠে আর এক ইতিহাস।'[২] ইতিহাসের সময়গর্ভে লুক্কায়িত প্রত্ন-সম্ভাবনা, ঐতিহ্যের কঙ্কালে সংক্ষুব্ধ জীবনাবেগকে নব নির্মাণের মধ্য দিয়ে এপর্বের ঔপন্যাসিকরা সঞ্চার করেছেন নবযুগের নতুনতর সংবেদনা। 'জীবনার্থের মানবমুখিতায় একজন শিল্পী ইতিহাসের ঘটনাক্রম ও চরিত্রপাত্রের মধ্যের সমকালীন মানুষের আত্মসন্ধান, সত্তাসন্ধান ও জাতিসত্তা সন্ধানের নিগূঢ় ভাবনাবীজ আবিষ্কারে সমর্থ হন। সকালের বন্ধি সমাজসত্তার মুক্তি আকাঙ্ক্ষায় বাংলাদেশের ঔপন্যাসিকরা ইতিহাস ও পুরাণলোকে উজ্জীবনের যে শক্তি-উৎস সন্ধান করেছেন, সমাজ পটভূমিকার বিচারে তার মূল্য গৌণ নয়।'[৩] বিভাগোত্তর বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে জাতিসত্তার স্পন্দিত শক্তি সঞ্চয়ে, উপন্যাস শিল্পের নতুনমাত্রা সন্ধানে, ঔপন্যাসিকরের মিথ-ঐতিহ্য-ইতিহাস আশ্রয়ী শিল্প-অভিপ্রায়ের গুরুত্ব অপরিসীম। আবু জাফর শামসুদ্দীনের (১৯১১-১৯৮১) 'ভাওয়াল গড়ের উপাখ্যান' (১৯৬৩), 'পদ্মা মেঘনা যুমনা' (১৯৭৪) সত্যেনসেনের (১৯০৭-১৯৮১), 'অভিশপ্ত নগরী' (১৯৬০) 'পাপের সন্তান' (১৯৬৯) ; সেলিনা হোসেনের(জন্ম১৯৪৭)'নীল ময়ূয়ের যৌবন'(১৯৮৩), 'চাঁদবেনে'(১৯৮৪); শওকত আলীর (জন্ম ১৯৩৬)'প্রদোষে প্রাকৃতজন'(১৯৮৪); রিজিয়া রহমানের (জন্ম১৯৩৯) 'একাল চিরকাল' (১৯৮৪), সৈয়দ শামসুল হকের (জন্ম ১৯৩৫)'আয়না বিবির পালা'(১৯৮৪), এধারার উল্লেখযোগ্য উপন্যাস। আমাদের আলোচ্য সময়সীমার (১৯৪৭-১৯৭১) মধ্যে প্রকাশিত এ ধারার উপন্যাস- 'ভাওয়াল গড়ের উপাখ্যান', 'অভিশপ্ত নগরী' এবং'পাপোর সন্তান'।সঙ্গত কারণে উল্লিখিত তিনটি উপন্যাসের আলোচনাই উপস্থাপন আমরা এখানে করবো।

ভাওয়াল গড়ের উপাখ্যান

আবু জাফর শামসুদ্দীনের (১৯১১-১৯৮১)'ভাওয়াল গড়ের উপাখ্যান'(১৯৬৩) ইতিহাসখ্যাত ফরাজী আন্দোলনে পটভূমিতে রচিত হলেও এটিকে প্রকৃতপক্ষে ঐতিহাসিক উপন্যাস বলা যায় না। কারণ, ঐতিহাসিক, ঘটনা বা

Dhaka University Institutional Repository

চরিত্রকে তিনি অবলম্বন করেন নি বরং ইতিহাসের ভাবসত্যকে তিনি অনুসরণ করেছেন মাত্র। ব্যক্তিগত জীবনে আবু জাফর শামসুদ্দীন ছিলেন একজন প্রাজ্ঞ ও সফলকাম সাংবাদিক, ফলে দৃষ্টি-নিরপেক্ষ চোখ দিয়ে তিনি অবলোকন করেছিলেন বাঙালীর স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধিকার অর্জনের সংগ্রামী চেতনাকে। 'ভাওয়াল গড়ের উপাখ্যান' তাঁর আত্ম-অনুসন্ধান ও স্বাতন্ত্র্য আবিষ্কারের বিশ্বস্ত শিল্পভাষ্য। বিভাগ (১৯৪৭) উত্তর সমকালীন অন্যান্য বাঙালী মুসলমান লেখক যখন পশ্চিম এশীয় পুঁথি পুরাণের মধ্যে নিজেদের ঐতিহ্যের সন্ধানে ব্যস্ত তখন আবু জাফর শামসুদ্দীন আপন শ্লাঘারবোধ উজ্জীন প্রচেষ্টায় স্ব-ভূমির ইতিহাস-ঐতিহ্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন। প্রদোষ লগ্ন থেকে ধাবমান কাল পর্যন্ত শতমূলে সঞ্চারিত বাঙালির আত্মরক্ষার সংগ্রামী চেতনা এক্ষেত্রে তাঁকে আকর্ষণ করেছে। ঐতিহাসিক চরিত্র বা ঘটনা তাঁকে প্রলোভিত করেনি বরং ইতিহাসের ভাবসত্য তাঁকে প্রেরণা যুগিয়েছে। এর কারণ, ইতিহাস নির্জীব, নিশ্চল, অতীতের কাহিনী, ইতিহাসের সত্যকে হুবহু অনুসরণ করতে গেলে ঔপন্যাসিক ইতিহাসের সত্য-শৃঙ্খলে বাঁধা পড়েন। শিল্প কখনো সত্য-শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকতে পারে না-শিল্পের স্বভাবই বন্ধন মুক্তি। তাই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) তাঁর 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' প্রবন্ধে বলেছেন- 'ইতিহাস পড়িব না আইভানহো পড়িব? ইহার উত্তর অতি সহজ। দুই-ই পড়ো। সত্যের জন্য ইতিহাস পড়ো, আনন্দের জন্য আইভানহো পড়ো। .. .. কাব্যে যদি ভুল শিখি, ইতিহাসে তাহা সংশোধন করিয়া লইব।'[৩] আবুজাফর শামসুদ্দীন এক্ষেত্রে শিল্পে প্রতিশ্রুত ও ইতিহাসের ভাবসত্যে অনুশ্রুত বিষয় অবলম্বন করেন। ফরায়েজি আন্দোলন, ইংরেজদের বিরুদ্ধে পরিচালিত ধর্মপ্রাণ বাঙালি মুসলমানদের আত্মরক্ষা ও স্বাতন্ত্র্য রক্ষার সংগামে এক রক্তাক্ত অধ্যায়। উনবিংশ শতাব্দীর কলকাতা কেন্দ্রিক বাঙালির রেনেসাঁসের মৌল বৈশিষ্ট্য হিসেবে ধর্ম ও সমাজ সংস্কারের যে প্রাবল্য দেখা যায়, মুসলমান জনগোষ্ঠীও সেরূপ সংস্কার আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন ছিলনা। হিন্দু সমাজের ধর্ম ও সমাজসংস্কার আন্দোলনের পাশাপাশি মুসলমান সমাজের ধর্ম ও সমাজসংস্কার আন্দোলন উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধেই প্রবলরূপ ধারণ করে।[৪] উত্তর ভারতের সৈয়দ আহমদ তৎকালী পূর্ব বাংলার ফরাজি নেতা হাজী শরীয়তুল্লাহ (১৭৮১-১৮৪০) এবং চব্বিশ পরগনার (হাজী নিসার আলী) তিতুমীর (১৭৮২-১৮৩১) হজ্ব পালন করতে মক্কায় গিয়ে ওহাবিদের সংস্পর্শে আসেন এবং দেশে ফিরে এসে এই সংস্কার আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করেন। এর পূর্বে ফকিরমজনু শাহ-র নেতৃত্বে বাংলার ফকির বিদ্রোহের কথা স্মরণ করা যায়। বাংলাদেশ ভূখন্ডে ফরাজি আন্দোলন তথা এই সংস্কার আন্দোলনের নেতা ছিলেন হাজী শরীয়তুল্লাহ। তিনি বর্তমান শরীয়তপুর জেলার অধিবাসী ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর পুত্র মহসীন আলদীন আহমদ দুদুমিঞা (১৮১৯-১৮৬০) এ আন্দোলনের নেতৃত্ব নেন। মূলত এই দুদুমিঞার প্রচেষ্টায় 'ফরাজী আন্দোলন' ধর্মীয় , সমাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আন্দোলনের এক মিশ্র রূপ ধারণ করে।'[৫] বাংলার ফরজি আন্দোলনের কর্মীদের সঙ্গে সমকালীন শাসকগোষ্ঠী বার বার সংঘর্ষে অবতীর্ণ হলেও এসংঘাতের কোনো রাজনৈতিক রূপ ছিলো না। তবে এ আন্দোলন বাংলার মুসলিম মানসে সংগ্রামের বীজ উপ্ত করেছিল, যা উত্তরকালে সর্বভারতীয় ওহাবি আন্দোলনের প্রেরণা যোগায়। ওহাবি আন্দোলন প্রথমে ধর্ম সংস্কার আন্দোলন হিসেবে শুরু হলেও পরিণামে ব্রিটিশ বিরোধী রূপ ধারণ করে।'[৬] আবু জাফর শামসুদ্দীন ইতিহাসের সময় গর্ভে লুকায়িত প্রত্ন সম্ভাবনা থেকে প্রেরণা লাভ করেছেন। তাঁর 'ভাওয়াল গড়ের উপাখ্যান' ইতিহাস সমৃদ্ধ রোমান্সধর্মী উপন্যাস। বাংলাসাহিত্যে ঐতিহাসিক উপন্যাসের যে ধারা বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৩৮-১৮৯৪) 'রাজসিংহ', রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৬১-১৯৪১), 'রাজর্ষি', 'বৌ-ঠাকুরাণীর হাট' ইত্যাদিতে পরিশ্রুত, সেই ধরার থেকে আবু জাফর শামসুদ্দীনের 'ভাওয়াল গড়ের উপাখ্যান' ভিন্ন। তাঁর অন্বেষণ ছিলো বাঙালির সংগ্রাশীল চেতনা আবিষ্কার।

Dhaka University Institutional Repository

২.

আবু জাফর শামসুদ্দীনের 'ভাওয়াল গড়ের উপাখ্যান' ইতিহাসের ভাবসত্যে সমৃদ্ধ, বাঙালির সংগ্রামীচেতনা ও জাতিসত্তার উজ্জীবনমূলক উপন্যাস। বিষয় ও মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় তিনি প্রগতিশীল চিন্তার স্বাক্ষর রাখলেও প্রকরণ-পরিচর্যায় ততটা যত্নশীল নন। উপন্যাসের কাহিনী বিন্যাস, চরিত্র-চিত্রণ, ভাষা ও জীবনবেদ নির্মাণের ক্ষেত্রে তিনি অনেকটা প্রথাগত। প্রায় সাড়ে চার'শ পৃষ্ঠার বিশাল আয়তনের এই উপন্যাসে অসংখ্য উপকাহিনীর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে অনেকগুলো চরিত্র। সময় ও সমাজবাস্তবতাকে অধিক গুরুত্ব দিতে গিয়ে এই উপন্যাসের কাহিনীর বিস্তৃতি ও অজস্র চরিত্রের সমাবেশ ঘটেছে। 'ভাওয়াল গড়ের উপাখ্যান' 'গ্রন্থনৈপুণ্যে ও বর্তমান শতকের সমান্তরাল ঘটনার সাদৃশ্যে গত শতকের ঘটনাকে নবতাৎপর্য দানে মূল্যবান হয়ে উঠেছে।'[৭] কাহিনী নির্বাচনে ঔপন্যাসিকের ইতিহাসবোধ ও ঐতিহ্যের অঙ্গীকার সুস্পষ্ট। 'উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালি মুসলমানের স্বাতন্ত্র্যসাধনার রক্তক্ষয়ী প্রচেষ্টা ফরাজি আন্দোলনের পটভূমিকায় এ উপন্যাসের আখ্যান গড়ে উঠেছে। ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে মুসলমানদের বিদ্রোহের প্রস্তুতি এবং ইংরেজ রাজশক্তি ও তাদের অনুচর হিন্দুদের সঙ্গে সংঘাত, পরিণামে আন্দোলনকারীদের বিপর্যয় উপন্যাস কাহিনীর সারাংশ।'[৮] কাহিনীর পরিকল্পনা করা হয়েছে ফরাজি আন্দোলনের অন্যতম নেতা চুরুলিয়ার গুলাম নবী'র ভাওয়ালের আস্তানাকে কেন্দ্র করে। উপন্যাসটির শুরু হয়েছে এভাবে :

> 'ফালগুন মাস। পথে ঘাটে আমের বোলের সুস্নিগ্ধ গন্ধ ; শিমুল আর কৃষ্ণচূড়া ফুলের বর্ণ সমারোহ। চোখ ঝলসে যায়, মনে হয় চারিদিকে যেন বর্ণের আগুন লেগেছে। নূর বখ্‌শ সফরে বের হয়েছেন। সঙ্গে একমাত্র পুত্র কমরুদ্দীন। বয়স বারো তেরো।'[৯]... ..

বর্ণাঢ্য প্রাকৃতিক পরিবেশে ঔপন্যাসিক চরিত্রকে স্থাপন করেছেন। নূর বখ্‌শ তার একমাত্র পুত্র কমরুদ্দীনকে সঙ্গে নিয়ে অভিযাত্রায় বের হয়েছেন। এই নূরবখ্‌শ ফরাজি আন্দোলনের একজন নিবেদিত প্রাণ কর্মী। নূর বখ্‌শ অনেক বন-জঙ্গল, গ্রামপথ অতিক্রম করে ভাওয়ালের বনে গুলাম নবীর আস্তানায় এসে উপস্থিত হয়। পুত্র কমরুদ্দীন সেখানে সঙ্গী হিসেবে পায় গুলাম নবীর কন্যা নুরুন্নাহারকে, উভয়ে সমবয়সী। ভাওয়াল আস্তানায় অবস্থান করার সময় একদিন নূর বখ্‌শ শুনতে পান, তাদের আন্দোলনের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র 'সিতানার ঘাটি' নাসারারা পুড়িয়ে দিয়েছে। নূর বখ্‌শের মধ্যে আন্দোলনে স্পৃহা বাড়ে। গুলাম নবীর আস্তানার কাছেই একটি ভাঙ্গা মসজিদ। এই মসজিদে আন্দোলনের কর্মীরা আসে, গুলাম নবী তাদের নানা আদেশ উপদেশ, কৌশল শিক্ষা দেন। জাহান্দার ও আসে, বয়সে নবীন হলেও কর্তব্যে সে নিষ্ঠাবান। নূর বখ্‌শ দীর্ঘদিন আস্তানায় থাকার পর একদিন বাড়ি উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। পুত্র কমরুদ্দীন নুরুন্নাহারের সঙ্গে গুলাম নবীর কাছে শিক্ষালাভ করতে থাকে। বাংলার নীল চাষের শেষ সময়। নীলকর বাঙালী হিন্দু জমিদার সত্যানারায়ণ এবং ইংরেজ রয়েসটন সাহেব নীলের চাষ বাড়ানোর জন্য অন্য নীলকর সাহেবদের মত অত্যাচারের মাধ্যমে দুঃসহ করে তুলেছিল সাধারণ চাষীর জীবনকে। নীলকর সাহেবরা ছিলো ফরাজি আন্দোলনের কর্মীদের আক্রমণের লক্ষ্য বস্তু। রয়েসটন সাহেবকে একাবর বোলাই বিলে হাতে পেয়েও জাহান্দার কেবল তার থেকে প্রতিশ্রুতি আদায় করিয়ে ছেড়ে দেয়। কিন্তু এর ফল ভোগ করতে হয় আশপাশের গ্রামের চাষীদের। রয়েসটন সীমাহীন অত্যাচার করে নীরিহ চাষীদের উপর। নীলকর সাহেবদের অত্যাচার থেকে গরীব চাষীদের বাঁচাবার জন্য ফরজি আন্দোলনের যোদ্ধারা কৃষকদের সঙ্গে যোগ দেয়। অপর দিকে নীলকরদের সাহায্য

Dhaka University Institutional Repository

করে এদেশের কিছু হিন্দু জমিদার,সেপাই-সান্ত্রী। প্রথম দিকে ফরাজি আন্দোলনের কর্মীদের সঙ্গে ইংরেজদের তেমন কোন দ্বন্দ্ব না থাকলেও পরে বাংলার কৃষক-জমিদার দ্বন্দ্বসূত্রে সংঘাত অনিবার্য হয়ে ওঠে। উপন্যাসের ভাষায় :

'প্রকাশ্যে মৌলভী মুন্সীদের প্রচার ছিল খাঁটি ধর্মীয় জীবন পুন: প্রতিষ্ঠার আন্দোলন। সুতরাং আলেমদের সঙ্গে সংগ্রামে লিপ্ত হওয়ার অর্থ ছিল ইসলাম ধর্মের বিরুদ্ধে সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়া। ইংরেজী রাজশক্তি রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক জীবনে মসুলমানদের সর্বনাশ সাধনে তৎপর ছিল বটে কিন্তু তারা সমগ্র ভারতের মুসলমান সমাজকে ধর্ম রক্ষার জেহাদে আহবান করতে প্রস্তুত ছিলনা।'[১০]

নূর বখ্শ নিজের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নসু প্রধানকে জমিদার সত্যনারায়ণের অত্যাচার থেকে রক্ষা করার জন্য নসুপ্রধানের বাড়িতে অবস্থান করে। কিন্তু শেষ রক্ষা হয় না। কুঠিখালের আক্রমণে আহত হয়ে নসু প্রধান ও তার সাঙ্গপাঙ্গরা বন্দী হয়। এখবর পেয়ে জাহান্দার কুঠি আক্রমণ করে এবং যুদ্ধ করে তাদেরকে মুক্ত করে, কিন্তু সেই খন্ডযুদ্ধে নসু প্রধান মারা যায়। এদিকে পুলিশ গুলাম নবীর আস্তানা আক্রমণ করে। সংঘর্ষে দলনেতা গুলাম নবী নিহত হয়। জাহান্দার এসে গুলাম নবীর রক্তাক্ত দেহ দেখে এবং তার লাশ পেছনে রেখে নূরুন্নাহারকে নিয়ে বনে আত্মগোপন করে। নুরুন্নাহার দেখতে পায় জাহান্দারও আহত। কমরুদ্দীন বাড়ি থেকে ফিরে এসে দেখে গুলাম নবীর আস্তানা লন্ডভন্ড, কেবল কয়েকটি মৃতদেহ পড়ে আছে, নূরুন্নাহর সেখানে নেই। নুরুন্নাহারের জন্য তার হৃদয় হাহাকার করেওঠে। কারণ নুরুন্নাহারের সঙ্গে রয়েছে তার অনেক স্মৃতি, ভালোবাসার নিবিড়বন্ধন। উপন্যাসটির শেষ হয়েছে এভাবে :

'দেশ শান্ত সমাহিত হয়।বাঙ্গলার ঊনবিংশ শতাব্দীর মুক্তি সংগ্রামের উপর যবনিকা পড়ে। ইংরেজ সরকার স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ে।'[১১]

উপন্যাসের এই পরিসমাপ্তিতে কোনো বিজয় কিংবা উজ্জীবন লক্ষ্য করা যায় না। উপন্যাসের ভাষায় 'বাংলার মুক্তিসংগ্রামের যবনিকা' ধ্বনিত হয়েছে। তবু ঔপন্যাসিকের কাহিনী বিন্যাস ও চরিত্র চিত্রণে বাঙালির সংগ্রামশীল চেতনার স্পন্দন সঞ্চারিত। উপন্যাসের ঘটনাক্রমে, চরিত্রের আচরণ উচ্চারণে বাঙালি মুসলমানের আত্ম-অনুসন্ধান স্পষ্ট। গুলাম নবীর অভিব্যক্তিতে তারই আভাস পাওয়া যায় :

'তিস্তা, গঙ্গা, পদ্মা, যমুনা, ব্রক্ষপুত্র , মেঘনা আর তাদের শত সহস্র শাখা-প্রশাখার ঐশ্বর্যবান বাঙ্গলার পলিমাটির মানুষ পরাধীনতা বরদাশত করতে পারে না। এখানকার মানুষ চায় বৃক্ষলতা ও লোকবসতী হীন নদী চরের সুর্যালোকের মতো নির্ভেজাল মুক্ত আলোবাতাস। মন তার ছুটে বল্গাহারা অশ্বের মতো। সে চায় না তার জীবনে বাইরের লোকের খবরদারী। রজ্জুর বন্ধন আর চির বন্ধন তার কাছে এক বরাবর। ভাইসব, এ জনতাকে এক কর। বর্ণ হিন্দু কেউ কেউ যদি নাসারাদের সঙ্গে যোগ দিয়ে থাকে, কিছু আসে যায় না তাতে। মুসলামান গদ্দারদের কথাও ভুলে যাও। দেশের বাকী শতকরা নব্বই জনই আমাদের কাজের জন্য যথেষ্ট। কোচ, কোল,সাঁওতাল এবং সাধারণ হিন্দু আর মুসলমানের সমন্বয়ে গঠিত শক্তির মোকাবেলায় নাসারা আর তার সহায় দেশী হিন্দু মুসলমান গাদ্দারের দল এক ফুৎকারে তৃণের মতো উড়ে যাবে।'[১২]

Dhaka University Institutional Repository

এই সংগ্রামী জীবনচেতনার প্রদীপ্ত উচ্চারণ 'ভাওয়াল গড়ের উপাখ্যান' উপন্যাসে শিল্পায়িত হয়েছে। উপন্যাসের মধ্যপর্যায়ে ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধ করে নুর বখ্শ মারা যায়, বাংলার স্বাধীনতার জন্য প্রাণ দেয় গুলাম নবী। এই সংগ্রামী চেতনার উত্তরাধিকার বহন করার জন্য কেবল বেঁচে থাকে গুলাম নবীর যোগ্য শিষ্য জাহান্দার, কমরুদ্দীন, নুরুন্নাহার। উপন্যাসের চরিত্র পাত্রে সংগ্রামী চেতনার বাস্তবসম্মত জীবনাকাঙ্ক্ষা প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হয়েছেন, এখানেই ঔপন্যাসিকের কৃতিত্ব।

'ভাওয়াল গড়ের উপাখ্যান' উপন্যাসে আবু জাফর শামসুদ্দীন প্রধানত বিবরণধর্মী উপস্থানরীতির উপর নির্ভরশীল ছিলেন। ফলে ঘটনা ও চরিত্রের ক্রিয়-প্রতিক্রিয়া উপস্থাপনে তিনি ব্যবহার করেছেন চিত্রশৈলী (pictorial manner) পক্ষান্তরে গ্রামীন জীবনপ্যাটার্নের স্বরূপ উন্মোচনে ব্যবহার করেছেন বর্ণনা (narration) । সময় প্রবাহ ও জীবনপ্রবাহের অনিবার্য প্রয়োজনে এসেছে অনেক চরিত্র-নূর বখ্শ, গুলাম নবীম, জ াহান্দার, কমরুদ্দীন, নসু প্রধান, জমিদার সত্যনারয়ণ, কুঠিয়াল ওয়েসটন সাহেব, বলাই ঠাকুর, প্রসন্ন ঘোষ, নুরুন্নাহার প্রমুখ। তবে নুর বখশ্ গুলাম নবী,জাহান্দার কমরুদ্দীন ও নুরুন্নাহার এ উপন্যাসের মূল সত্য ও বক্তব্যকে প্রকাশ করেছে।
নূর বখ্শ দুটি উদ্দেশ্য সামনে রেখে বাড়িতে মাদ্রাসা স্থাপন করেছে :

এক. ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত করে মুসলমান সমাজকে উন্নত করা। দুই. ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য খাঁটি সৈনিক তৈরি করা। ইংরেজদের বিরুদ্ধে জেহাদকে ত্বরান্বিত করার জন্য তিনি মাদ্রাসা থেকে অর্জিত অর্থের একটা অংশ পাটনা মূল ঘাটিতে পাঠান। নূর বখ্শ এ উপন্যাসে আদর্শের প্রতীক। সে যেমন নিজে ইংরেজের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম করে স্বাধীনতার জন্য আত্মোৎসর্গ করে, তেমনি আপন পুত্র কমরুদ্দীনকেও উৎসর্গ করেছে। তবু এ চরিত্রটির ত্রুটি কিছুতেই ঢেকে রাখা যায় না। পুরো উপন্যাসে নূর বখ্শ চরিত্রটি রক্ত মাংসের মানুষনা হয়ে, আদর্শের প্রতীক হয়ে থেকেছে। সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বের নূর বখ্শ চরিত্রটি বহুমাত্রিকতা লাভ করতে পারেনি।

গুলাম নবী চরিত্রটি এ উপন্যাসের মূল বক্তব্য ও সত্যের স্থপতি। গুলাম নবী ফরাজি আন্দোলনের অন্যতম নোতা, একদিনের জন্যও সে নিজের কর্তব্য অবহেলা করেনি। শিশুকন্যা নুরুন্নাহারকে সঙ্গী করে সে ভাওয়ালের বনঅঞ্চলেই আস্তানা গড়ে তোলে আন্দোলনরত কর্মীদের শিক্ষা ও কৌশল, পরামর্শপ্রদান করে। যদিও তার চরিত্র স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষার চেয়ে ধর্মীয় অনুশীলনের তাগিদ বেশি। তার কর্মকান্ড গোয়েন্দা চরিত্রের সঙ্গে তুলনীয়। শেষ পর্যন্ত গোলাম নবী ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধ করে পরজিত ও নিহত হন।

এ উপন্যাসের বিস্তৃত পরিসর জুড়ে রয়েছে নুরুন্নাহার এবং কমরুদ্দীনের চরিত্র। নুরুন্নাহারের সঙ্গে একই আস্তানায় থাকতে গিয়ে ধীরে ধীরে বুঝতে পারে নুরুন্নাহার তার হৃদয়ের অমোঘ আসন লাভ করেছে। নুরুন্নাহার ছাড়া যেন সে অসম্পূর্ণ। এদিকে নুরুন্নাহারও কমনুদ্দীনের প্রেমের স্পর্শে কিশোরী থেকে যুবতী নারীতে পরিণত হয়ে ওঠে। যদিও উপন্যাসে শেষে বিধ্বস্ত আস্তানায় গিয়ে কমরুদ্দীন নুরুন্নাহারকে পায় না, তার আর্তনাদ ও হাহাকারই ধ্বনিত হয় কেবল, তবু স্পষ্ট যে, কমরুদ্দীন এবং নুরুন্নাহারের প্রেমকেই উপন্যাসিক প্রয়োজনীয় পরিচর্যা দিয়েছেন। তারা এই সংগ্রামী রক্তধারার উত্তরাধিকার বহন করে ভাবীকালের যাত্রী হয়।

Dhaka University Institutional Repository

৩.

'ভাওয়াল গড়ের উপাখ্যান' উপন্যাসের ভাষা চিত্ররূপময়। গদ্যভঙ্গি সাবলীল। বিষয় ও চরিত্রের ভাব অনুযায়ী শব্দ প্রয়োগের ফলে বাক্যের গঠন সরল, অজটিল, নিরালঙ্কারতবে কাব্যময় :

> 'ফালগুন মাস। পথে ঘাটে আমের বোলের সুস্নিগ্ধ গন্ধ ; শিমুল আর কৃষ্ণচূড়া ফুলের বর্ণ সমারোহ। চোখ ঝলসে যায়, মনে হয় চারিদিকে যেন বর্ণের আগুন লেগেছে।' [১৪]

উদ্ধৃতাংশে বাক্যের গঠন ছোট, বড়, অসমান। চলিত শব্দের সহজ ব্যবহারে তা হয়ে উঠেছে সাবলীল। তবে কখনো কখনো চরিত্রের ভাব প্রকাশে আবু জাফর শামসুদ্দীনের ভাষা হয়ে উঠেছে পিনদ্ধ কিন্তু গতিশীল :

> 'তিস্তা, গঙ্গা, পদ্মা, যমুনা, ব্রহ্মপুত্র, মেঘনা আর তাদের সহস্র শাখা প্রশাখায় ঐশ্বর্যবান বাঙ্গলার পলিমাটির মানুষ পরাধীনতা বরদাশত্ করতে পারে না। এখানকার মানুষ চায় বৃক্ষলতা ও লোকবসতীহীন নদীচরের সূর্যলোকের মতো নির্ভেজাল মুক্ত আলো বাতাস। মন তার ছুটে বল্গাহারা অশ্বের মতো। সে চায় না তারজীবনে বাইরের লোকের খবরদারী। '[১৫]

উদ্ধৃতাংশে বাক্যের গঠন অজটিল, গতিশীল, শব্দ নিরালঙ্কার। চলতি শব্দের পাশে ফারসি শব্দের সহজ ব্যবহার লক্ষ্যনীয় - 'বরদাশ্ত' (অর্থ-সহ্য করা) 'খবরদারী' (অর্থ-তত্ত্বাবধান)। সমকালীন বাঙালী মুসলাম লেখকদের আরবি, ফার্সি শব্দ ব্যবহারের যে অতি উৎসাহী প্রবণতা লক্ষ করা যায়, তার তুলনায় আবু জাফর শামসুদ্দীনের গদ্যভাষায় আরবি ফারসি শব্দের ব্যবহার খুবই কম। যেটুকু ব্যবহার করেছেন তাও বিষয় ও চরিত্রের বিশেষ মানসপ্রবণতার প্রয়োজনেই।

অভিশপ্ত নগরী

মানবেতিহাস তথা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের আকর উপাদান গুলোর অন্যতম সম্পদ হচ্ছে মিথ (Myth)। আদিম মানুষের কাছে মিথ ছিলো সামগ্রিক জ্ঞানের ভান্ডার,অস্তিত্বের স্বরূপ নিরূপনের ক্রিয়াক্ষেত্র। মিথ ধারণ করে ঈশ্বর ও সৃষ্টি সম্পৃক্ত ভাবনাবলি, অতিপ্রাকৃত ঘটনাবলি কিংবা অতিমানবদের অস্তিত্ব। কোনো জাতির আদি ইতিহাস সম্পৃক্ত বিশ্বাস বা ধারণার পুরাণকথাকে মিথ বলা হয়। মিথ শুধু আদিম সংস্কৃতি নয়, বিংশ শতাব্দীর এই যন্ত্রযুগের জটিল মানসক্রিয়ার- সংস্কৃতিতে মিথের উপস্থিতি উজ্জ্বল এবং সমানভাবে প্রাসঙ্গিক। কারণ মিথে ভেতর এমন এক শক্তি সঞ্চিত যে, যেকোনো সভ্যতার সময় সংকটে তা অস্তিত্বের নতুন জীবনাবেগ সঞ্চার করতে সক্ষম। মিথ-ঐতিহ্যের নবনির্মাণ তাই আধুনিক উপন্যাসের এক মননশীল শিল্পশৈলী।

বিভাগ উত্তর বাংলাদেশের অবরুদ্ধ সমাজ ও বৈরী রাষ্ট্র পরিস্থিতির কারণে ঔপন্যাসিকরা মিথ-ঐতিহ্যের নবমূল্যাশ্রয়ী মননশীল শিল্পাঙ্গিকের প্রতি মনোযোগী হন। 'মিথ-নির্ভর উপন্যাসের ফর্ম নির্মাণে আমাদের সাহিত্যে

Dhaka University Institutional Repository

সত্যেন সেন (১৯০৭-১৯৮১) ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্ব। The old testament-এর ঘটনাংশকে তিনি চিরায়ত মানবীয় সংগ্রামের সাথে প্রতিন্যাস করেছেন 'অভিশপ্ত নগরী' (১৯৬৮) এবং'পাপের সন্তান'(১৯৬৯) উপন্যাসে । মিথের নবরূপায়ণে, গদ্যশৈলীর ধ্রুপদীবিন্যাসে এবং বক্তব্যের সমকালীন সংকুট বিবেচনায় এদুটি উপন্যাস বাংলাদেশের উপন্যাসে স্বতন্ত্র, অনতিক্রান্ত।'[১৬] সত্যেন সেনই বাংলাসাহিত্যের প্রথম ঔপন্যাসিক, যিনি বাইবেলের কাহিনী নিয়ে শিল্প-সফল উপন্যাস রচনা করেছেন। 'ওল্ড টেস্টামেন্ট' এর 'বুক অব দ্য প্রফেট :যেরেমিয়া খন্ড' থেকে তিনি 'অভিশপ্ত নগরী' এবং 'পাপের সন্তান' উপন্যাসদ্বয়ের কাহিনী উপাদান গ্রহণ করেন। স্বাধীনতাকামী সমকালীন জীবনাকাঙ্ক্ষার প্রেক্ষাপটে বাইবেলের মিথিক উপাদান মানুষের চিরায়ত সংবেদনার শিল্পরূপ হয়ে উঠেছে। 'ব্যক্তিগতজীবনের সুদীর্ঘ রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার সঙ্গে অধিত জ্ঞানের সমন্বয় সাধনে সক্ষম হয়েছিলেন তিনি। মার্কসীয় বিশ্বদৃষ্টি ও শ্রেণী সংগ্রামের আবহমান ইতিহাসবোধ তাঁর সৃষ্টিশীল চেতনাকে করেছে নবমাত্রিক ও স্বতন্ত্র। উপন্যাসে বাঙালি জাতির রাজনৈতিক সংগ্রামের গৌরবময় অতীত ও বর্তমানকে তিনি বিশ্বজনীন চেতনা প্রবাহের সঙ্গে সমন্বিত করেছেন। .. .. বর্তমানের জীবনচৈতন্যকে ইতিহাসের আশ্রয়ে রূপদান করার ক্ষেত্রে স্তাঁদাল, স্কট কিংবা বালজাকের যে প্রয়াস, সত্যেন সেন তার-ই বিশ শতকীয় প্রতিনিধি তাঁর জীবনসন্ধানের গতি-প্রকৃতি ইতিহাস-পুরাণের সেই সব উৎসকে কেন্দ্র করে কল্লোলিত যার মধ্যে শিল্পীচৈতন্য মানব-ইতিহাসের দ্বান্দ্বিক ও সংগ্রামশীল ক্রমযাত্রার চিরায়ত স্বরূপ অনুভবে উজ্জ্বল ও প্রাণময়।' [১৭] উপন্যাসের বিষয় নির্বাচন, কাহিনী বিন্যাস, চরিত্র চিত্রণ, ভাষা, জীবনদৃষ্টি ও শিল্পশৈলী সর্ব ক্ষেত্রে সত্যেন সেনের কৃতিত্ব অপরিসীম। বাইবেলের মিথিক কাহিনীকে তিনি প্রায় অবিকৃত রেখেছেন কিন্তু'অভিশপ্ত নগরী' ও 'পাপের সন্তান' কেবল ইতিহাসমাত্র নয়, তা ইতিহাস ও মিথের নব-রূপায়ণ। উপন্যাসের ঘটনাংশ নিম্নরূপ :

যেরেমিয়া নবী, সে বর্তমান যিরুশালেম থেকে যিহোবার আদেশে তাঁর মত প্রচার করছেন। যেরেমিয়ার বিশ্বাস তিনি নিজে কিছুই বলছেন না, পবিত্র যিহোবা তাঁর মুখ থেকে নিজের বক্তব্য প্রকাশ করছেন। তিনি দেখতে পাচ্ছেন যিরুশালেমের রাজা, সামন্ত প্রভুগণ, লোকপ্রধান, মন্দিরের পুরোহিতগণ সমাজের উপর যে-অত্যাচার করছেন, ধর্মের নামে পবিত্র যিহোবার আদেশ লঙ্ঘন করছেন, তাতে কারোই মুক্তি নেই, যিহোবা তাদের ধ্বংস করে দেবেন, পাপীদের শাস্তি প্রদান করবেন। যেরেমিয়া তার ভক্ত রেহুমের বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে এসব বাণী প্রচার করছিলেন, এমন সময় রাজরক্ষিরা তাকে ধরতে এল, লোকপ্রধান অহিকস তাঁকে উদ্ধার করে নিজের বাড়ি এনে স্ত্রী জিল্লার তত্ত্বাবধানে রাখেন। যৌবনে যেরেমিয়াকে ভালোবেসেছিল জিল্লা, যেরেমিয়া বিয়েতে সম্মত হয়নি, নবী হয়ে যিহোবার বাণী প্রচার করতে লাগলেন।

রাজা যিহোয়াকীম ও মন্দিরের পুরোহিত আচার্য পশহূর উভয়ের মধ্যে ক্ষমতা নিয়ে চলছে তীব্র মানসিক দ্বন্দ্ব। কিন্তু তারা উভয়ে চায় যেরোমিয়াকে কারারুদ্ধ করতে। রাজার একান্ত ইচ্ছা যে, গুপ্তচরেরা যেন যেরেমিয়া খুঁজে বের করে আনতে পারে এবং প্রকাশ্যে বিচারের পূর্বে রাজা, যেরিমিয়ার সঙ্গে গোপনে বৈঠক করতে পারে। রাজা কিছুতেই ভেবে পান না যে, নবী যেরেমিয়া কি করে বারবার য়িহুদী জাতির আসন্ন পতনের কথা ঘোষণা করছেন, কেন-ই বলছেন য়িহুদী জাতির প্রতি যিহোবার আর কোনো ভালোবাসা নেই, যিরুশালেম নগরীকে ধ্বংস স্তুপে পরিণত করে ফেলবেন, বাবিলের অপ্রতিরোধ্য সৈন্যরা এসে নগরী দখল করে নেবে।

Dhaka University Institutional Repository

যেরেমিয়ার কাছে শর্তের আর মাত্র দু'দিন বাকী। লোকপ্রধান অহিকম বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে দেখলেন, সাধারণ মানুষ যেরেমিয়ার পক্ষে এবং তার প্রতি আস্থাশীল। রাজার বিরুদ্ধে, পুরোহীত আচার্য পশহুর বিরূদ্ধে সাধারণ মানুষ ক্ষেপে আছে। অন্যদিকে য়ুসুফে নেতৃত্বে ক্রীতদাসরা তাদের মুক্তির দাবিতে সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করে। অহিকমের পুত্র গে মিয়া ক্রীতদাসদের সঙ্গের যোগ দেয়। একসময় যেরেমিয়ার বিরুদ্ধে প্রকাশে বিচার সভা বসে, কিন্তু অহিকমের বাগ্মিতায় ও সময় য়ুসুফের নেতৃত্বে হাজার হাজার ক্রীতদাস ও সাধারণলোক বিচার সভা ঘিরে ফেলে। তারা যেরেমিয়াকে মুক্ত করে তাকে নিয়ে নগরীতে মিছিল করে। এমন সময় শিঙার আওয়াজ ও হুঁশিয়ারী বাঁশী বেজে ওঠে। অর্থাৎ বাবিল রাজ্যের ক্যালদীয় সেনারা নগরী দখল করে। যিরুশালেম অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে । ক্যলদীয় সৈন্যদের হাত থেকে বাঁচার জন্য মন্দিরে পূজা,পশু বলি দিয়েও কেউ রক্ষা পায় না। ক্যালদীয় সৈন্যরা নগরীতে ঢুকে নানা সম্পদ লুটপাট করে এবং রাজা যিহোয়াকীমকে বন্দী করে, তার পুত্র যিহোয়াকীমকে রাজপদে অধিষ্ঠিত করে যায়।

'স্বর্ণময়ী সুন্দরী যিরুশালেমকে একবার ধর্ষণ করেই বাবিলরাজ নেবুকাডনাজারের স্বর্ণ-কামনার পরিতৃপ্তি হয়নি।'[১৮]

কিছুদিন পর আবার যিরুশালেন নগরী বাবিলরাজের হাতে আক্রান্ত হয়। সৈন্যদের হাতে বিধ্বস্ত হয়ে নগরীর রাজা যিহোয়াকীমকে, তার মা নেহুশতা, এবং স্ত্রীদের বন্দী করে বাবিলে নিয়ে যায়। বাবিলরাজ যিরুশালের উপর অধিক কর আরোপ করে। রাজা যেদেকিয়া, মন্দিরের পুরোহিত, গোপনে মিশরের রাজার কাছে সাহায্য চেয়ে দূত পাঠায়। এদিকে নবী যেরেমিয়া তার ভবিষ্যত বাণী প্রচার করতে থাকেন, বাবিলে নির্বাসিতদের কাছেও চিঠি যায়। রাজা যেদেকিয়ার দুর্বলতার সুযোগে নগরীতে নতুন নবীর অবির্ভাব ঘটে। তার নাম হানানিয়া। রাজার আদেশে অহিকম ও নবী যেরেমিয়া কারারুদ্ধ হলে ক্রীতদাস এবেদমালেকের প্রচেষ্টায় তাঁরা প্রাণে বাঁচেন। ক্যালদীয় সৈন্যদের আক্রমণে নগরী ধ্বংস হলে যেরেমিয়া বেরিয়ে আসেন কিন্তু নগরীর বিধ্বস্ত রূপ যেন সে মেনে নিতে পারে না। যদিও এতদিন সে এ ধ্বংসের সর্তকবানী প্রচার করেছে। নেবুকাডনাজার তাকে পুরস্কার দিতে চাইলে, সে প্রত্যাখ্যান করে। নবী যারেমিয়া বুঝতে পারেন, তার সান্নিধ্যই যেন অভিশাপ, তাই স্বামী-পুত্রহারা জিল্লা থেকে সে দূরে চলে যেতে চায়। জিল্লা এবং যেরেমিয়ার সংলাপে উপন্যাসের শেষ হয় :

: কে, কে তোমার সেই একান্ত প্রিয়জন যেরেমিয়া ?

: তুমি কি তা জানো না ?

: হয়তো জানি, হয়তো জানি না। আমি তোমার মুখ থেকেই সে কথা শুনতে চাই।

: তুমি আমাকে এমন করে প্রলুব্ধ করো না। আমি যাই, জিল্লা যাই।

: যেরেমিয়া, শোনো, আমার কথা শোনো

: না না না ।[১৯]

বাইবেলের 'বুক অব দ্য প্রোফেট: যেরেমিয়া খন্ড' বেশ জটিল। এখানে বর্ণিত হয়েছে য়িহুদী জাতির পতনের কাহিনী। কিন্তু ঔপন্যাসিক সত্যেন সেন বাইবেলের এই জটিল মিথ কাহিনীকে খুব সহজ করে উপস্থাপন করেছেন এবং য়িহুদী জাতির তৎকালী সমাজব্যবস্থা ধর্ম বিশ্বাস, রাজতন্ত্র ও পুরোহিতের ক্ষমতার দ্বন্দ্ব, সংস্কার, বাবিলের

Dhaka University Institutional Repository

ক্যালদীয় সৈন্যদের হাতে যিরুশালেমের ধ্বংসম্ভব কিছু। সমকালীন যিরুশালেনের ধর্ম ও নীতিহীনতাকেই নবী যেরেমিয়া অভিশাপ দিতে বাধ্য হয়েছিল। কিন্তু উপন্যাসের শেষে দেখা যায়, নগরীরর ধ্বংস স্তুপ দেখে যেরেমিয়া নিজেই মেনে নিতে পারেনা, সে দুঃখে আকুল হয়েছে। নিজের অভিশাপের সত্য নগ্নরূপ দেখে নিজেই দুঃখিত হয়। যেরেমিয়া শুধু এ উপন্যাসে যিরুশালেমের ভবিষ্যৎ বক্তা নয়, তাকে যৌবনের প্রারম্ভে একজন প্রেমিক পুরুষ হিসেবেও দেখা যায়। 'নবী যেরেমিয়ার ঐতিহাসিক কাল খ্রিষ্টপূর্ব ৬২৬-৫৮৬। আর নেবুকাডনাজারের হাতে জেরুজালেমের পতন ঘটে ৫৮৬ খ্রিষ্ট পূর্বাব্দে। .. .. এ উপন্যাসের নায়ককল্প পুরুষ যেরেমিয়া সমষ্টি অস্তিত্বের আকাঙক্ষার রূপকার। তার মধ্য দিয়েই ধ্বনিত-প্রতধ্বিনিত হয়েছে শোষণ-বঞ্চনা-নিপীড়ন ও দাসত্বের বিরুদ্ধে মানবীয় প্রতিবাদ। .. .. মার্কসীয় বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদে বিশ্বাসী কোনো শিল্পীর চৈতন্যে অলৌকিক পুরুষ চরিত্রের স্বাকৃতির পেছনে মিথভাবনার আধুনিকায়নের প্রসঙ্গ গুরত্বপূর্ণ। ধর্ম , সমাজ ও সভ্যতার ক্রমবিবর্তনের ধারায় এ জাতীয় অসংখ্য প্রত্যাদেশপ্রাপ্ত পুরুষের উপস্থিতি দেখা যায়। যাঁরা নিজ নিজ আধ্যাত্মিক ক্ষমতায় সমগ্র জনগোষ্ঠীয় নায়ক পুরুষে পরিণত হয়েছেন।.. .. যেরেমিয়ার মধ্যে ঔপন্যাসিক মিথিক শক্তির এই ইতিবাচক তাৎপর্যকেই সন্ধান করেছেন।'[২০] নবী যেরেমিয়া ছাড়াও এউপন্যাসে অহিকম, জিল্লা, গেদেমিয়া নবী হানানিয়া, ক্রীতদাস য়ুসফ চরিত্র চমৎকারভাবে অঙ্কিত হয়েছে। অহিকম যিরুশালেমের ঘটনাস্রোতে জড়িয়ে যায় যেমন, তেমনি তার পুত্র গেদেমিয়াও ক্রীতদাসদের সংগ্রে সংগ্রামে অংশ নেয়। গেদেমিয়ার শ্রেণীহীন সমাজচেতানর পেছনো সত্যেন সেনের মার্কসীয় দৃষ্টি কাজ করেছে। যদিও ক্রীতদাসী সারার সঙ্গে প্রেমই তার এই উত্তরণের পেছনে সক্রিয়ছিল, তবু একথা অনস্বীকার্য যে, সমাজ বিবর্তন ধারায় গেদেমিয়ার চরিত্রটি প্রগতিশীল চিন্তাকে ব্যক্ত করেছে। তাই বলা যায়, 'অভিশপ্ত নগরী' কেবল য়েরুজালেম নগরী ধ্বংস বা ইহুদীজাতির পতনের কাহিনীমাত্র নয়, সমাজ পরিবর্তনে প্রগতিশীল চেতনারও অনতিক্রান্ত শব্দরূপ।

২.

'অভিশপ্ত নগরী' উপন্যাসের কাহিনী বিন্যাস, পটভূমি ও জীবনবেদের সঙ্গে বাংলাদেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসের মিল আবিষ্কার কোনো কাকতালীয় ব্যাপার নয়, প্রায় সামান্তরাল। আত্মদ্বন্দ্বে পরাজিত, নৈতিক দিক থেকে অধঃপতিত, চরিত্রহীন বাঙালি জাতির সঙ্গে জেরুজালেম খ্রিষ্ট-পূর্ব ইহুদী জাতির মিল খুবই নিকটবর্তী। রাজশক্তি ও পুরোহিততন্ত্র ক্ষমতার দ্বন্দ্বে লিপ্ত, ধর্মহীন, নীতিহীন, অত্যাচার, অনাচারে বিপর্যস্ত নবী যেরেমিয়া যখন যিহোবার প্রত্যাদেশ প্রচার করে তখন উভয় শক্তিই তাকে প্রতিপক্ষ মনে করে। রাজা এবং পুরোহিত যেরেমিয়ার সাবধানবাণী অনুধবানে ব্যর্থ হয়, তার বিচার সভার আয়োজন করে। কিন্তু সাধারণ মানুষ যেরেমিয়ায় মুক্তি দাবি নিয়ে বাইরে জড়ো হয়, অধ্যক্ষগণ যেরেমিয়াকে মুক্তি দেওয়াই সঙ্গত মনে করে এবং জনতা তাকে নিয়ে আনন্দ প্রকাশে উদ্যোগী হয়। তখনই জনতার উল্লাসধ্বনি স্তব্ধ হয়ে যায়। বাবিলের ক্যালদায় সৈন্যরা জেরুজালেম আক্রমণ করে। অবরুদ্ধ ও লুণ্ঠিত হয় নগরী :

> 'শুধু কি তাই ? রাজা যিহোইয়াকীন, তাঁর মা বেহুশতা, তাঁর পত্নীগণ, কুলপতিগণ আর নগরের যোদ্ধাগণকে বন্দী করে বাবিলে পাঠানো হোল।.. .. অভিজাত পরিবারের বাছা বাছা সুন্দরী মেয়েদের সঙ্গে করে নিয়ে গেল ওরা। যে মেয়েরা কখনও পায়ে হেঁটে পথ চলেনি তাদের অনাবৃত সুকোমল মুখমন্ডল প্রখর সূর্যের তাপে ফুলের মতই শুকিয়ে উঠল। ভয়ার্ত হারিনীর মতই ওরা কাঁপছিল আর ব্যাকুল চোখে চারিদকে চাইছিল।' [২১]

Dhaka University Institutional Repository

বিপুল ধন-সম্পদে সমৃদ্ধ বাঙলা এভাবে বহিঃশক্তির আক্রমণের শিকার হয়েছে বারবার। লুণ্ঠিত হয়েছে এদেশের সম্পদ, ধর্ষিতা হয়েছে বাঙলার কুলবধূ,যুবতী। মিথকথার সঙ্গে সমকালীন সমাজ ভাবনা ও জীবনচেতনাকে সম্পৃক্ত করে সত্যেন সেন আবিষ্কার করতে চেয়েছিন জাতিসত্তার নতুন সম্ভাবনা। অহিকমের পুত্র গেদেমিয়ার ক্রীতদাস আন্দোলনে যোগদানের মধ্য দিয়ে উপন্যাসের মৌল সত্য ও জীবনার্থ স্পষ্ট জিল্লাহ উদ্দেশ্যে প্রেরিত পত্রে গেদেমিয়া বলেছে-'আমি আমাদের এই ভাংগাচোরা, জীর্ণ আর রক্তমাখা সমাজে বসে আর একটি অপরূপ সুন্দর সমাজের স্বপ্ন দেখি,যে-স্বপ্ন একদিন সত্য হয়ে উঠবে।[২২] সত্যেন সেন মূলত মার্কসীয় দর্শন ও শ্রেণীহীন জীবনচেতনার স্বপ্নময় ভবিষ্যতের বিশ্বাসী ছিলেন। তাই তাঁর উপন্যাসের মিথিক সম্ভবনা মধ্যের সেই জীবনচেতনাই শিল্পিত হয়েছে।

৩.

'অভিশপ্ত নগরী' উপন্যাসের ভাষার ধ্রুপদী বিন্যাস লক্ষণীয়। বাইবেলের মত একটি ক্লাসিক গ্রন্থ থেকে ঔপন্যাসিক বিষয় ও উপাদান গ্রহণ করেছেন। ফলত উপন্যাসের গদ্যভঙ্গি ও ভাষাশৈলী নিরতিশয়, বক্তব্যে অনুগামী :

> 'বাবিলসেনাপতি, আপনাদের নিষ্ঠুরতার তুলনা নেই। পৃথিবীর সমস্ত জাতির বিস্ময় ও আতঙ্কে স্তম্ভিত হয়ে আপনাদের এই বিভীষিকাময়ী রক্তাক্ত মূর্তির দিকে তাকিয়ে আছে। আপনারা যিরুশালেমের বুকের মণি আমাদের প্রভুর মন্দিরকে ভস্মসাৎ করেছেন, তার প্রাচীরকে ধ্বংস করে দিয়ে নগরীকে শূন্যতায় নিক্ষেপ করেছেন, নির্দোষ ও অসহায় নাগরকিদের হত্যা করে আপনাদের রক্ত পিপাসা চরিতার্থ করেছেন, আর যারা বেঁচে আছে সেই হতভাগ্যদের তাদেরমাতৃভূমির বুক থেকে উচ্ছন্ন করে পশুর মত দলে দলে বেঁধে নিয়ে গেছে। আর আপনাদের মহামহিম বাবলি রাজ নেবুকাডনাজ্জারের নিজের দর্শন সুখের জন্য হতভাগ্য রাজা যেদেকিয়ার দুই চক্ষু উৎপাটিত করেছেন।[২৩]

উদ্ধৃতাংশে বাক্য জটিলতামুক্ত কিন্তু গুরুগম্ভীর,শব্দ ও ক্রিয়াপদে সাধুভঙ্গির কারণে ভাষায় ওজস্বিতা এসেছে। যেমন- বিস্ময়(অবাক) স্তম্ভিত (থেমে যাওয়া) পিপাসা (তৃষ্ণা) চরিতার্থ (কৃতকার্য হওয়া) উচ্ছন্ন (উন্মূলিত হওয়া) ইত্যাদি শব্দ। শব্দ ব্যবহারে এই সচেতনাতা সত্যেন সেনকে ধ্রুপদী শিল্পীর মর্যাদায় অভিসিক্ত করেছে। বিষয় বস্তুর ক্লাসিক আবহ রক্ষা করার জন্য তিনি উপন্যাসে ভাষাশৈলীতে সৃষ্টি করেছেন মহাকাব্যিক ব্যঞ্জনা :

> এক. চাষীর হাতে ধারালো কাস্তে যেমন করে ফসল কেটে চলে, ওদের হাতের তরোয়ালও তেমনিভাবে যে পথ দিয়ে যাবে সব সাফ করে দিয়ে যাবে।[২৪]
>
> দুই. উৎসুক দৃষ্টিতে সবাই মিশরের দিকে তাকিয়ে আছে, যেমন করে ব্যাকুল কৃষক উধ্বমুখী হয়ে তাকিয়ে থাকে বর্ষণহীন মেঘের দিকে। [২৫]

উপমার এই সারল্য এবং প্রসারতা ক্লাসিক ভাষাশৈলী বৈশিষ্ট্য।

Dhaka University Institutional Repository

পাপের সন্তান

সত্যেন সেন (১৯০৭-১৯৮১) বাংলাদেশের উপন্যাসসাহিত্যে আবির্ভূত হন ব্যক্তিগত জীবনের সুদীর্ঘ রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা নিয়ে, বয়সের তুলনায় অনেক দেরিতেই তিনি উপন্যাস রচনা শুরু করেন। তাঁর উপন্যাস সচেতন প্রজ্ঞার ফসল। সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাস, মানবিকবোধ, তীক্ষ্ণজীবন চেতনা তাঁর উপন্যাসের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। মানব সভ্যতার ইতিহাসের দিকে তাকিয়ে ছিলেন তিনি একজন সমাজ বিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে। ওল্ড টেস্টামেন্ট-এর 'বুক অব দ্য প্রফেট : যেরেমিয়া খন্ড'-এর উপাদান নিয়ে তিনি রচনা করেন দুটি উচ্চাকাঙ্ক্ষী উপন্যাস 'অভিশপ্ত নগরী' (১৯৬৭) এবং 'পাপের সন্তান' (১৯৬৯)। দু'টি উপন্যাসের পটভূমি জেরুশালেম এবং বাইবেলে বর্ণিত মিথ কাহিনীকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠলেও দু'টি উপন্যাসেই মূলত একটি দেশ, একটি জাতির উত্থান -পতনের ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে। পাপের সন্তান'-কে বলা যায়। অভিশপ্ত নগরীর' দ্বিতীয় খণ্ড। দু'টি উপন্যাসের ঘটনাকালের ব্যবধান অর্ধশতাব্দীর একটু বেশি।[২৬] 'অভিশপ্ত নগরী'র ভাববস্তু, জীবনকল্পনা ও চরিত্রভাবনা 'পাপের সন্তান' উপন্যাসে পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। সময়প্রবাহ, ঘটনাপ্রবাহ ও চরিত্র প্রবাহের ধারাবাহিকতা দু'টি উপন্যাসকে গ্রথিত করেছে অভিন্ন সূত্রে।'[২৭] 'অভিশপ্ত নগরী'-তে সমষ্টিচেতনার গুরুত্ব ও ঐশীবিধানের অনিবার্যতা ধ্বনিত হলেও 'পাপের সন্তান' উপন্যাসে বর্ণিত হয়েছে ব্যক্তির মানবীয় চেতনার উত্তরণ।

২.

'পাপের সন্তান' উপন্যাসের প্লটগঠন, চরিত্রচিত্রণ, ঘটনাবিন্যাস, ভাষাশৈলী বাইবেলীয় ক্লাসিক দৃষ্টিতে বিন্যস্ত :

The "Plot" of the Bible might be visualized as not merely a horizontal line from the beginning to the end of historical time, but also, just above such a time, a grodually rising one leading in time from mankind's expulsion form the earthly paradise to his reunion with God in the celestial one.[২৮]

'পাপের সন্তান'-এর পটভূমি, কাহিনী ও চরিত্র জেরুশালেম থেকে শুরু হয়ে মিশরের নীলনদ পর্যন্ত প্রসারিত হওয়ায় প্লটবিন্যাস অনেকাংশে আনুভূমিক। সমাজ দ্বন্দ্ব তথা শ্রেণী সংঘাত, ধর্মীয় বিধানের সঙ্গে মানবীয় আবেগের সংঘাত 'পাপের সন্তান' উপন্যাসে ঘটনাংশে সমান্তরালভাবে বিস্তৃত। মিকা এবং শদরার জীবন যেন নিয়তি নির্ধারিত,তাদের জীবনে একই সঙ্গে উপস্থিত হয় সমাজদ্বন্দ্ব। ধর্মাদেশের সঙ্গে মানবীয় আবেগের বিরোধ তাদের জীবনকে করে তোলে ট্রাজেডীময়। যদিও পরিণামে স্ব-ভূমি ছেড়ে দূরে যেতে হয় এবং মানবীয় চেতনায় তাদের আত্মমীমাংসা ঘটে। অর্থাৎ ঔপন্যাসিক ধর্মনিরপেক্ষ এক মানবিক বোধের উজ্জীবন ঘটিয়ে উপন্যাসের রসনিষ্পত্তি সাধন করেন।

বাবিলরাজ নেবুকাডনাজারের ক্যালদীয় সৈন্যদের আক্রমণে যিরুশালেম ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয় এবং যিরুশালেম অধিবাসী যিহুদীদের অনেককে হাতে পায়ে বেড়ি দিয়ে নিয়ে যায় দাস হিসেবে। এই য়িহুদী দাসদের কোনো সামাজিক মর্যাদা ছিলনা এবং তাদের উপর চালাতো অমানবিক নির্যাতন। এমনকি য়িহুদী মেয়েদের উপর চালাতো জোরপূর্বক বলাৎকার। অত্যাচারিত য়িহুদীরা এই নিপীড়ন থেকে বাঁচার জন্য নানা প্রকারে সাহায্যের আবেদন করতো —

Dhaka University Institutional Repository

পার স্যরাজার কাছে। প্রায় অর্ধশতাব্দীর পর পারসিকদের আক্রমণে মহাপারাক্রমশীল বাবিল সাম্রাজ্যের পতন ঘটে এবং বাবিল সাম্রাজ্যভুক্ত এলাকা পারস্য সাম্রাজ্যের অধিভুক্ত হয়। পারস্য রাজের য়িহুদী পানপাত্রবাহক নেহেমিয়া যেরুশালেমের তীরশথ বা শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। নেহেমিয়া এবং পারস্য রাজকর্মচারীদের নেতৃত্বে প্রতিবেশী জাতির প্রবল বাধা অতিক্রম করে গড়ে তোলে যিরুশালেম। 'ইহুদী জনসাধারণের প্রাণপাত প্রচেষ্টার ফলে নতুন যিরুশালেম গড়ে উঠল বটে, কিন্তু ধর্মোন্মাদ ইহুদী সমাজপতিদের ধর্মের গোঁড়ামি, কঠিন রক্ষণশীল মনোভাব ও তীব্র পরজাতিবিদ্বেষ সমাজকে এক আত্মধ্বংসী আবর্তের দিকে ঠেলে নিয়ে চলল। শাস্ত্রীয় বিধান মানবিকতাকে গ্রাস করে চলল- ধর্মীয় অন্ধতার বেদী মূলে নিষ্পাপ নিষ্কলঙ্ক 'পাপের সন্তানদের' বলি হতে লাগল। দুর্ভাগা ইহুদী সমাজকে এজন্য ভবিষ্যতে বড় কঠিন মূল্য দিতে হয়েছিল-ইতিহাস তার সাক্ষী।'[২৯] নারগেল শারেজের যুবক মিকা, ছোটবেলা থেকেই সে বাবিলদের মতো লেখাপড়ায়, পোষাকে, সামাজিক মর্যাদায় বড় হয়েছে। দীর্ঘদিন বাবিলের পরিবেশে থেকে লেখা পড়া শিখে মানুষ হয় এবং গৃহস্বামীর মেয়ে শদরাকে ভালোবাসে, শদরাও প্রাণের আবেগে মিকার দিকে এগিয়ে আসে।

একটি য়িহুদী মেয়েকে একয়েকটি বাবিল যুবক ধর্ষণ করলে মিকা তার প্রতিবাদ করে, কিন্তু এজন্য সে ঐ যুবকদের হাতে লাঞ্ছিত হয়। মেয়েটির বাবাকে মিকা নিজের সত্য পরিচয় দেয়- সে আসলে একজন দাসপুত্র। মিকার মুখে বাবিলদের ভাষা, পোষাক থাকার কারণে মেয়েটির বৃদ্ধবাবা তাকে ভৎর্সনা করে, তখন মিকার মধ্যে স্বাজাত্যবোধ ও আত্মপরিচয়ের চেতনা উদ্দীপ্ত হয়। মিকা, য়িহুদী জাতির সেবা করাকে নিজের পবিত্রতম কর্তব্য মনে করে এবং সিদ্ধান্ত নেয় য়িরুশালের ফিরে যাওয়ার। মিকা যিরুশালেম যেতে চাইলে প্রেমিকা শদরা তাকে একা যেতে দিতে চায় না, নিজেও ছদ্মবেশে মিকার সঙ্গী হয়। পথে মাঠের মধ্যে আকস্মিকভাবে শাসনকর্তা নেহেমিয়ার সঙ্গের মিকা-শদরা পরিচয় ঘটে। যিরুশালেম পৌছে মিকার স্বপ্নভঙ্গ হয়, এতদিন মিকা মনে মনে যিরুশালেমের যে ছবি কল্পনা করেছে বাস্তবে প্রবেশ করে সে হতাশ হয়। শদরাও বুঝতে পারে ক্যালদীয় বলে য়িহুদীদের মধ্যে তার স্থান নেই। বিভিন্ন স্থান থেকে ফিরে আসা গরীব উদ্বাস্তু য়িহুদীরা দরিদ্র পল্লীতে স্থান নিয়েছে, নেহেমিয়ার আদেশ অনুসারে মিকা এই পল্লীতেই সাধারণ য়িহুদীদের প্রাচীর নির্মাণের জন্য একত্রিত করে। প্রাচীর নির্মাণে অভিজাত য়িহুদীদের বাধা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত নানা প্রতিকূলতা অতিক্রম করে প্রাচীর তৈরী শেষ হয়। বাবিল থেকে আসা য়িহুদীদের প্রথম দলের ধর্মীয় প্রধান আচার্য ইস্রা। আচার্য ইস্রা ধর্মীয় দৃষ্টি দিয়ে য়িরুশালেমকে গড়ে তুলতে চান, তাকে সাধারণ য়িহুদীরা সর্বোতভাবে সমর্থন জানায়। আচার্য ইস্রা যিহোবার নামে য়িহুদী সমাজকে রক্তের বিশুদ্ধতা রক্ষা করতে আদেশ প্রচার করেন যে, যে-সব য়িহুদীদের ঘরে ভিন্ন জাতীয় মেয়েরা বধূ হয়ে আছে, তাদেরকে গর্ভজাত সন্তানসহ পরিত্যাগ করতে হবে। নেহেমিয়ার দক্ষিণ হস্ত মিকার বন্ধু হানানি এর প্রতিবাদ করে সভার মধ্যে নিজের স্ত্রীর পরিচয় তুলে ধরে। যিহোবার নামে প্রচারিত আচার্য ইস্রার আদেশে মানবিকতা পদদলিত হয়, অসংখ্য য়িহুদী পরিবারে শোকের ছায়া নামে। মিকা যিহোবার পূজারী হয়েও আদেশ মেনে নিতে পারে না। ধর্মের নামে আচার্য ইস্রার আদেশে য়িহুদীদের সংহতি নষ্ট হয়ে যায়, চারপাশের অন্য ধর্মাবলম্বি জাতিগুলিরও শত্রু হয়ে পড়ে য়িহুদীরা। শদরা জল আনতে গিয়ে অন্যদের হাতে অপমাণিত হয়, হানানির ছেলেমেয়েদের পাড়ার ছেলেরা ঢিলছুঁড়ে মারে 'পাপের সন্তান' বলে গালি দেয়। নেহেমিয়া বুঝতে পারে আচার্য ইস্রার মাধ্যমে অর্মনীয় দাস টোবিয়ার চক্রান্ত সফল হতে চলছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা তার হাতের বাইরের চলে গেছে। মিকার মনে বারবার প্রশ্ন জাগে, এই যিরুশালেমের স্বপ্নে বিভোর

Dhaka University Institutional Repository

হয়েই কি সে বাবিল ছেড়ে এসেছে ? এর মধ্যে নারগেল শারেজের খোলা চিঠি আচার্য ইস্রার কাছে আসে। যাতে লেখা আছে - মিকা নারগেল দাসীর পুত্র অর্থাৎ মিকা ও শদরা একই পিতার সন্তান। নেহেমিয়া, মিকাকে জানিয়ে দেয়, রাতের মধ্যে যিরুশালেম থেকে পালিয়ে যেতে, নইলে আচার্য ইস্রা তাদের প্রাণদণ্ড দেবে। মিকা ও শদরা পালায় না। পরদিন বিচার সভায় নেহেমিয়ার সাহয্যে প্রাণদন্ড থেকে তারা রক্ষা পেলেও তাদের যিরুশালেম থাকার অধিকার কেড়ে নেয়া হয়। নেহেমিয়া ও হানানি তাদেরকে যিরুশালেমের শেষ সীমানা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে যায়। মিকা ও শদরা এসময় মিশরের নীলনদের তীরে এসে উপনীত হয়। তাদের দুজনের মনেও নানা প্রশ্ন, দ্বিধা, দ্বন্দ্ব। তারা দুজনই একই পিতার ঔরশজাত সন্তান, কিন্তু তারা প্রেমের এক মানবীয় বন্ধনে আবদ্ধ। শাদরা গর্ভেই রয়েছে মিকার অনাগত সন্তান, তাদের ভালোবাসার ফসল। পিতা নারগেল শারেজের দেয়া নতুন পরিচয় এবং তাদের এই সম্পর্ককে সে মেনে নিতে পারেনা। আত্মজিজ্ঞাসা তাকে আত্মমীমাংসার পথে নিয়ে যায় :

> 'আমার মন সুস্থ হয়ে উঠল, সাহসী হয়ে উঠল। ভাবলাম, নিস্পাপ আমরা, নিষ্কলঙ্ক আমরা, আমরা কেন ওদের কাছে মাথা নীচু করে থাকবো ? কে, কবে, তার অসংযত প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার ফলে এক সন্তানের জন্ম দিয়েছিলে- তার দায়-দায়িত্ব কি আমাদের বয়ে নিয়ে চলতে হবে ? বাইরের লোকের কাছে যাই হই না কেন, আজ আমার নিজের মনের কোনই গ্লানি নেই।'[৩৩]

মিকা ও শদরার এই আত্মমীমাংসার মধ্য দিয়ে উপন্যাসের পরিসমাপ্তি ঘটে এবং তারা ধর্মবিশ্বাসের সংকীর্ণতা থেকে মুক্তিলাভ করে প্রেম ও মানবীয় চেতনায় উজ্জীবিত হয় তারা।

'পাপের সন্তান' উপন্যাসের চরিত্র চিত্রণে ঔপন্যাসিকের দৃষ্টিকোণ, জীবনবোধ, সময় ও সভ্যতার বিবর্তনশীল চেতনা, মানবীয় অস্তিত্বসংগ্রামে বহুমাত্রিক জিজ্ঞাসা নবতর তাৎপর্যে অভিষিক্ত। মিথের উপাদানে সঞ্চিত জীবনসংবেদকে বিশ্বমানবিকতা বোধে দীপান্বিত করেছেন ঔপন্যাসিক বস্তুবাদী দর্শনের আলোকে। বাবিলরাজ নেবুকাডনাজার কেবল যিরুশালেমকে ধ্বংসস্তুপেই পরিণত করেনি, নগরীর য়িহুদীদের বাবিলে নির্বাসিত করে দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করেন। নির্বাসিত য়িহুদীদের সঙ্গে ক্যালদীয়দের রক্ত সম্পর্কর গড়ে ওঠে। 'পাপের সন্তান' উপন্যাসের নয়ক-চরিত্র মিকা বাবিলের জন্মজাত য়িহুদীর একজন। ক্রীতদাস হলেও সে অন্যান্য ক্রীতদাসের মত গ্লানিময় জীবন থেকে মুক্ত। প্রভু নারগেল সারজের স্নেহের আশ্রয়ে এবং প্রভুর কন্যা শদবার প্রণয় স্পর্শ তার দাসজীবনকে করেছে আনন্দময়। একটি য়িহুদী ধর্ষনের ঘটনায় প্রতিবাদ করতে গিয়ে তার জীবন অন্যরকম হয়ে যায়। স্বজাত্যবোধ ও আত্মপরিচয়ে উজ্জীবীত মিকা উপলব্ধি করে- 'আমার জীবনের সবচেয়ে বড় কথা এই যে, আমি একজন য়িহুদী, এই বোধ-চেতনা থেকেই সে মূল্যবান পোষাক, স্বাচ্ছান্দ্যের জীবন তুচ্ছ করে বাবিল ত্যাগের সিদ্ধান্ত নেয়। যিরুশালেম যাত্রাকালে প্রেমিকা শদরাও তার সঙ্গী হয় কিন্তু যিরুশালেম এসে তার স্বপ্নভগ্ন হয়। যিরুশালেম এসে মিকা গরীব য়িহুদীদের দুঃখ লাঘবে প্রাচীর নির্মাণে সচেষ্ট হয়। স্বাজাত্য বোধ-চেতনা মিকার মধ্যে ক্রমশ জেগে ওঠে নিজের শ্রেণী ভাবনা ও শ্রেণী সংগ্রামের আদর্শ। নিজের জন্ম পরিচয় উদ্‌ঘাটিত হওয়ার পর বিচার সভার সামনে দাঁড়িয়ে নিশ্চিত মৃত্যুদন্ডের কথা জেনেও মিকা যিরুশালেম ছেড়ে পালাতে চায়নি। যিরুশালেম ও য়িহুদী সমাজ নিয়ে তার মনে ছিলো স্বপ্ন। নারগেল সারেজরে চিঠি পাওয়ার পর তার আত্মদ্বন্দ্ব ও সমাজদ্বন্দ্বময় জীবনের সংগ্রাম আরও তীব্রতর হয়। যদিও

Dhaka University Institutional Repository

ধর্মের অমোঘ বিধান ও আত্মপরিচয়ের গ্লাণিকর পরিস্থিতি তাকে যিরুশালেম ত্যাগ করতে বাধ্য করে শেষ পর্যন্ত। মিকা চরিত্রটি কর্মে উদ্দীপনায়, সংযমের প্রতিশ্রুতিতে, মানবতা ও ভালোবাসায় যেমন উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, তেমনি ধর্মীয় বিধানের বিরুদ্ধে মানসিক দ্বন্দ্ব, শ্রেণীদ্বন্দ্ব, সর্বোপরি পিতৃপরিচয়ের আত্মদ্বন্দ্বে এ চরিত্রটি বহুমাত্রিকতা লাভ করেছে।

মিকা চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ও পটভূমির সঙ্গে বিভাগ (১৯৪৭) উত্তর বাঙালি মুসলামানের আইডেনটিটি ক্রাইসিসের একটি মিল খুঁজে পাওয়া যায়। ১৯৪০ সালে লাহোর প্রস্তাবের পর বাঙালি মুসলমান পাকিস্তান আন্দোলনে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল এই জন্য যে, দেশ বিভাগের পর সংখ্যা গরিষ্ট মুসলামানদের নিয়ে পাকিস্তান গঠিত হলে তাদের স্বপ্ন পুরণ হবে। কিন্তু বিভাগোত্তর কালে রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নে তাদের মধ্যে আত্মপরিচয়ের সংকট সৃষ্টি হয়। বায়ান্ন ভাষা আন্দোলনের রক্তাক্ত অভিজ্ঞতার মধ্যদিয়ে তারা উপলব্ধি করে যে, তারা শুধু মুসলমান নয় একই সঙ্গে বাঙালিও এবং ধর্মনিরপেক্ষ চেতনা তাদের মধ্যে নতুনভাবে মূল্য পেতে থাকে। 'পাপের সন্তান' উপন্যাসের মিকা চরিত্রের সঙ্গে সমকালীন বাঙালির আত্মপরিচয় সংকট, শ্রেণীদ্বন্দ্ব ও রাজনৈতিক সচেতনতাকে সমন্বিত করার মধ্যে ঔপন্যাসিক সত্যেন সেনের প্রজ্ঞাময় পরিচয় স্পষ্ট হয়।

শদরা চরিত্রটি উপন্যাসের বড় অংশজুড়ে থাকলেও মিকার মতো ততো বৈশিষ্ট্যপূর্ণ নয়। তার সংগ্রাম মূলত প্রেম ও মানবিকতার সংগ্রাম। সুদূর অতীতকাল থেকে যেসব নারী ভালোবাসার পথে, সুখ-ঐশ্বর্যকে ত্যাগ করে প্রেমাস্পদের হাত ধরে পথে নেমেছে, শদরা সেই নারীদেরই প্রতিমূর্তি। বাবিলে পিতার গৃহে অবস্থানকালে শদরা ছিল সাধারণ নারী, প্রেমের কারণে, বাবিল শহর ও ঐশ্বর্যশালী পিতার আশ্রয় ত্যাগ করে প্রেমিক মিকার সঙ্গের যিরুশালেমের মন্দিরে, য়িহুদী বেষ্টিত সমাজে, প্রাচীর গড়ার কাজে অংগ্রহণে তার উপস্থিতি আমরা কেবল প্রেমিক শদরাকেই দেখি না, আত্মর্যাদাসম্পন্ন, স্থির সংকল্পময়ী এক প্রতিমূর্তি হিসেবেও আমরা তাকে দেখি। শদরার মত একটি প্রেমময়ী নারী পাশে ছিলো বলেই মিকার সংগ্রাম মানবীয় চেতনায় উন্নীত হয়েছে।

উপন্যাসে অন্য যে চরিত্রগুলো গুরুত্বপূর্ণ তাদের মধ্যে তীরশথ বা শাসনকর্তা নেহেমিয়ার চরিত্র উজ্জ্বল। একজন পানপাত্রবাহক থেকে সে একটা জাতির নেতায় পরিণত হয়েছে এবং জাতি গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। যিরুশালেম শাসন করতে গিয়ে সে বার বার আর্মেনীয় ক্রীতদাস টোবিয়াদের ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছে। কিন্তু নেহেমিয়া পেয়েছেন হানানির মত বিশ্বস্ত বন্ধুকে, মিকার মত একজন সংগ্রামী যুবককে, যারা তাকে শুধু প্রাচীর নির্মাণ নয়, সব বিষয়ে সাহায্য করেছে। চিরকুমার নেহেমিয়া শদরার প্রতি আকর্ষণ অনুভব করলেও সে আকর্ষণের জন্য যিহোবার কাছে ক্ষমা প্রার্থণা করেছেন, অনুশোচনায় নিজেকে দগ্ধ করেছেন। উপন্যাসের শেষের দিকে নেহেমিয়াকে মিকা এবং শদরার শুভাকাঙ্ক্ষী হিসেবে দেখা যায়। নেহেমিয়া তাদেরকে যিরুশালেম সীমান্তপর্যন্ত এগিয়ে দিতে আসে। সবমিলিয়ে লেখক নেহেমিয়া চারিত্রটিকে ইতিহাসে বর্ণিত চরিত্রের অনুরূপ করে সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছেন। উপন্যাসের কাহিনী পরিকল্পনায় ও ঘটনা বিন্যাসে মিকার চরিত্র প্রাধান্য পেলেও অন্যান্য চরিত্রের মধ্যে হানানি, আচার্য ইস্র, নহিমা, সানবল্লট, আর্মেনীয় দাস টোবিয়া, গেশেম, প্রমুখ স্ব-স্ব অবস্থানে অনিবার্য ভূমিকা পালন করেছে।

Dhaka University Institutional Repository

৩.

মিথ-ইতিহাসের অন্তঃসূত্রে গ্রথিত মিকা এবং শদরার জীবনপরিক্রমায় উপস্থাপিত হলেও 'পাপের সন্তান' উপন্যাসের ভাষা ক্লাসিক অর‍্যাকলধর্মী গদ্যশৈলীতে বিন্যাস্ত :

> 'আমরা যিহোবার দাস মোশি কর্তৃক প্রদত্ত যিহোবার ব্যবস্থা মত চলব ; যিহোবার আদেশ, শাসন ও বিধিসকল যত্নপূর্বক পালন করব। পরজাতীয় লোকদের সংগে আপনাদের কন্যাদের বিবাহ দেব না ও আমাদের পুত্রগণের জন্য তাদের কন্যাদের গ্রহণ করব না।' [৩১]

মন্দিরে সমবেত এই শপথ উচ্চারণের ভাষা বাইবেলে ভাষাসমগোত্রীয় শব্দ ব্যবহার, বাক্যের গঠনশৈলীতে সাধুভঙ্গি প্রয়োগের ফলে গাম্ভীর্যপূর্ণ আবহ তৈরি হয়েছে। মানব কণ্ঠে উচ্চারিত ঐশ্বরিক প্রত্যাদেশের মধ্যে যে ভাবগম্ভীর্য, শব্দের ওজস্বিতা থাকে উদ্ধৃতাংশের মধ্যের তা লক্ষ্য করা যায়। যেমন, 'মোশি কতৃক প্রদত্ত' না বলে 'মোশির দেয়া' 'বিধিসকল' না বলে 'নিয়মগুলো' 'কন্যাদের' না বলে 'মেয়েদের' 'বিবাহ' না বলে 'বিয়ে' 'পুত্রগণের' না বলে 'ছেলেদের'ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করতে পারতেন। কিন্তু তাতে ভাষার ঔজস্বিত নষ্ট হয়ে যেত। ভাষা ব্যবহারে সত্যেন সেনের 'পাপের সন্তান' উপন্যাসকে ক্লাসিকমাত্রায় উন্নীত করেছে। 'অভিশপ্ত নগরী'র ঐশীবাণীর প্রচারক যেরেমিয়া এবং 'পাপের সন্তান' এর যিহোবার প্রত্যাদেশ প্রচারক আচার্য ইষ্রার ভাষণে যুগপৎভাবে রাষ্ট্রিক ও ধর্মীয় বিধানের আবহ সংকেতঅভিব্যক্তি হয়েছে। উপন্যাসের কাহিনীর প্রয়োজনে কখনো সংলাপের ভেতরে সংলাপ ব্যবহৃত যদিও 'অভিশপ্ত নগরী'র তুলনায় 'পাপের সন্তান' এর ভাষা আরো জীবন সত্যের অনুষঙ্গী। সত্যেন সেনের বস্তুবাদী দর্শন ও বিজ্ঞানমনস্ক প্রাপ্ত জীবনবোধের প্রতিফলন 'পাপের সন্তান'কে এক সর্বজনীন শিল্পমাত্রায় উন্নীত করেছে।

তথ্যনির্দেশ ও টীকা

১. বিশ্বজিৎ ঘোষ, *বাংলাদেশের সাহিত্য*,১৯৯১,ঢাকা,বাংলা একাডেমী,পৃ.৫১

২. সৈয়দ আকরাম হোসেন, *'স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাসাহিত্যের রূপান্তর: বিষয় ও প্রকরণ*, প্রসঙ্গ:উপন্যাস, *একুশে প্রবন্ধ*- ১৯৮৮,বাংলা একাডেমী, ঢাকা,পৃঃ ৯১

৩. রবিন্দ্রনাথ ঠাকুর,*সাহিত্য*,১৯৮৯,কলকাতা বিশ্ব ভারতী,পৃ.৩১

৪. রফিকউল্লাহ খান, *বাংলাদেশের উপন্যাস: বিষয় ও শিল্পরূপ*, ১৯৯৭,ঢাকা, বাংলা একাডেমী, পৃ.১৩৭

৫. অমলেন্দু দে, *বাঙালী বুদ্ধিজীবী ও বিচ্ছিন্নতাবাদ*,১৯৭৪, কলকাতা, রত্না প্রকাশন, পৃ. ৬১-১৩১ দ্রষ্টব্য

৬. অমলেন্দু দে, পুবোক্ত, পৃ. ৬৮

৭. অমলেন্দু দে, পুবোক্ত, পৃ. ১১৩-১৩১ দ্রষ্টব্য

৮. অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, *কালের প্রতিমা*, ১৯৭৪,কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, পৃ.৩৯৪

৯. *বাংলাদেশের উপন্যাস: বিষয় ও শিল্পরূপ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৬

১০. আবু জাফর শামসুদ্দীন, *ভাওয়াল গড়ের উপাখ্যান*, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ১৯৬৮, ঢাকা, নওরোজ কিতাবিস্তান,পৃ.১৪৭

১১. *ভাওয়াল গড়ের উপাখ্যান*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৪২

Dhaka University Institutional Repository

১২. *ভাওয়াল গড়ের উপাখ্যান,* পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৪২
১৩. *ভাওয়াল গড়ের উপাখ্যান,* পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৮-৭৯
১৪. *ভাওয়াল গড়ের উপাখ্যান,* পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৮-৭৯
১৫. *ভাওয়াল গড়ের উপাখ্যান,* পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৮
১৬. সৈয়দ আকরম হোসেন, *প্রসঙ্গ: বাংলা কথাসাহিত্য,* ১৯৯৭, ঢাকা, মাওলা ব্রাদার্স, পৃ. ১১৯
১৭. *বাংলাদেশের উপন্যাস: বিষয় ও শিল্পরূপ,* পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৩৭
১৮. অভিশপ্ত নগরী,১৩৭৮, কলিকাতা, মুক্তধারা, (স্বাধীন বাংলা সাহিত্য পরিষদ),পৃ.১০৩
১৯. অভিশপ্ত নগরী,পূর্বোক্ত, পৃ.২১৯
২০. *বাংলাদেশের উপন্যাস: বিষয় ও শিল্পরূপ,* পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৮
২১. অভিশপ্ত নগরী,পূর্বোক্ত, পৃ.১১৬-১১৭
২২. অভিশপ্ত নগরী,পূর্বোক্ত, পৃ.২১৯
২৩. অভিশপ্ত নগরী,পূর্বোক্ত, পৃ.২১৩-২১৪
২৪. অভিশপ্ত নগরী,পূর্বোক্ত, পৃ.১১
২৫. অভিশপ্ত নগরী,পূর্বোক্ত, পৃ.৯১
২৬. সত্যেন সেন, *পাপের সন্তান,* দ্বি-সং, ১৯৭৪, ঢাকা, নওরোজ কিতাবিস্তান,'ভূমিকা' দ্রষ্টব্য
২৭. *বাংলাদেশের উপন্যাস: বিষয় ও শিল্পরূপ,* পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪১
২৮. Robert Scholes and Robert Kellogg, *Meaning in Narrative, the Nature of Narrative,* 1966, New York, Oxford University Press. P. 124
২৯. সত্যেন সেন, *পাপের সন্তান,* দ্বি-সং, ১৯৭৪, ঢাকা, নওরোজ কিতাবিস্তান,'ভূমিকা' দ্রষ্টব্য
৩০. *পাপের সন্তান,*পূর্বোক্ত, পৃ.৩০৯
৩১. *পাপের সন্তান,*পূর্বোক্ত, পৃ.৩৬২-৬৩

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায় : রূপক-প্রতীকী শিল্পশৈলীর উপন্যাস

ক. ক্রীতদাসের হাসি

খ. রাজা উপাখ্যান

গ. সমাগম

Dhaka University Institutional Repository

রূপক-প্রতীকী শিল্পশৈলীর উপন্যাস

উপন্যাস-সাহিত্যের এক বিশেষ ধারা রূপক-প্রতীকী শিল্পশৈলীর উপন্যাস। শিল্পকলার প্রায় প্রতিটি আঙ্গিককে রূপক এবং প্রতীকের প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। তবে আঙ্গিকগত স্বাতন্ত্র্যের কারণে উপন্যাসে রূপক এবং প্রতীকের প্রয়োগ, তাকে অন্যান্য শিল্প অভিপ্রায় থেকে পৃথক করেছে। রূপক এবং প্রতীক-এ আলংকারিক শব্দ দু'টি পাশাপাশি উচ্চারিত হলে বোধ ও ব্যবাহরিক ক্ষেত্রে শব্দদু'টির সূক্ষ্ম পার্থক্য রয়েছে। 'প্রতীক ভাবের দ্যোতক, আর রূপক বস্তুর। প্রতীকে ক্ষুদ্রের মধ্যে বৃহত্তের ব্যঞ্জনা লাভ করা যায়, কিন্তু রূপকে সাধারণত এ সম্ভাবনা নেই।'[১] ব্যবহৃত শব্দ যখন তার সহজ সাধারণ আক্ষরিক অর্থকে অতিক্রম করে ভিন্নতর অর্থের ইঙ্গিত দেয় তখনই বলা হয় শব্দটি প্রতীকী-'পরবাসে যাবা মাঝি, মনে ভেবো ভরাগোলা রেখে গেছ ঘরে।' এখানে 'ভরাগোলা' যুবতী স্ত্রী বা প্রেমিকার প্রতীক। প্রতীক আসলে কোনো বিশেষ অর্থে আবদ্ধ নয়, অনেক অভিজ্ঞতার সমষ্টি দিয়ে তৈরি হয় একটি প্রতীক, যার মধ্যে লুকিয়ে থাকে বিচিত্র ও বহুমাত্রিক ব্যঞ্জনা। রূপক হচ্ছে উপমান ও উপমেয়ের অভেদ কল্পনা অর্থাৎ রূপক (allegory) বলতে এমন এক ধরনের নীতিমূলক আখ্যানকে বোঝায়, যার অন্তর্নিহিত অর্থ দ্বিবিধ : উপাখ্যান ও উপাখ্যান অতীত ভাবের অর্থ। কোনো গভীর অন্তর্সত্যকে প্রকাশ করার জন্য একটি আখ্যানের আশ্রয় নিয়ে অস্পষ্টতার আচ্ছাদনে নতুন আখ্যান তৈরি করা, যাতে সমাজ ও সময়ের ইঙ্গিতময় রূপমূর্তি ফুটে ওঠে।এ শিল্পসত্যই রূপকের মূল কথা । সাধারণত বিরুদ্ধ সমাজ ও প্রতিকূল রাষ্ট্রীয় পরিস্থিতিকে প্রকাশ করার জন্য ঔপন্যাসিকেরা রূপক-প্রতীকধর্মী শিল্পাঙ্গিকের আশ্রয় নিয়ে থাকেন। সাতচল্লিশে দেশবিভাগ থেকে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ অর্থাৎ বাংলাদেশের স্বাধীনতার পূর্ব পর্যন্ত, সময়ের দিক থেকে খুব বেশি নয় কিন্তু বাঙালীর সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক জীবনের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। বাঙালির আত্ম-অনুসন্ধান তথা আইডেন্টেটির প্রশ্নে, অস্তিত্ব সংকট ও জাতীয় মুক্তির প্রশ্নে ১৯৪৭-১৯৭১ সময় পর্ব ছিল বাঙালির দ্বন্দ্বজটিল আত্মবিকাশের রক্তাক্তকাল। ধর্মকে ঐক্যের ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তানের প্রশাসন শুরু থেকেই স্বৈরাচারী ও সমরমুখী একটি প্রবণতা প্রকাশ করতে থাকে, যার চূড়ান্ত পরিণতি ঘটে ষাটের দশকে। প্রথমে ভাষাকে কেন্দ্র দ্বন্দ্বের সূত্রপাত হয় পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে দ্বন্দ্ব, বায়ান্নর রক্তাক্ত অভিজ্ঞতার মধ্যদিয়ে বাঙালির জাতীয় চেতনার মূলভিত্তি রচিত হয়।' ৫৪ সালের নির্বাচন, '৫৮ সালে সামরিক শাসন, '৬১ সালে রবীন্দ্র-জন্মশতবার্ষিকী পালনে বাধা দান, ৬২-তে তথাকথিত মৌলিক গণতন্ত্র,'৬৩-তে শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট, ৬৬-তে ছয়দফা আন্দোলন, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা, ৬৯-এ গণঅভ্যুত্থান এবং '৭১-এ মুক্তিযুদ্ধ ইত্যাদি ঐতিহাসিক ঘটনার অভিঘাতে সমৃদ্ধ এদেশের জনগণের চেতনা প্রতিমুহূর্তে বিবেকের আশ্রয় সন্ধান করেছে। ভাষা আন্দোলনের রক্তাক্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ জাতি ১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভোট প্রাদান করে কিন্তু বেনিয়া শাসকগোষ্ঠী সে রায়ের প্রতি শ্রদ্ধাশীল না হয়ে ১৯৫৮ সালে জারি করে সামরিক শাসন। এদেশের জনগণ ক্রমশ সামান্তমূল্যবোধ ও ধর্মীয় আদর্শপুষ্ট রাজনীতির প্রতি ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রজন্মশতবার্ষিকী পালনে বাধা দান ও রবীন্দ্র-বর্জনের ঘোষণা, তথাকথিত মৌলিক গণতন্ত্র, শিক্ষাকমিশন রিপোর্ট,ইত্যাদি শাসকগোষ্ঠীর আরোপিত কার্যক্রম সচেতন বাঙালির বিবেককে ক্ষুব্ধ করে তোলে। আইয়ুবের সামরিক শাসন জনগণের মৌলিক অধিকারই হরণ করেনি, অস্তিত্বেরও সংকট তৈরি করে, অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে বাঙালির প্রগতিশীল ও জাতীয়তাবাদী চেতনা। বি.এন.আর, প্রেস ট্রাস্ট, পাকিস্তান রাইটার্স গিল্ড, আদমজী, দাউদ পুরস্কার এবং নানা উপাধি বিতরণের মাধ্যমে এদেশের একশ্রেণীর বুদ্ধিজীবী, শিল্পী-সাহিত্যিকদের বেতন দাসে

Dhaka University Institutional Repository

পরিণত করে পাকিস্তানী প্রশাসন 'পরিবর্তন ঘটল মার্কসবাদী সাহিত্যিকদের'ও তাঁরা জীবিকার উন্নতির ও নিরাপত্তার সঙ্গে সৎভাবেই সাতিহ্যভাবনা এবং শিল্প-শরীরের রূপান্তর করলেন। কেউ হলেন ফ্রয়েডে আশ্রয়ী, কেউ-বা আত্মগোপন করলেন রোম্যান্টিক স্বপ্নালোকে, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে। মানবতাবাদী শ্রেণী অংশ আক্রান্ত হলেন, কারণ অশক্ত বুর্জোয়া মানবতাবাদ যতখানি বর্ণচোরা ততোখানি নিরাপদ। এদের অধিকাংশই হলেন আত্মরোমন্থনে তুষ্ট, কল্পলোকের জ্বলন্ত জতুগৃহে যন্ত্রণাদগ্ধ, ক্রমবিকাশে শঙ্কাগ্রস্থ, দেহবাদী পঙ্কে আকণ্ঠ নিমজ্জিত।[১] সমরতন্ত্র ও ধর্মীয় আবরণে এ ভাবে পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠী রাষ্টীয় আদর্শকে বিন্যস্ত করলেন যে, ব্যক্তি ও সমষ্টির জীবন অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে, সৃষ্টিশীল চেতনা হয়ে পড়ে সংকটদীর্ণ অন্তর্দ্বন্দ্বময়। এই অবরুদ্ধ, আতঙ্ক-শিহরিত পরিস্থিতিতে (borderline situation) শিল্পীর সত্য- সন্ধানের পথ হয়ে পড়ে দ্বিধাগ্রস্ত -হয়ত তাকে এই পরিস্থিতিতে বিরুদ্ধ শক্তির সঙ্গে আপোস করা অথবা নিঃশঙ্কচিত্তে সমাজসত্যকে প্রকাশ করা। বিরুদ্ধ রাষ্ট্রশক্তির দমবন্ধ পরিবেশে জীবনার্থের ইতিবাচক রূপ নিমার্ণে বাংলাদেশের সমকালীন ঔপন্যাসিকরা নতুন বিষয়বস্তু সন্ধানে মনোযোগী হন। বিরুদ্ধ শক্তির সঙ্গে আপোস কিংবা পলায়নবাদী মনেবৃত্তির পরিবর্তে ঔপন্যাসিকরা মিথ, পুরাণ, ইতিহাস, কিংবদন্তির রূপকের আশ্রয় খুঁজে পেলেন। লেখা হয় রূপক-প্রতীকশৈলীর উপন্যাস এবং বাংলাদেশের উপন্যাস-সাহিত্যের নতুন সম্ভাবনার পথ আবিষ্কৃত হয়।

সমাজজীবনের গভীর সত্যকে অভিব্যঞ্জিত করে শওকত ওসমান রচনা করেন তাঁর রূপকাশ্রয়ী, ফ্যান্টাসীধর্মী উপন্যাসসমূহ। 'সৃষ্টিশীল শিল্প-অভিপ্রায়ের দিক থেকে রূপক বা allegory উপন্যাসের এক আবহমানরীতি। নরথ্রপ ফ্রাই-এর মতে (genuine allegory is a structural element in literature)[২] রূপকের এই সংজ্ঞার্থের আলোকে শওকত ওসমানের শিল্পমনস্তত্ত্বকে ইতিবাচক সত্যের ওপর স্থাপন করা যায়।[৩] শওতক ওসমান ঘটনাংশ নির্বাচনে ইতিহাস, পুরাণ, রূপকথা, কিংবদন্তির আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। উপন্যাসের এই নব-আঙ্গিক উদ্ভাবনায় শওকত ওসমানের শিল্প এষণা ইতিবাচক জীবনার্থ নিমার্ণের পরিচয়বাহী। সচেতন শিল্পীর সামাজিক দায়িত্ববোধ থেকে শওকত ওসমান 'ক্রীতদাসের হাসি' (১৯৬২) উপন্যাসে সামরিক শাসন শৃঙ্খলিত জাতীয় মুক্তির আকাঙ্ক্ষাকে রূপকের আশ্রয়ে প্রতিবিম্বিত করেছেন।

রূপকাশ্রয়ী, প্রতীকধর্মী তাঁর অন্যান্য উপন্যাসগুলোর মধ্যে 'সমাগম' (১৯৬৭) 'রাজাউপাখ্যান' (১৯৭১) বিষয় ও প্রকরণের দৃষ্টি কোণে ব্যতিক্রমী। এই উপন্যাসগুলোর মধ্যদিয়ে শওকত ওসমান শুধু আধুনিক মননশীল এক প্রকরণের উন্মোধন করেননি, বরং জনমানুষের অস্তিত্বসংকট ও সংগ্রামী চেতনার প্রতীকী রূপায়ণ ঘটিয়েছেন। সত্যতার সময়-গর্ভে লুকায়িত প্রত্নবীজকে সংকটদীর্ণ সমকালের পটভূমিতে নবরূপায়ণের ফলে 'ক্রীতদাসের হাসি' 'সমাগম' 'রাজা উপাখ্যান' নতুন মাত্রা লাভ করেছে।

Dhaka University Institutional Repository

ক্রীতদাসের হাসি

'ক্রীতদাসের হাসি' শওকত ওসমানের প্রতীকাশ্রয়ী রূপকশৈলীর শিল্পসার্থক উপন্যাস। এর গঠনকাঠামো প্রায় নিচ্ছিদ্র, ঘটনাগুলো পরিণামমুখী, চরিত্র ঔপন্যাসিক-উদ্দেশ্য সাধনে সফল এবং সংলাপময় নাট্যশৈলী (dramatric manner) পরিচর্যার কারণে কাহিনীর দ্বন্দ্ব চূড়ান্ত রূপ লাভ করেছে। বাগদাদ নগরী এবং বাদশা হারুন-অর রশীদের রূপককাহিনীর আশ্রয়ে মূলত পরিবেশন করা হয়েছে পাকিস্তানির ঔপনিবেশিক সামুরিক শক্তির নিপীড়িত ও ষাটের মাধ্যমে বাঙালির গৌরবোজ্জল সংগ্রামের কথা। 'ঔপন্যাসিক রূপবন্ধ নির্মাণে হারুন-অব-রশীদের বাগদাদের কাহিনী-কে নাট্যরীতিতে পরিচর্যা করেছেন। চরিত্রগুলি এক একটি চেতনার প্রতীক। খলিফা ও মশরুর, তাতারী এবং কবি নওয়াস-যথাক্রমে ক্ষমতা-অন্ধ অত্যাচারী, উৎপীড়িত মানবতার এবং শাশ্বত সৌন্দর্য ধারণার ভাষারীতি বিষয় প্রকাশে যথাযথ।'[৪]

উপন্যাসের মূল কাহিনী শুরু করার আগে ঔপন্যাসিক ভূমিকা স্বরূপ 'ক্রীতদাসের হাসি' পুস্তকের পান্ডুলিপি আবিষ্কারের বৃত্তান্ত সংযোজিত করেছেন। এই বৃত্তান্ত অপ্রাসঙ্গিক নয়, উপন্যাসের প্লট বিন্যাসের ক্ষেত্রে এই বৃত্তান্তের ইঙ্গিতময় তাৎপর্য রয়েছে।ঔপন্যাসিক বলেছেন, 'ক্রীতদাসের হাসি' পুস্তকের পান্ডুলিপি আবিষ্কার এক দৈবী ব্যাপার।' এটা বলে তিনি উপন্যাসের মূল কাহিনীর প্রতি পাঠকদের মনে একধরণের কৌতূহল উদীপ্ত করেছেন। লেখক, মৌলানা জালাল, এবং মাসুদ তিন বন্ধু একছুটির অবকাশে বেড়াতে বের হন। নানা দুর্বিপাকে মধ্য দিয়ে তাঁরা উপস্থিত হন এক অখ্যাত পাড়াগাঁয়ে। সেপাড়াগ্রায়ে ছিল লেখকের সহপাঠিনী রউফননেসার বাড়ি। রউফননেসা খুব ভালোছাত্রী ছিলেন কিন্তু ইংরেজি বিভাগের এক মেধাবি ছাত্র তাকে প্রত্যাখ্যান করায়, সে গ্রামের বাড়ি গিয়ে একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করে সে স্কুলের প্রধান শিক্ষয়িত্রী হিসেবে কাজ করছেন। সংসারে তার একমাত্র অবলম্বন পিতামহ শাহ ফরিদ উদ্দিন জৌনপুরী। বয়স নব্বই, চোখে দেখেন না, কানেও ভালো শোনেন না। আলাপ প্রসঙ্গে 'আলেফ লায়লা ওয়া লায়লা' গল্প নিয়ে হাসাহাসি হচ্ছিল। দাদু ফরিদউদ্দিন জৌনপুরী বললেন-'বন্ধুগণ, ওটা আলেফ লায়লা ওয়া লায়লা (সহস্র ও একরাত্রি) নয়। ও কেতাবের নাম 'আলেফ লায়লা ওয়া লায়লানে' অর্থাৎ সহস্র দুই রাত্রি। মাসুদ দাদুর উদ্দেশ্যে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেন। মাসুদ ইংরেজির ছাত্র হিসেবে দাবি করে বলেন- 'আমি ত শুনেছি' thousand and one night' সহস্র এক রাত্রি। দাদু বললেন, 'ভুল শুনেছ।'.. .. হ্যাঁ হ্যাঁ। ভুল। তোমরা ত পড়ো বেঈমান ইংরজের কেতাব। যাদের গোলাম ছিলে দেড়শ বছর। আসল বই ত দ্যাখো নি।' তারপর দাদু তার সংগ্রহ শালা থেকে নাস্তালিখ অক্ষরে লেখা বিশাল পাণ্ডুলিপি বের করে দেখান। দাদু শাহ ফরিদ উদ্দিন জৌনপুরী 'আলেফ লায়লা ও লায়লানের আসল পাণ্ডুলিপি তাঁর হাতে কিভাবে এলো এর ইতিহাস বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন- হালাকুখানের বাগদাদ আক্রমণের সময় এ পান্ডলিপি হিন্দুস্থানে আসে এবং বহু হাত ফেরির পর পৌছে শাহসুজার কাছে। শাহ সুজা আরাকানে পালানের সময় এ পাণ্ডুলিপি মুর্শিদাবাদের এক ওমরাহের কাছে রেখে যান, সেখান থেকে জৌনপুর এবং জৌনপুর থেকে শাহ ফরিদ উদ্দিন তা উদ্ধার করেন। প্রচলিতি 'আলেফ লায়লা ওয়া লায়লা' (সহস্র এক রাত্রি) গ্রন্থের শেষ গল্পটা হচ্ছে শাহ্জাদা হাবিবের কাহিনী। কিন্তু নব আবিষ্কৃত পাণ্ডুলিপির মধ্যে শাহ্জাদা হাবিবের কাহিনীর পরে যে কাহিনী সংযোজিত তা হচ্ছে 'জাহাকুল আব্দ' অর্থাৎ গোলামের হাসি। এজন্য পান্ডুলিপিটি নাম হয় 'আলেফ লায়লা ওয়া লায়লানে' অর্থাৎ 'সহস্র দুই রাত্রি।'

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্বের বিস্ময় এই পাণ্ডুলিপি দেখে সবাই অবাক। লেখক কপি করার জন্য জৌনপুরীর কাছ থেকে এ পাণ্ডুলিপি চেয়ে আনেন এবং শহরে ফিরে মৌলানা জালালের সহায়তায় 'আলেফ লায়লা ওয়া লায়লানে'র শেষ গল্পটা অর্থাৎ 'জাহাকুল আব্‌দ' বা 'ক্রীতদাসের হাসি' তরজমা করেন।

পাণ্ডুলিপি সম্পর্কে লেখকের এই উপকাহিনী অবতারণার তাৎপর্য আছে। রূপকশৈলীর উপন্যাসের শিল্পী সাধারণত যে কাহিনী বর্ণনা করেন সে কাহিনীর প্রতি বিশ্বাসযোগ্য ভ্রান্তি অর্জনের জন্য এক ধরণের কাহিনীর অবতারণা করেন যাতে পাঠকের কাছে নিকটস্ত ইঙ্গিতের আড়ালটা অক্ষুন্ন থাকে। এদিক থেকে শওকত ওসমান সার্থক।
'ক্রীতদাসের হাসি'র এই শিরোনামহীন ভূমিকা সম্পর্কে বলতে গিয়ে শওকত ওসমান বলেন- 'ক্রীতদাসের হাসি'- সবই কল্পনা। কাব্যের ঘরের আসবাবের মত। সবই নানা মাত্রায় বিস্তারিত। আরব্য উপন্যাসের কথা ত ছুতো হিসেবে ব্যবহৃত। তদানীন্তন পাকিস্তানের কথা স্মরণ রেখে। আইয়ুব শাহীর দাপট-এর স্বৈরাচারী ব্যারাকে জ-ম জান্তদের ধর্মক-চমক-দম্ভ-আসফালনে গোটা দেশ রুদ্ধশ্বাস। তখনই লেখা ওই বই। তাই আর্তনাদেই কাহিনীর সমাপ্তি ঘটে। তবে আমি (তখনকার সংখ্যায়) পূর্ব পাকিস্তানের আট কোটি বাঙালির পক্ষ থেকে ওই রাজত্বের মুখে থুথু দিতে বদ্ধ পরিকর হয়েছিলুম। .. .. আমি আজো মাঝে মাঝে দুষ্টুমির হাসি, হাসি পুরাতন দিন স্মরণ রেখে। একদা আমি শাসকদের আহাম্মক বানাতে পেরেছিলাম।'[৫] 'ক্রীতদাসের হাসি' উপন্যাসের আঙ্গিক বিবেচনায় ঔপন্যাসিকের এই স্বীকারোক্তি প্রনিধানযোগ্য। উপন্যাসটি সে বছর অর্থাৎ ১৯৬২ সালের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ হিসেবে পুরস্কার লাভ করে, আইয়ুব খান নিজ হাতে এ পুরস্কার বিতরণ করেন, পরে যখন বুঝতে পারলো, এটি আসলে তার বিরুদ্ধেই লেখা, তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। বইটি বাজেয়াপ্ত করাও যায়না, তাহলে প্রেসিডেন্টের মুখ থাকে কোথায়। রূপকধর্মী উপন্যাসের আচ্ছাদন আসলে এমনই, পোষাকের আড়ালে ঢাকা থাকে ইঙ্গিতময় রূপ কে হঠাৎ দেখে চেনা যায় না। সমকালের প্রত্যক্ষ চেহারা ধীরে ধীরে স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হতে থাকে। 'ক্রীতদাসের হাসি' উপন্যাসেও আইয়ুবী শাসন নিপীড়নের চেহারা বাগদাদের অত্যাচারী শাসক হারুন-আর রশীদের রূপক কাহিনীতে সার্থকভাবে অভিব্যঞ্জিত হয়েছে। 'ক্রীতদাসের হাসি' উপন্যাসে কাহিনী দীর্ঘ নয় কিন্তু চমকপ্রদ এবং যথেষ্ট নাটকীয়তায় পরিপূর্ণ। মোট বাইশটি পরিচ্ছেদে বিন্যাস্ত। নাটকের দৃশ্যের মত করে ঔপন্যাসিক কাহিনীকে সাজিয়েছেন। প্রত্যেকটি পরিচ্ছেদের শুরুতে নাটকের মত সংক্ষিপ্তভাবে দৃশ্যপরিকল্পনার বর্ণনা দিয়েছেন এবং এ্যারিস্টেটেলীয় ত্রিনীতি অনুসারে সময়ের ঐক্য (unity of time) স্থানের ঐক্য (unity of place) এবং ঘটনার ঐক্য (unity of action) উপন্যাসের কাহিনীকে বিন্যস্ত করেছেন। প্লটগঠনের এই শৈলী 'ক্রীতদাসের হাসি' উপন্যাসের শিল্পায়নতনকে ত্রুটিহীন স্বচ্ছতা দিয়েছে।

খলিফা হারুন-আর রশীদের প্রাসাদের এক অংশে সহধর্মিনী বেগম জুবায়দা ও বাঁদী মেহেরজানের কথোপকথন-দিয়ে উপন্যাসের শুরু। মধ্যরাত্রির নিদ্রামগ্ন নগরীতে তন্দ্রাচ্ছন্ন প্রহরীদের অগোচরে বেগম, বাঁদী মেহেরজানকে তার প্রেমিক তাতারীর সঙ্গে মিলানাভিসারে যাওয়ার জন্য সহায়তা করে। বাঁদী মেহেরজান এবং হাবসী গোলাম তাতারীর প্রেমময় মিলনে বেগম নিজেই পুলকিত। তাই বেগম সাহেবা বলেন-

> 'দুই সীনা একত্র দেখলে আমার কি যে খুশী লাগে।'[৬]

Dhaka University Institutional Repository

প্রেমিক তাতারী ও প্রেমিকা মেহেরজানের সুখ ডগমগ হৃদয়ের হাসির শব্দে বাগদাদ নগরীর নিরব, নিদ্রামগ্ন রাতের আকাশেরও উচ্চকিত। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে দেখা যায় বাদশা হারুন-আর রশীদ গভীর শূন্যতায় নিমজ্জিত, অনুশোচনায় দগ্ধ,সুখ, ভিক্ষুক, স্মৃতি ভারাতুর যন্ত্রণায় কাতর। যন্ত্রণা লাঘবের জন্য বন্ধু মাসরুরকে সঙ্গে নিয়ে হারুন-আর রশীদ নৈশ ভ্রমণে বের হলে এক গোলাম কুটিরে নির্মল হাসির শব্দশুনে থমকে দাঁড়ায়।

> 'মাশরুর' শুনেছো এমন হাসি ? কে হাসছে আমার মহলের দেওয়ালের ওদিকে ? এ হাসি ঠোঁট থেকে উৎসারিত হয় না। এর উৎস সুখ-ডগমগ হৃদয়ের নিভৃত প্রদেশ। ঝর্ণা যেমন নির্জন পাহাড়ের উৎসঙ্গ-দেশ থেকে বেরিয়ে আসে উপল-বিনুনী পাশে ঠেলে ঠেলে-বিজন পথ ভ্রষ্ট তৃষ্ণার্ত পথিককে সঙ্গীতে আমন্ত্রণ দিতে-এই হাসি তেমনই বুক্ষঝর্ণা-উৎসারিত। কি কে এই সুখীজন- আমার হিংসা হয়, মাশরুর। আমি বাগদাদ-অধীশ্বর, সুখ-ভিক্ষুক। ও আমার তুলনায় বাগদাদের ভিক্ষুক তবু সুখের অধীশ্বর।'[৭]

প্রথম পরিচ্ছেদে তাতারী ও মেহেরজানের মিলনমধুর হাসির দৃশ্য দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে সুখ-ভিক্ষুক বাদশা হারুন-আর রশীদের যন্ত্রণাভারাক্রান্ত শূন্যতা হাসির শব্দ শ্রবণ ও হাসির শব্দশুনে ঈর্ষিত হওয়া, এবং হাসির উৎস অনুসন্ধানের মধ্য দিয়ে ঘটনা পরিণাম অভিমুখী। কাহিনীর এই পারম্পর্য 'ক্রীতদাসের হাসি' উপন্যাসের গঠনকাঠামোকে শৈল্পিক সংহতি দিয়েছে। প্রথম পরিচ্ছেদে ঘটনার কার্যকারণ সূত্র তৈরি-অর্থাৎ সুখ-ডগমগ হৃদয়ের হাসি; দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে সেই হাসির শব্দ শুনে বাদশার হৃদয় যন্ত্রণা,শূন্যতা আরো তীব্রতর হয় :

> 'ওরা হাসবে, আর আমি হাসতে পারবো না ? না তা হয়না।'[৮]

বাদশার এই অনুশোচনা-কারণ উজিরে আজম জাফর বার্মেকীকে নির্মমভাবে হত্যা করা, আপন বোন আব্বাসাকে অন্যায়ভাবে কতল করা এবং ঈর্ষা-সামান্য গোলাম আর বাঁদী হয়েও তাতারী এবং মেহেরজান এমন আনন্দের হাসি হাসতে পারে অথচ বাগদাদের বাদশা হয়ে তার মনে কোনো আনন্দ নেই, তার জীবনে মুক্তচিত্তের হাসি নেই। এই দ্বন্দ্ব উপন্যাসের কাহিনীবৃত্ত তৈরি করে। হারুন-আর রশীদ হয়ে ওঠে অত্যাচারী প্রজানিপীড়ক পাপাত্মার প্রতীক এবং তাতারী ও মেহেরজান স্বাধীন মুক্তচিত্তের প্রতীক।

তৃতীয় পরিচ্ছেদে এই হাসির উৎস সন্ধান করতে গিয়ে বাদশা হারুন-আর রশীদ তাতারী ও মেহেরজানের প্রেমময় মিলনের অপূর্ব দৃশ্য উপভোগ করেন। তাদের হাসিকে ঝর্ণাধারার মতই মনে হয়েছে বাদশার কাছে। বাদশা তারপর ক্রীতদাস তাতারীকে মুক্তি দিয়ে রাজ্যের প্রান্তে সুখ-স্বাছন্দ্যের ব্যবস্থা করে দেন। উদ্দেশ্য ক্রীতদাস তাতারীর নির্মল হাসি বাদশা উপভোগ করবেন। অর্থাৎ হাসির বিনিময়ে তাতারীকে গোলামী থেকে মুক্তি দিয়ে মহলে স্থান দেয়া হয়। মেহেরজান রাজার এ ব্যবস্থা মেনে নিলেও প্রেমিক তাতারী রাজার ব্যবস্থা সানন্দচিত্তে মেনে নিতে পারেনি। বরং তাতারীর জীবন ভরে ওঠে নিরানন্দে, হাসি মিলিয়ে যায় তার জীবন থেকে। বাদশা কোনো প্রকারে তার মুখে হাসি ফোটাতে না পেরে নির্যাতনের পথ বেছে নেয়। তবু তার তাতারীর মুখে হাসি ফোটে না। বাইশতম পরিচ্ছেদে আমরা দেখতে পাই কয়েদখানায় তাতারী ও মেহেরজানকে মুখোমুখি করা হয়, মেহেরজান প্রথমে তাতারীকে চিনতে না পালেও পরে চিনতে পারে এবং প্রেমময় স্মৃতি রোমন্থনে সহাস্যে এগিয়ে যায়। কিন্তু পারে না, প্রহরী তাদের বিচ্ছিন্ন

Dhaka University Institutional Repository

করে ফেলে। সুখ ডগমগ হৃদয়ের কলকল হাসি ধ্বনির জন্য তাতারীর উপর নির্যাতন চালানো হয়। তাতারী তখন বলে -

> 'শোন, হারুনর রশীদ। দীরহাম দৌলত দিয়ে ক্রীতদাস গোলাম কেনা চলে। বান্দী কেনা সম্ভব! কিন্তু-কিন্তু-ক্রীতদাসের হাসি -না -না-না-না-' [৯]

কবি আবু নওয়াস তখন বলে- 'আমীরুল মুমেনীন, হাসি মানুষের আত্মারই প্রতিধ্বনি।' উপন্যাসের এই সফল পরিসমাপ্তি থেকে একটি দার্শনিক মীমাংসায় উপনীত হওয়া যায়- ক্ষমতা, অর্থ বা শক্তি দিয়ে মানুষের স্বাধীনচিন্তালোককে কখনো অধিকার করা যায় না। 'হাসি মানুষের আত্মার ধ্বনি'-উপন্যাসের শেষ সংলাপে কবি নওয়াস খলিফার উদ্দেশ্যে এই নিগূঢ় সত্য উচ্চারণ করে। এখানে মানুষের ব্যক্তিসত্তার স্বাধীনতাই ব্যঞ্জিত হয়েছে। বস্তুত, ক্রীতদাস তাতারীর হাসিকে জনগণের অধিকার ও স্বাধীনতার প্রতীক হিসেবে গ্রহণ করেছেন শওকত ওসমান এবং প্রতিবাদী তাতারী হয়ে উঠেছে বাঙালির মুক্তিচেতনার প্রতীক-পুরুষ।

'ক্রীতদাসের হাসি' উপন্যাসে প্লট বিন্যাস ও চরিত্রায়ণে শওকত ওসমানের এই প্রতীকাশ্রয়ী ,রূপকশৈলীর দৃষ্টিকোণ সর্বদাসক্রিয় ছিল। প্রতীক ও রূপকের স্বভাবলক্ষণকে চিহ্নিত করতে গিয়ে C.S. Lewis বলেছেন- 'Symboliom is a mode of thaught, but allegory is a mode expression.'[১০] অর্থাৎ প্রতীক হচ্ছে চিন্তার পদ্ধতি কিন্তু রূপক হচ্ছে অভিব্যক্তি। W.W.Yeats এর মতে Symbolism said thing which could not be seid soperfectly in any other way, and needed but a right instinct its understanding, which allegory siad things which could be said as well or better, in another way and needed or right knowledge ofr its understanding.[১১] শওকত ওসমান সচেতন শিল্পীর সামাজিক দায়িত্ববোধ থেকে সমকালের শৃঙ্খলিত, সামরিক শাসনে নিপীড়িত জাতীয় বিবেকের প্রতিবাদ ও স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাকে তৎপর্যময় ইঙ্গিতে রূপকাশ্রয়ী করেছেন। ক্রীতদাসের হাসি নিয়ে বাদশার সঙ্গে দু'টি শক্তির অবস্থান দেখা যায়। একদল-কবি, শিল্পী, সংস্কৃতিসেবী- যাদের বিবেক অর্থলোভের কাছে পরজিত হয় নি। অন্যদল-আলেম আব্দুল কুদ্দুস এবং খলিফার উজীর-নাজির ও জল্লাদসহ অন্যা সভাসদরা। যারা অর্থ ও সুবিধার কাছে বিবেক বিক্রয় করে দিয়েছে- খলিফার অন্যায় দেখেও প্রতিবাদ করেনা। 'প্রথমোক্ত দলের কবি ইসহাক, আবু নওয়াস প্রমুখ পরোক্ষভাবে একটি জীবনসত্য ব্যক্ত করেছিল যে মেহেরজানের অবর্তমানে তাতারী কোনোদিন হাসবে না। এবং তাতারী কে মিথ্যা অভিযোগে দণ্ড দেওয়ার বিরুদ্ধাচরণ করেছিল আবু নওয়াস।'[১২] খলিফার ভুল বিচার তার সভাসদরা কেন দেখতে পায় না, তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন আবু নওয়াস :

> 'জাঁহাপনা,তারা যখন আপনার চোখ দিয়েই দেখে তখন নিজেদের চোখ ব্যবহার করেনা। আর যখন নিজেদের চোখও দেখার কাজে লাগায়, তখন আপনার চোখের ঝিলিক তারা আগেই দেখে নেয়।'[১৩]

তৎকালীন বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বিবেচনা করলে আবু নাওয়াসের এই বক্তব্যের তাৎপর্য খুঁজে পাওয়া যায়। স্বৈরশাসকদের সর্বকালে সর্বদেশে একশ্রেণীর স্তাবক দল থাকে। তারা স্বার্থান্ধ শ্রেণী। নগদ প্রাপ্তি মোহে বিবেক বিকিয়ে দিয়ে শাসক শ্রেণীর চোখ দিয়ে সব কিছু দেখতে থাকে। ফলে শাসক শ্রেণীর জঘন্য অন্যায়ও তাদের চোখে

Dhaka University Institutional Repository

পড়ে না। ষাটের দশকের বাংলাদেশে আইয়ুবের শাসনের সময়ও এরকম একশ্রেণীর স্তাবক দল ছিল। শওকত ওসমান সূক্ষ্মকৌশলে তার ইঙ্গিত দিয়েছেন। উপন্যাসে 'ক্রীতদাসের হাসি' হয়ে উঠেছে জনগণের অধিকার ও স্বাধীনাতর রূপক, তাতারী যেন প্রতিবাদী বাঙালি জনগণেরই প্রতিনিধি হয়ে উঠেছে এখানে। অত্যাচারী খলিফার শাসনাধীন বাগদাদকে এই কাহিনীতে অভিশপ্ত নগর হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। সারা পাকিস্তানই তখন স্বৈরশাসনের নিস্পেষণে অভিশপ্ত। উপন্যাসে বাগদাদ নগরী যেন সমগ্র পাকিস্তানের রূপক হিসেবে ব্যবহৃত।'[১৪] খলিফা, মাশরুক্ত, জল্লাদ, কাজী ক্ষমতান্ধ, অত্যাচারী, উৎপীড়ক পাপাত্মার প্রতীক এবং তাতারী, মেহেরজান, কবি আবু নাওয়াস শাশ্বত সৌন্দর্য ও মুক্ত মানবতার প্রতীক হিসেবে চিত্রায়িত হয়েছে। চরিত্রায়নে এইশৈলী এবং প্রতীকায়ন উপন্যাসের নাট্যপরিচর্যায় শিল্পীত হয়ে ওঠেছে।

৩.

উপন্যাসের ভাষা বিষয় ও পটভূমির অনুগামী। আরবী, ফারসি শব্দের তাৎপর্যপূর্ণ ব্যবহার কাহিনীর আবহকে পূর্ণমাত্রায় স্পন্দিত কে ছে। চরিত্রের ভাব ও বক্তব্য প্রকাশের অনুগামী শব্দ এবং বাক্যের রূপবন্ধনে ভাষাশৈলী নির্মিত। যেমন :

> 'মেহেরজন্য : তবে আল্লা যা নসীবে রেখেছেন, আমি বোরখা পরে' নিই, তুমি দরজা খুলে দাও।
>
> নেপথ্যে : এই জলদি কর্। দরজা খোল্।
>
> তাতারী : দিচ্ছি জনাব। বোরখা পরেছ ?
>
> মেহেরজান : পরেছি।
>
> তাতারী : আসুন জনাব : (নতজানু) আহ্লান ওয়া সাহলান্ ইয়া মাওলানা একি ! স্বয়ং আমিরুল মুমেনীন। লা-হাওলা ওল কুয়াতা ; আলম্পনা, বান্দার গোস্তাখি মাফ করবেন। এই শির ঝুঁকালাম। গোস্তাখির জন্য কঠোর সাজা দিন,জাঁহাপনা।
>
> হারুন : তুই ঘরের প্রদীপ জ্বালিয়েছিস্, আরো আলো-আরো রোশনাই চাই। '[১৫]

এখানে আরবী,ফারসি শব্দের ব্যবহারের মাত্রা লক্ষ ণীয়।

ফারসি শব্দ : নসীব, বোরখা, দরজা, জলদি, বান্দা, গোস্তাখি, রোশনাই, শির, মাফ, জনাব,-সংখ্যা ১০

আরবি শব্দ : আল্লা, আহ্লান, ওয়া, সাহলান, ইয়া, মাওলানা, আমিরুল মুমেনীন,লা-হাওলা,ওয়া, কুয়াতা, সংখ্যা ১২

বাংলা শব্দ : ক্রিয়া-কর্, খোল্, দিচ্ছি, পরেছি, রেখেছেন, খুলে দাও, করবেন, ঝুঁকালাম, আসুন-সংখ্যা-১০

ক্রীতদাসের হাসি, উপন্যাসের চরিত্র অনুসারে ভাষা বিচারের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত ছকটি লক্ষ্য করা যায় :

চরিত্র	স্ত্রী/পুরুষ	পেশা	বয়স	ব্যবহৃত শব্দের গড়
হারুন-আর রশীদ	পুরুষ	শাসক	৪০-৪৫	আরবি - ১০%
মানারুর	পুরুষ			ফারর্সি - ১২%
তাতারী	পুরুষ	শোষিত/দাস	২৩-৩২	আরবি - ৮%
মেহেরজান	স্ত্রী			ফারর্সি - ১৫%
বুসায়না	স্ত্রী			আরবি - ৬%
কবি নাওয়াস	পুরুষ	বুদ্ধিজীবী	২৫-৩০	ফারসি - ৮%

Dhaka University Institutional Repository

ফারসি শব্দ : আক্কেল মন্দ্ (বুদ্ধিমান), আক্দ (মন্ত্রপূত বিবাহ), আলিশান (ঝলমলে), ইনসান((মানুষ), ইনাম(পুরস্কার), উমদা (ভালো), উমেদার (প্রত্যাশা), কাফতান (আস্তিন), খোদকসী (আত্মহত্যা), খোশবু(সুগন্ধ), খামুস(চুপ), গোস্ত(মাংস), জেন্দা(জীবীত), দোস্ত(বন্ধু), নসীব(ভাগ্য), নফর(ভৃত্য), ফরজন্দ(ছেলে) ফেরেশ্তা(দেবদূত), মারহাবা (সাবাস),নেকাব(ঘোমটা) দস্তর(নিয়ম), নাফরমান(অবাধ্য)।

আরবি শব্দ : আমিরুল মুমেনীন (মুসলামানদের শাসক), কৌম (গোষ্ঠী) মোহাফেজ (রক্ষক), মাওলা (প্রভু) মুজরানা(নর্তকী), দারখাৎ(বৃক্ষ) জাহেল(অজ্ঞান), মোজেজা(অলৌকিক), মাহবুবা(প্রিয়তমা), লেবাস(পোষাক), সাফফাহ (রক্ত পিপাসু), আবে হায়াৎ (যে পানি পান করলে অমরত্ব লাভ করা যায়) ইত্যাদি।

রাজা উপাখ্যান

শওকত ওসমান(১৯১৭-১৯৯৮) সমাজ-দায়বদ্ধ শিল্পীর বিবেকী জাগরণ থেকে তাঁর রূপক-প্রতীক র উপন্যাসগুলো রচনা করেন। বিভাগ (১৯৪৭) উত্তর বাংলাদেশে আইয়ুবী শাসনে অবরুদ্ধ সমাজ ও রাষ্ট্রশক্তির বৈরী পরিস্থিতিতে যখন মুক্ত লেখনি সম্ভব ছিলোনা তখন রূপক-প্রতীকই উপযুক্ত শিল্পশৈলী হিসেবে তাঁর কাছে বিবেচিত হয়। শাসকগোষ্ঠীর প্রণোদনায় সমকালীন অন্য লেখকরা যখন আরব-ইরানের পুঁথি-পুরাণের মধ্যে আপন ঐতিহ্যের সন্ধান করছিলেন তখন শওকত ওসমান সংকটদীর্ণ জাতীয় অস্তিত্বের মুকি আকজ্ক্ষায় সেই পশ্চিম এশয়ি পটভূমিকে আচ্ছাদন হিসেবে ব্যবহার করে রূপক -প্রতকশৈলীর শিল্পাঙ্গিকের উদ্বোধন ঘটান। এতে শাসক গোষ্ঠির রক্তচক্ষুকে যেমন এড়ানো সম্ভব হয়েছে, তেমনি রূপকের আড়ালে জননিপীড়নের প্রতিবাদ জানানোও সম্ভব হয়েছে। 'ক্রীতদাসের হাসি' উপন্যাসের মূল কাহিনীর রূপকের আচ্ছাদন হিসেবে তিনি যেমন আরব্য রজনীর কথা উল্লেখ করেছিলেন, তেমনি 'রাজা উপাখ্যান'-এর শুরুতে ইরানের কবি ফেরদৌসীর 'শাহনামা'র অসমাপ্ত কল্পিত কাহিনীর আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। এ প্রসঙ্গে শওকত ওসমান এক গবেষকের কাছে ব্যক্তিগত পত্রালাপে জানিয়েছেন :

> 'রাজা উপাখ্যান'-এ শুধু 'শাহানামা' থেকে বাদশাহ জাহুকের কাহিনীটুকু গৃহীত, বাকী সবই আমার কল্পনার সহচর। ফেরদৌসি জাহুকের গলায় সাপ জড়িয়েছিলেন ঠিকই। মগজ আহার ইত্যাদি সবই আমার কারিগরির ফল।'[১৬]

রূপকের আড়াল তৈরি করার জন্য ভূমিকা স্বরূপ শিরোনামহীন এ ধরণের কাহিনীর অবতারণা রূপক র উপন্যাসেরই এক শিল্পকৌশল। শওকত ওসমান এশিল্পকৌশলকে অসাধারণ দক্ষতায় কাজে লাগিয়েছেন। 'রাজাউপাখ্যান'-এর শিরোনামহীন ভূমিকার সারৎসার-গজনীর সুলতান মাহমুদের সভাকবি ফেরদৌসি, বাদশার আদেশ মত 'শাহনাম' কাব্য রচনা করেন। কিন্তু তাতে সুলতানের ইচ্ছার প্রতিফলন না ঘটায়, সুলতান কবিকে প্রতিশ্রুতি মত স্বর্ণমুদ্রা দেননি, কবি এজন্য সুলতানের প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করলে তার প্রতি নেমে আসে দন্ডাদেশ। গ্রন্থাগারিক থেকে 'শাহনামা'র শেষ অংশ চেয়ে তিনি একটি নতুন অধ্যায় কোনোক্রমে যোগ করা সম্ভব হলেও দন্ডাদেশ এড়াতে তিনি দ্রুত গজনী ত্যাগ করেন। পর্বত সংকুল পথে চলতে কবি'শাহনামা'র সম্রাট জাহুকের অসমাপ্ত অলিখিত কাহিনী বুনে চলছিলেন কল্পনার চোখে। প্রাণভীতির কারণে ওই কাহিনী ফেরদৌসি লিখে যেতে

Dhaka University Institutional Repository

পারেন নি, 'রাজা' উপাখ্যান' সেই অসমাপ্ত কল্পিত কাহিনীর শব্দরূপ। অর্থাৎ 'রাজা উপাখ্যান' কবি ফেরদৌসির 'শাহনামা'র কাহিনীর রূপান্তর নয়, উপন্যাসের গল্পাংশের সূত্র হিসেবে ঔপন্যাসিক শিরোনামহীন প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন। রূপক উপন্যাসের এ এক শিল্পকৌশল। মূল কাহিনী বর্ণনার পূর্বে গল্পবীজের প্রসঙ্গ যোজনা, কাহিনীকে বিশ্বযোগ্যতা দান করে এবং পাঠক কাহিনীর পটভূমিতে ডুবে যায়, ফলে সমকালীন সংকটের ইঙ্গিতময় সংকেত বুঝতে সময় লাগে। অর্থাৎ রূপকের আড়াল তৈরিতে এ ধরণের কাহিনীসূত্রের উল্লেখের একটি শৈল্পিক ভূমিকা রয়েছে। শওকত ওসমান 'রাজা উপাখ্যান'-এর শুরুতে ব্যবহারে সফল হয়েছেন।

২.

'রাজা উপাখ্যান'(১৯৭০) উপন্যাসের কাহিনীবিন্যাসে রূপকের আড়াল, চরিত্র-চিত্রণে প্রতীকের ব্যবহার এবং পরিচর্যায় নাট্যশৈলী (dramatic manner) ও চিত্রশৈলীর (pictorial manner) শিল্পসম্মত প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। 'রাজা উপাখ্যান'-এ শওকত ওসমান রূপকের (allegory)ফর্ম পুরোপুরি অনুসরণ করেছেন। এ-উপন্যাসে মিথ-কাহিনীকে রূপকের আশ্রয়ে প্রকাশ করা হয়েছে। ব্যক্তিস্বার্থ অপেক্ষা সমষ্টিস্বার্থ, ব্যক্তিপ্রেম অপেক্ষা সমষ্টিপ্রেম-এই সর্বাধুনিক চেতনা এ-উপন্যাসের উপজীব্য। এ-ক্ষেত্র ঔপন্যাসিকের উদ্ভাবনী দক্ষতা সমকালীন জটিল সময় স্বভাবের সঙ্গে শিল্প-অভিপ্রায়ের সঙ্গতিবিধান করেছে।"[১৭] 'রাজা উপাখ্যান'- এর কাহিনী খুব দীর্ঘ নয়- পারস্যের মাজেন্দারনের অত্যাচারী, প্রজাপীড়ক রাজা জাহ্হক দৈববাণী কর্তৃক অভিশপ্ত হলে দু'টি গোখরো সাপ তার গলায় বেষ্টন করে থাকে। সাপ দুটির প্রতিদিনের খাদ্য হিসেবে নির্ধারিত হয় বিশ-তিরিশজন তরুণ-তরুণী অথবা জ্ঞানী বৃদ্ধের মগজ। রাজা যতদিন সর্পদ্বয়ের আহার সরবরাহ করতে ব্যর্থ হবেন, সেদিন রাজার মগজই হবে স্বর্পদ্বয়ের আহার সরবরাহ করতে ব্যর্থ হবেন, সেদিন রাজার মগজই হবে স্বর্পদ্বয়ের আহার। দৈব বিড়ম্বনায় অভিশপ্ত রাজা জাহ্হকের আর্তনাদ ধ্বনিত হয় রাজকন্যা গুলশানের সঙ্গের সংলাপ বিনিময়ে :

> 'জাহ্হক-এই জানালায় বসে থাকি। এই ভাবে দরবার চলে। নিচে আমির ওমরা জমা হয়। তা-ও মাসে হয়ত একবার। আমি সম্রাট, তাই মানুষ নই আর।
>
> গুলশান- পিতা, তুমি দূরে থেকে আমাকে যে যন্ত্রণা দিচ্ছ, আমি আর সহ্য করতে পারব না।
>
> জাহ্হক- আমার যন্ত্রণা আর বাড়িয়োনা মা। বরং আমার মৃত্যু হোক। কাল থেকে প্রহরীকে ঘিলু দিতে বারণ করো।
>
> গুলশান- তোমার জীবন কতো অমূল্য। তা কী হয় পিতা ? আর এই অভিশাপ একদিন কেটে যাবে বৈকি।
>
> জাহ্হক- কে জানে, করে ? কিন্তু প্রতিদিন কত প্রাণ নিঃশেষ হচ্ছে।'[১৮]

রাজাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য হাজার হাজার নিরাপরাধ লোক অর্থহীন ভাবে প্রাণ হারায়। পারস্যের দুই সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি জামসেদ দারিয়ুস ও তার বন্ধু জার্জি, রাজা জাহ্হকের গলায় বেষ্টিত সাপের আহার যোগানোর জন্য যুবক ও জ্ঞানী বৃদ্ধদের সরবরাহের কাজ করে প্রচুর অর্থ আয় করে। কিন্তু অবশেষে দুজনই নিজেদের জীবন উৎসর্গ করে সাপের আহারে পরিণত হয়। দারিয়ুস যে উপলব্ধি নিয়ে জীবন উৎসর্গ করে তা খুব গুরুত্বপূর্ণ :

Dhaka University Institutional Repository

'এই মগজ সরবরাহ দু'জনেই করেছি। কিন্তু চিন্তা করা অভ্যাস ছিল। একদিন বুঝতে পারলাম, দশ বছর ধরে এত নওজোয়ান কি জ্ঞান-সরস বৃদ্ধের যোগান দিলাম। দেশের মগজ থাকবে না। তখন থাকবে কি ? থাকবে শুধু পশুত্ব। ওদের যতটুকু মগজ আছে, ততটুকু থাকবে দেশে। অর্থাৎ দেশ জানোয়ারের দেশে পরিণত হবে।.. .. কিন্তু জানোয়ারের দেশে সব সম্পদ দিয়ে তুমি তোমার বংশধরদের রেখে যাচ্ছ। তারা কী দিয়ে সুখী হবে ? জঙ্গলের জানোর সুখী, আর কেউ না।'[১৯]

রাজাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য নিরাপরাধ লোকদের ধরে আনা কয়েদীর মধ্যে হরমুজ নামক এক গ্রামীন যুবককে দেখে রাজকন্যা গুলশানের ভালোলাগে। গুলশান সখী সহেলীর সহায়তায় হরমুজের সঙ্গে কয়েদ খানায় গিয়ে সাক্ষাৎ করে। গুলশান, তাকে মুক্তি দিতে চাইলে সে মুক্তির চেয়ে বন্দীত্বের কারণ জানতে চায়। হরমুজ একা মুক্তি পেতে চায় না, সবার মুক্তিই তার কাম্য। হরমুজ রাজকুমারী থেকে অভিশাপ্ত রাজার অবস্থা জানতে পেরে তাকে অভিশাপ মুক্ত করার চেষ্টা করে। গুলশানে সহায়তায় সে সাপ দুটির খাদ্যের তারতম্যে ঘটিয়ে তাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে। হরমুজের কৌশলে সাপ দুটি আত্মকলহে মারা যায় এবং রাজা অভিশপ্ত মুক্ত হয়। রাজ্যে হাজার হাজার লোক প্রাণে বেঁচে যায়। রাজা জাহুক শেষ পর্যন্ত প্রজাবৎসল রাজা হয়ে ওঠে এবং কন্যার ইচ্ছা অনুযায়ী হরমুজের সঙ্গের কন্যার বিবাহের আয়োজন করে। কিন্তু রাজার এ ব্যবস্থা হরমুজ মেনে নেয়না। বরং কয়েদ খানায় বাদী অবস্থায় অসুস্থ্য হলে ফেরমানের যে বন্দী যুবতী রুদ তর সেবা-যত্ন করে, সে মেয়েকে বিয়ে করে রাজ প্রাসাদ ও রাজ্যের লোভ করে গ্রামে ফিরে যায়। কাহিনীর এই বিন্যাসে দেখা যায় 'রাজা উপাখ্যান' সাংগঠনিক স্বভাবে রূপক, এবং চারিত্রচিত্রণে ও সংলাপে প্রতীকী (Symbolic)। ষাটের দশকে বাংলাদেশের আইয়ুবীয় স্বৈরশাসনের যাঁতাকলে পিষ্ট জনগণের মুক্তি আকাঙ্ক্ষাকে মিথ-বলার আবয়নে শওকত ওসমান এ উপন্যাসে চিত্রিত করেছেন। অভিশপ্ত রাজাকে শাপমুক্তি করা, পক্ষান্তরে তার জীবনোলব্ধিতে মানবীয় চেতনার উদ্বোধন, 'রাজা উপাখ্যান' এর মূল বিষয়। রাজা জাহুক উপন্যাসে পাকিস্তানের তৎকালীন স্বৈরশাসক আইয়ুব খান, মাতৃহীনা নিঃসঙ্গ রাজকুমারী গুলশান- বাংলাদেশ, এবং যুবক হরমুজ-দেশের মুক্তিকামী তরুণ সম্প্রদায়। অর্থাৎ রূপক কাহিনীর আড়ালে, প্রতীকী চরিত্র সৃজনে ঔপন্যাসিক সমকালীন সামাজিক দায় ও বিবেকী চেতনার প্রতিবাদকে অসাধারণ শিল্প সার্থকতায় তুলে ধরেছেন 'রাজা উপাখ্যান' উপন্যাসে।

'রাজা উপাখ্যান'-এ চরিত্র-চিত্রণে ঔপন্যাসিক নাট্যশৈলী (dramatic manner) ও চিত্রশৈলী (pictorial manner)এ দুই শৈলীর পরিচর্যা করেছেন। উপন্যাসে হরমুজ জনগণের মুক্তি আকাঙ্ক্ষার প্রতীক চরিত্র। সে প্রেম ও মুক্তির প্রতীক। রাজার লোক তাকে ধরে নিয়ে এসেছে, কিন্তু সে জানেনা কি তার অপরাধ। বারবার সে তার বন্দীত্বের কারণ জানতে চেয়েছে। কায়েদখানায় অসুস্থ অবস্থায় ফেরাসের বন্দী যুবতী রুদ তার পরিচর্যা করলে, সেখানেই হরমুজের সঙ্গে তার ঘনিষ্টতা হয় এবং তা এক সময় প্রেমে রূপ লাভ করে। রাজকুমারী গুলশান তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তাকে মুক্তি দিতে চাইলে, সে একা মুক্তি পেতে চায় নি, বরং সে সবাইকে মুক্ত করতে চেয়েছে। গ্রামীণ যুবক হলেও সে নিজের মেধা ও বুদ্ধি দিয়ে অভিশাপগ্রস্ত রাজাকে শাপমুক্ত করে। ক্রমে সমস্ত বন্দী মুক্তি লাভ করে। শাপ মুক্তির পর রাজা জাহুক হরমুজকে রাজকন্যা দান এবং রাজ্যের দায়িত্ব দিতে চাইলেও সে তা প্রত্যাখান করে। বরং সাধারণ মেয়ে রুদ্ধকে নিয়ে সে গ্রামে ফিরে যায়। হরমুজ চরিত্রটিতে নির্লোভ, প্রেমময়, মানবীয় চেতনার সন্নিবেশ ঘটিয়ে ঔপন্যাসিক বোঝাতে চেয়েছেন, ব্যক্তিস্বার্থের চেয়ে সমষ্টিস্বার্থ এবং ব্যক্তিপ্রেম থেকে সমষ্টিপ্রেমই শ্রেষ্ঠ।

Dhaka University Institutional Repository

'শোষিত অবরুদ্ধ সমাজজীবনে ব্যক্তিস্বার্থ নয়- সামূহিক জীবনচৈতন্যে উত্তরণই হল প্রত্যাশিত। শোষণ-বঞ্চনা-অত্যাচার-শৃঙ্খলার্ত-জর্জরিত সমাজের প্রতি ঘৃণা এবং তা থেকে উত্তরণের প্রতীকী ইঙ্গিতে 'রাজা উপাখ্যান' অনন্য।'[২০] অর্থাৎ হরমুজ হচ্ছে ঔপন্যাসিকের উদ্দেশ্য চালিত, মানসচেতনার প্রতীক চরিত্র।

রাজা জাহুকও এ উপন্যাসে প্রতীক চরিত্র। সে প্রজাপীড়ক, অত্যাচারী, দৈব বিড়ম্বনার অভিশপ্ত হলে দুটো গোখরো সাপ তার গলা বেষ্টনকরে থাকে। এই অবস্থায় সে একটি কক্ষে আবদ্ধ থাকে। মাসে একবার শুধু উপরের ঘরের জানালায় আমির ওমরাহের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। আপন কন্যার সঙ্গেও সে থাকতে পারে না। রাজার আত্মবন্দিত্ব, অসহায় পরিস্থিতি তার সংলাপে আর্তনাদের মতো ধ্বনিত হয়। হরমুজের কৌশলে সে শাপমুক্ত হলে, তার মধ্যে মানবীয় চেতনার সমাবেশ ঘটে। সে প্রজাবৎসল রাজায় পরিণত হয়। বস্তুত রাজার এই মানবীয় বোধে উত্তরণকে জীবনের ইতিবাচক দৃষ্টিকোণ থেকে পরিচর্যা করেছেন ঔপন্যাসিক। ঔপন্যাসে অন্য চরিত্রগুলোর মধ্যে রাজকুমারী গুলশান, পার্শ্ব চরিত্র সেহেলী, দরিয়ুস, জার্জিস স্ব-স্ব স্থানে অনিবার্য ভূমিকা পালন করেছে।

৩.

'রাজা উপাখ্যান' উপন্যাসে ঔপন্যাসিক পটভূমি অনুযায়ী ভাষা প্রয়োগ করেছেন। অর্থাৎ পশ্চিম এশীয় নিয়ম অনুসারে দরবারি আবহ, পরিবেশ ও আরবি, ফারসি শব্দের স্বচ্ছন্দ প্রয়োগ এ-উপন্যাসে আমরা লক্ষ করি। যেমন :

ক. 'মায়া-মহব্বত নিয়ে বাদশার হুকুম পালন চলে না। যদি আওরাত দিল হও আমার দল ছাড়ো।' [২১]

খ. আর সে বাদশ নয়, গোলাম। আর সেই হবে এ রাজ্যের বাদশা যার সকলের গোলাম হওয়ার ক্ষমতা আছে।'[২২]

বিশেষত সংলাপে আরবি, ফারসি শব্দের বহুল ব্যবহার লক্ষণীয়। উদ্ধৃতাংশে আরবি শব্দ-'মহব্বত' (নিবিড় সম্পর্ক) হুকুম (আদেশ)| 'গোলাম' (প্রজা), ফারসি শব্দ- 'বাদশা'(মালিক, রাজা) দিল(হৃদয়) উর্দু শব্দ- 'আওরাত' (মেয়েলোক) ইত্যাদি। বাক্যের গঠন দীর্ঘ নয়। চরিত্রের মনোভঙ্গির ও ভাবপ্রকাশে উপযোগী তার রচিত হয়েছে বাক্যরাজি।

বর্ণনা-বিবরণে তৎসম শব্দের অধিক প্রয়োগ লক্ষণীয় :

ক. সর্পগর্জন আর গর্জন নেই। হিংসা এবং জিঘাংসার চরম পর্যায়ে ঘাতক যেমন আরো সরীসৃপতা সঞ্চয়ে চীৎকার দেয়, এই ফোঁসে ধ্বনি তেমনই বিকট কিছু।'[২৩]

খ. বন্দীদল এখন নীরবে হাঁটছিল। সকলেই জওয়ান। কয়েকজন অবয়বে রীতিমত সুন্দর। ক্লান্তি তাদের জৌলুস নিভিয়ে দিতে পারেনি, যদিও ছেটা কিছু নিষ্প্রভ।'[২৪]

সংলাপময় নাট্যশৈলী ও চিত্রশৈলীপ্রয়োগের ফলে ভাষা সাবলীল সৌকর্য মণ্ডিত হয়ে উঠেছে। বাক্য ছোট বাড় অসমান।

Dhaka University Institutional Repository

সমাগম

'সমাগম' (১৯৬৭) শওকত ওসমানের (১৯১৭-১৯৮৯) নিরীক্ষামূলক শিল্প অভিপ্রায়ের অপূর্ব উপন্যাস। ফ্যান্টাসির আশ্রয়ে রচিত তাঁর নিজস্ব চিন্তা ও মতাদর্শকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে কয়েকজন বিশিষ্ট অথচ ব্যক্তির আত্মার সম্মিলনে প্রকাশ করেছেন। বৈরী সমাজ ও বিরুদ্ধ রাষ্ট্রের সময়-সংকটে যখন অনেক কিছুই মেনে নেয়া যায় না অথচ প্রতিবাদ করাও সম্ভব নয়, তখন সচেতন শিল্প-বিবেক কখনো কখনো নিরীক্ষাময় ফ্যান্টাসির আশ্রয় নিতে বাধ্য হন। ফ্যান্টাসি, অবাধ কল্পনারই ফসল। বাস্তবে যা করা সম্ভব নয়, ফ্যান্টাসির আশ্রয়ে অবাধ কল্পনার সাহায্যে সে অপূর্ন ইচ্ছার প্রকাশ করা সহজ। বিভাগ (১৯৪৭) উত্তর বাংলাদেশে পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর সামরিক ও স্বৈরাচারী মনেবৃত্তির প্রেক্ষাপটে শওকত ওসমান 'সমাগম' এর মত ফ্যান্টাসির আশ্রয়ে নিজের অপূর্ণ ইচ্ছা ও বিবেকী বক্তব্যকে প্রকাশ করেছেন। ফ্যান্টাসির আশ্রয়ে, রূপক-প্রতীকের সংকেতে বক্তব্য প্রকাশের কৌশল হিসেবে এঁশিল্পাঙ্গিক খুবই প্রাসঙ্গিক। শওকত ওসমানের 'ক্রীতদাসের হাসি' ও 'রাজা উপাখ্যান'-এর চেয়ে 'সমাগম'এর পটভূমি আরো বিস্তৃত। সম্রাজ্যবাদ ও যুদ্ধের বিরুদ্ধে বিশ্বশান্তি ও মানবিক প্রত্যয়ে সার্বজনীন কল্যাণকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে স্থাপন করেছেন তিনি 'সমাগম' উপন্যাসে। উপন্যাসের কল্পকাহিনী খুবই কৌতূহল-উদ্দীপক। ঢাকায় একটি দৈনিক পত্রিকার অনুবাদক জুহার গৃহর্ভত্য আলী বাগানে কাজ করতে গিয়ে একটি হলদে তুলট কাগজে লেখা পত্র পায়। মধ্যযুগীয় বাংলা হরফে লেখা চিঠির পাঠোদ্ধার করে জুহা জানতে পাবেন, সহস্র মখী সহ রোজ রবিবার। অর্থাৎ পরবর্তী মহাকবি আলাওল তাঁর বাড়িতে বেড়াতে আসবেন। আনন্দিত জুহা এই উপলক্ষে নিজ আগ্রহে মাইকেল মধুসূদন দত্তও রমা রলাঁ, পুত্র ফুয়ার আগ্রহে জর্জ বার্নাড'শ দ্বিতীয় পুত্রের আগ্রহে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বন্ধু প্রাণশশীর আগ্রহে হাজী মুহাম্মদ মহসীনকে আমন্ত্রণ জানান। আলাওলের চিঠির সূত্রে এভাবে বিশ্বের এ বিশিষ্ট মনীষীদের কল্পিত সমাগম ঘটে জুহার গৃহে। নিমন্ত্রিত প্রত্যেক মনীষীই নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য নিয়ে বন্ধু সমাগমে একত্রে আনন্দে, হাসিতে, আড্ডায়, সমকালীণ বিশ্বের নানা সংকট ও সমস্যা নিয়ে তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত হন এবং সমাধানের পথ খোঁজেন। বস্তুত, এই সম্মিলনে আগত সকল মনীষীই অভিন্নভাবে সম্রাজ্যবাদ, যুদ্ধ ও নিপীড়নের বিরোধী। তাঁরা সকলেই বিশ্বশান্তি ও সার্বজনীন মানবিক কল্যাণের অতন্ত্র সৈনিক। জুহার গৃহে তাঁদের এ সমাবেশকে বলা যায় এ যেন এক আন্তর্জাতিক শান্তি সম্মেলন। জুহার বন্ধু সৈয়দ বোকজার কণ্ঠে ধ্বনিত হয়-'মানুষের বিশ্বভ্রাতৃত্ব অক্ষয় হোক।' বানর্ড'শ বলেন- 'ধ্বংস হোক, সম্রাজ্যবাদীগণ ও তাদের অনুচরেরা ধ্বংস হোক।' রবীন্দ্রনাথ সুললিত কণ্ঠে বলেন- 'সুখীতের' আরো সমৃদ্ধতর হোক আগামীদিনের পৃথিবী।' এভাবে শওকত ওসমান 'সমাগম' উপন্যাসে সূক্ষ্ম ও গভীরতর মানবিক প্রত্যয়কে অভিব্যঞ্জিত করেছেন।

'সমাগম' এর কাহিনী দ্বন্দ্বহীন হলেও যথেষ্ট কৌতূহল-উদ্দীপক, চরিত্র আদর্শায়িত, পূর্বনির্ধারিত, ভাষা মজলিশী ও কৌতুকাবহ, সময় মাত্র একরাত্রি। বিষয় ও মজলিশী পরিবেশের উপস্থাপনার কারণে ঔপন্যাসিক সংলাপময় নাট্যশৈলীর (dramatic manner) পরিচর্যা করেছেন। 'এ উপন্যাসের রূপকার্থ তুলনামূলকভাবে পরিপক্ক ও সর্বজনীন। ফ্যান্টাসিধর্মী হলেও এ-উপন্যাসের শৈলী ও প্রকৃতি রূপকীয় (allegorical) স্বপ্নালোকের ফ্রয়েডীয়

Dhaka University Institutional Repository

ব্যাকরণ এখানে অনুসৃত হয়নি। অস্বভাবী কল্পনার মধ্যে যুদ্ধ, সাম্রাজ্যবদী শোষণ, বর্ণবাদ, জাতিশোষণ, ও শ্রেণীশোষণ-পীড়িত সভ্যতার মুক্তি আকাঙ্ক্ষা এ উপন্যাসের শিল্প অভিপ্রায়ের মূলমন্ত্র।'[২৫] দু'ধরনের চরিত্র এসেছে এখানে,মৃতলোক থেকে আলাওল, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, হাজী মুহাম্মদ মহসীন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বার্নাড'শ, রঁমা রলাঁ ও লিও টলস্টয় প্রমুখ এবং জীবিত ও সমকালীন চরিত্রদের মধ্যে জুহা, জাউন, ফুয়া, সৈয়দ বোকজা, পাষন্ড, তেছোদীন ও মোয়াবখৃত। কল্পিত রাতে নিমন্ত্রিত অতিথিগণ সমবেত হয় যথাসময়ে। প্রথমে এসেছেন কবি আলাওল। উপন্যাসের শুরু হয়েছেন আলাওলের আত্মকাহিনীর বর্ণনা দিয়ে। আলাওল তাঁর পদ্মাবতীকাব্যে যে আত্মপরিচয় দিয়েছেন, ঔপন্যাসিক সেই আত্মকাহিনীর উপন্যাস ভাষ্য রচনা করেছেন এভাবে :

উন্মত্ত ঢেউ বজরার চারপাশে আছাড়ে আছড়ে পড়ে। মাল্লাগণ বদর বদর রবে দাঁড় ফেলে .. .. সন্দ্বীপ ছাড়িয়ে আমাদের বজরা তখন বঙ্গোপসাগরে পড়েছে। কৃষ্ণপক্ষ। চাঁদ কখন উঠবে, তার ঠিকানা নেই। সমস্ত রাত্রি হয়ত অন্ধকারে পাড়ি দিতে হবে। ভাবলাম, শামাদান জ্বেলে মালিক মুহাম্মদ জয়সীর পদুমাবৎ কাব্যখানা একবার পড়া যাক। অনেক কাল আগে পড়া। ওসতাদের কাছে তখন নতুন মাত্র হিন্দী জবান শিখছি। বেশ ভাল লেগেছিল। কিন্তু ভাষার উপর দখল ছিলনা। উৎসাহের তলা বেয়ে হয়ত আসল রস গড়িয়ে গিয়েছে। কিন্তু বেশ মজাদার। সিংহলের রাজকন্যা পদ্মাবতীকে বিস্মৃত হোতে পারিনি। আশ্চার্য ক্ষমতা করিব। মনে এই জাতীয় জোয়ার ভাটার খেলা। জনাব শামশের কুতুবের কাজে বাপজান বড় পেরেসান। তিনি অন্ধকারে চিন্তামগ্ন বা ইষৎ তন্দ্রা উপভোগ করছিলেন। সুমসাম আন্ধার..।'[২৬] শ্রোতা হিসেবে রমাঁ রলাঁ, বার্নাড'শও রয়েছেন। আলাওল তার কাহিনীতে হার্মাদের সঙ্গের লড়াইয়ের বর্ণনা করছিলেন, হেছোদীন বলে উঠেন- একালে হার্মাদদের জুলুমে লাখ লাখ মানুষ মৃত্যু বরণ করছে, হাজার হাজার মানুষ গৃহহীন হচ্ছে। তখন তিনি উত্তেজিত হয়ে তাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের কথা বলেন, হাজী মুহাম্মদ মহসীন খুবই সাদা সিধে ত্যাগী পুরুষ হিসেবে চিত্রিত। জুহার স্ত্রী জাইদুনের কাছে তিনি প্রসঙ্গক্রমে বলেছিলেন। মানব সেবাকেই তিনি শ্রেষ্ঠ ধর্ম মনে করতেন, তাই তিনি সেই পথই ধরেছিলেন। কিন্তু জাইদুন তাকে যুক্তি দিয়ে বলেন :

'আসলে আপানারা দারিদ্র্য পুষে রাখতে চান। আর তার জোরে দানবীর, দাতা ইত্যাদি নাম কেনার পক্ষপাতী। আপনারা আসলে মানব প্রেমিক নন। ... .. আপনি দুঃখ-দরিদ্র্য যেমন দেখে গেছেন, জনাব মহসীন, তার চেয়ে বিশেষ কিছু পরিবর্তন ঘটেনি। কারণ আপনাদের গোড়াটাই ছিল ভুল। দস্যুরাই এখনও দানবীর।'[২৭]

বস্তুত, দানশীলতা দিয়ে সমাজের দুঃখ-দারিদ্র্য দূর করা নয়, বরং দারিদ্র্যকে লালন করা হয়। দুঃখ-দারিদ্র্য দূর করতে হলে সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন দরকার। উপন্যাসে বার্নাড'শকে নিমন্ত্রণ করা হয় জুহার পুত্র ফুয়ার অনুরোধে। বার্নাড'শকে নিমন্ত্রণ করার ব্যাপারে জুহার আপত্তি ছিল, কারণ :

'বার্নাড'শকে নেমন্তন্ন করা অনেক ঝামেলা। এলে হয়তো ঝগড়া বেঁধে যাবে কারো না-কারো সঙ্গে। ঠোঁক কাটা ত। আর দুনিয়ার লেখকদের মধ্যে ঐ হচ্ছে নারদ। কাইজার একটা খুঁৎ পেলেই হয়। ঢুকবে সূঁচ, বেরুবে ফাল।'[২৮]

Dhaka University Institutional Repository

অবশ্য উপন্যাসে বার্নাড'শকে তেমন বির্তকে লিপ্ত হতে দেখা যায় না। বরং জুহার বন্ধু পাষন্ড ও স্বেচ্ছোদীন বার্নাড'শয়ের নানা দৃষ্টিভঙ্গির সমালোচনা করেন। মাইকেল মধুসূদন, বিদ্যাসাগরের সঙ্গে শ'র পরিচয় করিয়ে দিলে শ'যখন জানালেন তিনি বিদ্যাসাগরের নাম কখনো শুনেন নি, তখন মাইকেল তাঁকে কঠোর সমালোচনা করেন।

> 'আমার অর্জিনিতার তুলনা সে নিজে। A great humonist, Social refomer - a great Swordsman, মানুষ হিসেবে কত বানার্ড'শ বিদ্যাসাগরের চটির সুখতলায় ঢুকে যেতে পারে।'[২৯]

বানার্ড'শ তখনো নির্বিকার অনুত্তেজিত। সৈয়দ বোকজা তাঁকে যখন ইউরোপের ভাঁড় - 'A clown may not know a noble man' ভাঁড় মহৎ ব্যক্তিকে চিনতে নাও পারেন। বলেন, তখন শ' রেগে ফেটে পড়েন এবং বক্তব্য প্রত্যাহর করতে বলেন। আমন্ত্রিত অতিথিদের পানাহারের প্রথম টোস্টে সাম্রাজ্যবাদের ধ্বংস কামনা করে শ' দরাজ কণ্ঠে বলেন - 'To the dying soul of the world imperiatism.' সাম্রাজ্যবাদের মুমূর্ষু আত্মার ধ্বংস কামনা করে বলেন :

> 'মাছা ডাঙ্গায় তোলায় বেশী আনন্দ নেই। আনন্দ হচ্ছে গেঁথে খেলানোর মধ্যে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষে থেকে আমি এই Gold digger Swine-দের মৃত্যু কামনা করেছি।'[৩০]

উপন্যাসে রমাঁ রলাঁ'র চরিত্র শান্ত মহিমান্বিত। আলাওল যখন এ যুগের হার্মাদদের ধ্বংস করার জন্য আকুলতা প্রকাশ করেন, তখন রঁমা রলাঁ বলেন - 'There are, indeed great artists who express themselves. But greatest of them are thos whose hearts beat for all men.' রমাঁ রলাঁকে সৈয়দ বোকজা তাই ইউরোপের আত্মা বলে আখ্যায়িত করেন। এভাবে মনীষীদের তর্কবিতর্কে জুহার গৃহ আড্ডায় মুখরিত হয়ে ওঠে রাত্রি। তাদের তর্ক-বিতর্কের মাঝখানে উপস্থিত হন রবীন্দ্রনাথ এবং লিও টলেস্টয়। এঁরা আমন্ত্রিত অতিথি ছিলেন না যদিও তবু এঁদের উপস্থিতিতে আড্ডা আরো প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে এবং এরাঁ বিশ্ব ভ্রাতৃত্ববোধ মানবিকতার প্রতি দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। রাত্রি শেষে পানাহারের পর বিদায় লগ্নে সমবেত মনীষীদের কণ্ঠে উচ্চারিত সংলাপে তাদের আন্তরিক কামনায় স্পষ্ট হয় বিশ্বশান্তি, সাম্রাজ্যবাদ ও যুদ্ধবিরোধী, মানবিক প্রত্যয় :

> "মানুষের বিশ্বভ্রাতৃত্ব অক্ষয় হোক।"
>
> "ধ্বংস হোক, সাম্রাজ্যবাদীগণ ও তাদের অনুচরেরা ধ্বংস হোক।"
>
> "মানুষের নির্বোধিতম সংগঠন হিসেবে ধ্বংস হোক যুদ্ধ।"
>
> "সুখীতর, আরো সমৃদ্ধতর হোক আগামী দিনের পৃথিবী।"[৩১]

'সমাগম' উপন্যাসে মৃতলোক থেকে আগত কল্পিত আত্মার এই তর্কবিতর্ক আপাতদৃষ্টিতে উদ্ভট, সঙ্গতিবিহীন মনে হলেও এই জ্ঞানগর্ভ কথোপকথন অর্থহীন সংলাপ মাত্র নয়। এঁদের এই জ্ঞানগর্ভ আলোচনায় সমকালীন বিশ্ব সংকটের স্বরূপ যেমন নির্দেশিত হয়েছে, তেমনি এর সমাধানের ইঙ্গিতও ধ্বনিত হয়েছে। মৃত অথচ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ নিজ নিজ জীবনাদর্শ ও দৃষ্টি ভঙ্গিগত পার্থক্য সত্ত্বেও উপন্যাসে নিগূঢ় ঐক্যসূত্রে বিদ্যমান এঁরা সবাই সাম্রাজ্যবাদ যুদ্ধ, শোষণ,

Dhaka University Institutional Repository

নির্যাতনের বিরোধী, শান্তি ও মানবিক কল্যাণে একমত। শওকত ওসমান এভাবে ফ্যান্টাসির আশ্রয়ে রূপক ও প্রতীকের সংকেতময় আবহে সমাজ ও সমকালের সংকটকে শিল্প অভিপ্রায়ে ব্যক্ত করেছেন।

'সমাগম' উপন্যাসটি চারটি পালায় বিভক্ত। প্রথম পালায় প্রয়াত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের আগমনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করা হয়েছে। দ্বিতীয় পালায় আলাওল, হাজী মুহাম্মদ মহসীন, বার্নার্ড'শ, রমাঁ রলাঁ, মাইকেল মধুসূদন দত্তকে জুহা ও তার বন্ধুদের মুখোমুখি করা হয়েছে। তৃতীয় পালায় বিদ্যাসাগর এসে যোগ দিয়েছেন এবং জুহার স্ত্রী জাইদুন সক্রিয় চরিত্র হিসেবে উপস্থিত হয়েছেন। চতুর্থ পালায় এক্সটেমপোর বা ক্ষণোক্ত নাটকের দুটি দৃশ্য অভিনীত সমবেত মনীষীদের বিদায়ের আগে উপস্থিত হন রবীন্দ্রনাথ ও টলস্টয় এবং কাহিনীর শেষ হয়েছে মনীষীদের আন্তরিক অভিপ্রায় ঘোষণার মধ্য দিয়ে। কাহিনীর উপস্থাপনা যেমন কৌতূহল উদ্দীপক, তেমনি আড্ডার আবহে, তর্কবিতর্কে, সংলাপে যথেষ্ট কৌতুকরস পরিবেশিত।

'আলী সহকারী আরি-যুক পাটোয়ারীর সঙ্গে আমাদের পরিচয় আছে। কিন্তু এই নামের এমনই বিদ্‌ঘুটে লেজুড়। তাই কিঞ্চিৎ তফসীরের প্রয়োজন আছে। অবশ্যি স্বয়ং মল্লীনাথ হয়ত বিশপৃষ্ঠা ফেঁদে বসতেন। এযুগের টীকাকার অত লম্বা দড়ি ব্যবহারে অপারগ। .. .. টেবিলে ঢাকা ঠান্ডা ভাত, কিন্তু গরম তরকারী অর্থাৎ তাতানো তরকারী প্রতরিত্রেই আলি পরিবেশন করত। জুহা তাই ঠাট্টাচ্ছলে বলত, 'আলি সহ-কারী।' ইংরেজী 'কারী" বাংলা তরকারী মনস্তত্ত্বের অনুসঙ্গ নিয়মে আলী- সহ কারী। শেষে আলি সহকারী।'[৩২] শুধু আলীর নাম নয়,জুহার অন্যান্য বন্ধুদের নামকরণে যথেষ্ট হাসির উদ্রেক করে। যেমন, সৈয়দ বোকজার নাম সম্পর্কে :

> সৈয়দ বোকজার আসল নাম কেউ জানেনা। যে প্রোফাইল দেখলে আপনার কাছে নিম্নহিমভাপ শরৎকালের কথা মনে হবে, সৈয়দ বোকজা তেমনই প্রোফাইলের অধিকারী। .. .. এহেন সৈয়দ জাদা একবার প্রাণ-প্রাচুর্যের গুঁতানিতে দু'ঘন্টায় দশ বোতল বিয়ার, পাঁচ পেগ হুইস্কি সাবড়ে দিয়েছিলেন। বন্ধুরা বললে- হে নরপুঙ্গব, তুমি সত্যই বোতল-কোতল-জ্ঞান। সেই থেকে সংক্ষেপে সৈয়দ বোকজা, খ্যাত বা অখ্যাত।'[৩৩]

অর্থাৎ সংক্ষেপে, সৈয়দ বোতল-কোতল-জ্ঞান= সৈয়দ বোকজা। অনুরূপ ভাবে প্রাণ শশী আঢ্য=পাষণ্ড, তেরছা চোখ উদ্দীন=তেছোদ্দীন, মোয়ায়েদ বখ্‌ত=মোয়াবক্‌। এবং তাদের বাকবৈদগ্ধ্যের মধ্যেও যথেষ্ট হাস্যপরিহাস রয়েছে। যেমন :

> '-এই যে পাষণ্ড, তুমিও এখানে, বলতে বলতে জাইদুন ঘরে ঢুকল।
> -নমস্কার বৌদি। দেখা হলেই গাল দেবেন, এটি (জুহার দিকে আঙুল) কোন কান্ড ?
> -এটি । বেশীর ভাগই pro-কান্ড আর অন্যথায় কুষ্মান্ড। এই দ্যাখো না কি কান্ড বাধিয়ে বসেছে।'[৩৪]

'সমাগম' উপন্যাসে যেসব চরিত্রকে উপস্থিত করা হয়েছে, তাদের স্থান ও কালগত পার্থক্য রয়েছে। যেমন, আলাওল সতেরো শতকের মধ্যভাগের কবি, হাজী মুহাম্মদ মহসীন (১৭৩২-১৮১২), বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১), মধুসূদন

Dhaka University Institutional Repository

(১৮২৪-১৮৭৩) রবীন্দ্রনাথ (১৮৬১-১৯৪১) এরা সবাই এই উপমহাদেশের সমাজিক ও সাহিত্যের জগতে উজ্জ্বল নক্ষত্র। অপরদিকে টলস্টয় (১৮২৮-১৯১০) (রাশিয়া) জর্জ বার্নাড'শ (১৮৫৬-১৯৫০) (আইরিশ) এবং রমাঁ রলাঁ (১৮৬১-১৯৪৪) (পারস্য) প্রমুখ তাঁদের স্থান, কালগত ব্যবধান, দৃষ্টিভঙ্গির বৈপরিত্য সত্ত্বেও উপন্যাসে তাদের তর্কবিতর্কে সংলাপে অতীত ও বর্তমানের সময়গত সীমারেখা বিলুপ্ত হয়ে যায়। সমাগত মনীষীদের রচিত গ্রন্থ থেকে অনেক উদ্ধৃতি ব্যবহারের ফলে তাদের জীবনদৃষ্টি ও চরিত্র বাস্তব হয়ে ওঠেছে এবং তাদের সমকালীন যুগমানস ও ঐতিহ্যের প্রসঙ্গ উল্লেখ করার চরিত্রগুলো অধিক জীবন্ত ও বিশ্বাসযোগ্যতা লাভ করেছে। সর্বোপরি বলা যায় 'সমাগম' নাট্যাঙ্গিক বিন্যাস, বৈঠকীঢঙ্গে উপস্থাপিত শওকত ওসমানের নিরীক্ষাধর্মী এক শিল্প-অভিপ্রায়। 'এ-উপন্যাসে রূপকাধারে উচ্চারিত হয়েছে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে শোষণের বিরুদ্ধে, যুদ্ধের বিরুদ্ধে, চরম ঘৃণা ও ক্ষোভ ; আর এর বিপরীতে ব্যক্ত হয়েছে বিশ্বভ্রাতৃত্ব শোষণহীন মানবতা ও বিশ্বশান্তির প্রতি এক উদগ্র কামনা যা সমগ্র বিশ্ব ও মানবজাতির প্রকৃত কল্যাণ বয়ে আনতে সক্ষম।'[৩৫] বিষয় বস্তুর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ সংলাপের অন্তর্বয়নে সৃজিত 'সমাগম' বাংলাদেশের উপন্যাস-সাহিত্যে ফ্যান্টাসি শিল্পশৈলীর নিঃসঙ্গ উদাহরণ।

৩.

'সমাগম' উপন্যাসের ভাষা বিষয় উপযোগী এবং চরিত্রের মানস্ অভিব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। সংলাপে বিদেশি শব্দের যথেষ্ট ব্যবহার রয়েছে বিশেষত আরবি, ফারসি এবং ইংরেজি শব্দ ও বাক্যের প্রয়োগ এ উপন্যাসের অন্তর্জাতিক পটভূমির সঙ্গে যুক্তিযুক্ত বৈঠকী বা আড্ডার ভাষায় পরিহাস প্রিয়তা থাকে। এ উপন্যাসের ভাষাও তার ব্যতিক্রম নয়। যেমন :

সাহকবি-আমি মুসলমানের ছেলে। আমি (Gin) জ্বী-ভক্ত।
পাষণ্ড- আমি হিন্দুর সন্তান (Rum) রাম- ভক্ত।
মোয়াবক - তৌবাস্তাগ ফেরুল্লা .. .. তৌবাস্তাগ ফেরুল্লা .. ..
জুহা - আমি কবি রসিক Vermouth ভাঁড়মুৎ পিয়াসী
মোয়াকে - তৌবাস্তাগ ফের .. ..
পাষণ্ড - ভাঁড়মুতে শেষ পর্যন্ত .. .. (সমাগম/পৃ.২৩)

বাক্যের রূপবন্ধনে কৌতুকরসের জন্য কখনো আরবি, ফারসি, উর্দু, ইংরেজি শব্দের সহজ ব্যবহার লক্ষনীয় :

> "বাবা, ইংরেজী-বাংলা জবানে এমন মাখামাখি আছে বলেইত কমনওয়েলথী গাঁটছড়া এ্যায়সা মজবুত।' (সমাগম/পৃ.২)

বস্তুত, 'সমাগম' উপন্যাসের ভাষা সম্পর্কে উদ্ধৃত বাক্যের ভাবার্থই যথার্থ। এখানে 'জবানে' হিন্দি, 'এ্যায়সা' উর্দু শব্দ, 'মজবুত' ফারসি, 'কমনওয়েলথী' (ই-প্রত্যয় ব্যবহার করা হয়েছে বাংলা শব্দের মত) ইংরেজি শব্দগুলোর অর্থ যথাক্রমে 'জবানে' কথায় বা ভাষায়, 'কমনওয়েলথ' একটি সংস্থার নাম ; সাধারণ মঙ্গলের জন্য রাজনৈতিকভাবে সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জ 'এ্যায়সা' এরকম, 'মজবুত' সুদৃঢ়। বিভিন্ন ভাষার শব্দের স্বচ্ছন্দে ব্যবহারে বাক্যের রূপবন্ধ গঠিত।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যনির্দেশ ও টীকা

১. আহমদ কবির, রবীন্দ্রকাব্য;'উপমা ও প্রতীক,' দ্বিতীয় প্রকাশ, ১৯৮৬, ঢাকা, মুক্তধারা, পৃ.৯৯
২. সৈয়দ আকরম হোসেন,*প্রসঙ্গ:বাংলা কথাসাহিত্য*,১৯৯৭,ঢাকা,মাওলা ব্রাদার্স,পৃ.১০৪-১০৫
৩. রফিকউল্লাহ খান, *বাংলাদেশের উপন্যাস :বিষয় ও শিল্পরূপ*,১৯৯৭,ঢাকা,বাংলা একাডেমী,পৃ.২০৬
৪. *প্রসঙ্গ:বাংলা কথাসাহিত্য*,পূর্বোক্ত,পৃ.১০৬
৫. শিরীন আখতার, *বাংলাদেশের তিনজন ঔপন্যাসিক*, ১৯৯৩,ঢাকা,বাংলা একাডেমী, পৃ.৭৪
৬. ক্রীতদাসের হাসি, ৭ম সংস্করণ, ১৯৮৩, ঢাকা, মুক্তধারা, পৃ.৯
৭. ক্রীতদাসের হাসি, পূর্বোক্ত, পৃ.১৯ .
৮. ক্রীতদাসের হাসি, পূর্বোক্ত, পৃ.২০
৯. ক্রীতদাসের হাসি, পূর্বোক্ত, পৃ.১২১
১০. C.S.Lewis, *The allegory of love*, Oxford University, London, 1979, P.48
১১. W.B.Yeats, *Ideas of good and Evil,* London and stratford-upon-Avon 1914, first edition 1903.P.158
১২. সৈয়দ আজিজুল হক, *শওকত ওসমানের রূপক উপন্যাস,* সাহিত্য পত্রিকা উনত্রিংশ বর্ষ,তৃতীয় সংখ্যা, আষাঢ় ১৩৯৩, ঢাকা, বিশ্ববিদ্যালয়,পৃ. ২৫১
১৩. ক্রীতদাসের হাসি, পূর্বোক্ত, পৃ.১০২
১৪. সৈয়দ আজিজুল হক, পূর্বোক্ত, পৃ.২৪৯
১৫. ক্রীতদাসের হাসি, পূর্বোক্ত, পৃ.৪৩
১৬. *বাংলাদেশের তিনজন ঔপন্যাসিক*, পূর্বোক্ত, পৃ.১৩৩, এ উদ্ধৃতি সম্পর্কে তিনি লিখেছেন- বর্তমান গবেষকের কাছে শওকত ওসমানের ব্যক্তিগত পত্র-২,তারিখ-১২-২-৯৯
১৭. *বাংলাদেশের উপন্যাস :বিষয় ও শিল্পরূপ*,পূর্বোক্ত,পৃ.২০৭
১৮. শওকত ওসমান, *রাজা উপাখ্যান*,১৩৭৭, ঢাকা, মাওলা ব্রাদার্স, পৃ.৩১
১৯. *রাজা উপাখ্যান,* পূর্বোক্ত, পৃ.৮৭
২০. *প্রসঙ্গ:বাংলা কথাসাহিত্য*,পূর্বোক্ত,পৃ.১১৬
২১. *রাজা উপাখ্যান,* পূর্বোক্ত, পৃ.২৩
২২. *রাজা উপাখ্যান,* পূর্বোক্ত, পৃ.১২৫
২৩. *রাজা উপাখ্যান,* পূর্বোক্ত, পৃ.১১৬
২৪. *রাজা উপাখ্যান,* পূর্বোক্ত, পৃ.১৬
২৫. *বাংলাদেশের উপন্যাস :বিষয় ও শিল্পরূপ*,পূর্বোক্ত,পৃ.২০৮
২৬. শওকত ওসমান, *সমাগম,* ১৩৭৪বঙ্গাব্দ, ঢাকা, কথাকলি, পৃ. ২৯-৩১
২৭. *সমাগম,* পূর্বোক্ত,পৃ. ১০৮-৯
২৮. *সমাগম,* পূর্বোক্ত,পৃ. ১১
২৯. *সমাগম,* পূর্বোক্ত,পৃ. ১১
৩০. *সমাগম,* পূর্বোক্ত,পৃ. ৬২
৩১. *সমাগম,* পূর্বোক্ত,পৃ. ১৪৫-৪৬
৩২. *সমাগম,* পূর্বোক্ত,পৃ. ১-২
৩৩. *সমাগম,* পূর্বোক্ত,পৃ. ১৮
৩৪. *সমাগম,* পূর্বোক্ত,পৃ. ১৫
৩৫. সৈয়দ আজিজুল হক,পূর্বোক্ত,পৃ.২৫৬-৫৭

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায় : আঞ্চলিক উপন্যাসের শিল্পশৈলী

ক. সারেং বৌ
খ. কর্ণফুলী

Dhaka University Institutional Repository

আঞ্চলিক উপন্যাসের শিল্পশৈলী

উপন্যাসের নানা আঙ্গিক ও বিষয়-বৈচিত্র্যের কথা বিবেচনা করে সমালোচকগণ উপন্যাসকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করেন। সমাজিক উপন্যাস, রাজনৈতিক উপন্যাস, ঐতিহাসিক উপন্যাস, মনস্তত্ত্বমূলক উপন্যাস, আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস, ইত্যাদি অভিধায় অভিসিক্ত হয়েছে বিশেষ বিশেষ ধরনের উপন্যাস। আঞ্চলিক উপন্যাস ও উপন্যাসের এমনি একটি শাখা। আঞ্চলিক উপন্যাসের শিল্পশৈলীর পৃথক ধ্রুব স্বাতন্ত্র্য রয়েছে। Novel of the local color বা Novel of the soil নামে অভিহিত যে সব উপন্যাস, তা মূলত অঞ্চল-বিশেষের ওরে রঞ্জিত। আঞ্চলিক উপন্যাসে-নাম থেকেই স্পষ্ট হয়, অঞ্চলবিশেষের জীবনাশ্রয়ী এক বিশেষ শিল্পশৈলীর উপন্যাস। অঞ্চল বলতে কোনো নির্দিষ্ট ভূখন্ডের জলবায়ু, মাটি, প্রকৃতিক পরিবেশ, যা সেখানকার জনজীবনকে নানাভাবে প্রভাবিত করে তাকেই বোঝানো হয় সেই ভূখন্ডের অধিবাসীদের দৈহিক গঠন, মানসিক বিন্যাস, ভাষার ব্যবহার বিশেষ উচ্চারণ ভঙ্গি, সামাজিক নিয়মনীতি, বিশ্বাস, সংস্কার, পোষাক-পরিচ্ছদ, জীবনযাত্রার অকৃত্রিম রূপ বোঝায়। ভাষা-সংলাপে স্থানীয় প্রবাদ-প্রবচন এমনকি উচ্চারণ ভঙ্গিকে এমনভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়, যাতে সেই অঞ্চলের পরিশেষ-ধৃত পটভূমি থেকে চরিত্রগুলো কোনো ক্রমেই পৃথক করা যায় না। সেই অঞ্চলে বসবাসকারী শিষ্টজনের নয়, অপেক্ষাকৃত নিম্নশ্রেণী ও কৌম-সামাজের জীবনের মধ্যেই আঞ্চলিকতার রূপ গাঢ়ভাবে পাওয়া যায়। আমরা বলতে পারি, 'কোন ঔপন্যাসিক যখন কোন বিশেষ দেশাঞ্চলের মানুষের জীবনযাত্রা, আচার-ব্যবহার, নিয়মনীতি, সমাজ-প্রেক্ষিত ও প্রাকৃতিক পরিবেশকে এমনভাবে তাঁর রচনায় রূপ দেন যাতে ঐ অঞ্চল যেন সেখানকার মানুষদের সঙ্গে অন্তরঙ্গ আত্মিক যোগে একটি স্বতন্ত্র চরিত্র হয়ে ওঠে এবং সেখানকার জনজীবনে তার সর্বাত্মক প্রভাবের মধ্য দিয়েও সর্বজনীন রসাবেদনে পৌঁছায়- তখনই তাঁর রচনাকে 'আঞ্চলিক উপন্যাস' বলা যেতে পারে।'[১] বাংলা উপন্যঅসে শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় এধরনের রচনার ধারাটি সূচনা করেন।'[২] উত্তরকালে তারশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮৯৮-১৯৭১) 'গণদেবতা' 'হাঁসুলীবাঁকের উপকথা' ; বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮৯৪-১৯৫০) 'আরণ্যক' 'ইছামতি' মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৯০৮-১৯৫৬) 'পদ্মানদীর মাঝি' ; অদ্বৈত মল্লবর্মণ (১৯১৪-১৯৫১) 'তিতাস একটি নদীর নাম' ; সতীনাথ ভাদুড়ীর (১৯০৬-৬৫) 'ঢোঁড়াই চরিত মানস' প্রভৃতি উপন্যাস বাংলা আঞ্চলিক উপন্যাসের ধারাকে আরো সমৃদ্ধ করেছে।

উনিশ'শ সাতচল্লিশে ভারত বিভাগের পর বাংলাদেশের ঔপন্যাসিকরা বাংলা উপন্যাসের এই প্রবহমান ঐতিহ্যকে অঙ্গিকার করে আঞ্চলিক উপন্যাস রচনায় সকল অবদান রাখেন। শহীদুল্লা কায়সারের (১৯২৫-১৯৭১) 'সারেং বৌ' (১৯৬২), আলাউদ্দীন আল আজাদের (জন্ম ১৯৩২) 'কর্ণফুলী' আঞ্চলিক উপন্যাসের উজ্জ্বল উদাহরণ। আমাদের আলোচ্য কালপর্বের (১৯৪৭-১৯৭১) মধ্যে প্রকাশিত উল্লিখিত দু'টি উপন্যাসের আলোচনা এখানে উপস্থিত করছি।

Dhaka University Institutional Repository

সারেং বৌ

প্রাকৃতিক পরিবেশধৃত অঞ্চল বিশেষের বাস্তবতা ও রোমান্টিক দৃষ্টির সহজ সমন্বয়ে শহীদুল্লা কায়সার (১৯২৬-১৯৭১) রচনা করেন তাঁর 'সারেং বৌ' (১৯৬২) উপন্যাস। বাস্তবতা বা 'রিয়েলেটি' বিষয়টি আধুনিক সাহিত্যে বেশ গুরুত্ব পেয়ে থাকে, বিশেষত কার্ল মার্কস (১৮১৮-৮৩) ও ফ্রিডরিশ এঙ্গেলস (১৮২০-৯৫) এর দ্বান্দ্বিকবস্তুবাদ প্রবর্তনের পর থেকে। মার্কসীয় চিন্তাধারা অনুযায়ী মানুষের ভাগ্য বা নিয়তি নিয়ন্ত্রিত হয়, তার অর্থনৈতিক পরিস্থিতি দ্বারা। সমাজের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড তথা বস্তুর উৎপাদন ব্যবস্থা, বন্টন ও বিপণন পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠে বাস্তব অবস্থা। সমাজ ও ধর্ম প্রাচীন। কখনো কখনো সামাজিক নিয়ম ও ধর্মীয় বিধিও মানুষের ভাগ্যকে নিয়ন্ত্রণ করে। মানুষ নিত্য যে সামাজিক সমস্যাগুলির সম্মুখীন হয়, তার মূলে রয়েছে অর্থনৈতিক সমস্যা। এই সমস্যায় যুগে যুগে ভুলুণ্ঠিত হয়েছে মানবিকতা। কিন্তু বুর্জোয়া ব্যবস্থায় এর সমাধান নেই। ফলে একটি দ্বান্দ্বিক অবস্থা বিরাজ করছে আমাদের মত উন্নয়নশীল দেশগুলোতে। 'সারেং বৌ' উপন্যাসে বিধৃত সমাজ ও পটভূমির বিবেচনায় উপরোক্ত কথাগুলো খুব প্রাসঙ্গিক। 'জীবন সংগঠন ও অস্তিত্ব অভীসার প্রশ্নে বিভাগোত্তর দ্বিতীয় দশকে বাংলাদেশের অঞ্চলভিত্তিক আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক জীবনবলয়েও রূপান্তরের সূত্রপাত ঘটে। গঠনোম্মুখ সমাজের নগরায়ণ ও যন্ত্রায়ণের প্রভাব বৃহত্তর গ্রামীণ জীবনে যে বিক্রিয়ার সৃষ্টি করে, আঞ্চলিক জীবনেও তার প্রতিক্রিয়ায় জাগে আলোড়ন। এ-পর্যায়ে আঞ্চলিক জীবনোপাকরণ অবলম্বন করে যাঁরা উপন্যাস রচনা করেছেন, বাস্তবতার প্রতি দায়বদ্ধতার প্রশ্নে তাদের কেউই সর্বাংশে সাফল্য লাভ করতে পারেনি। বরং জীবনানুভবের রোম্যান্টিকতা আঞ্চলিক জীবনের বস্তুসত্যকেও কখনো কখনো গ্রাস করতে উদ্যত হয়েছে। কিন্তু শিল্পীচৈতন্যের শেকড় বিশেষ ভূখন্ডের মৃত্তিকাগভীরে প্রোথিত থাকায়, রোম্যান্টিতাও অর্জন করেছে নতুন মাত্রা। এ-প্রসঙ্গে শহীদুল্লা কায়সারের (১৯২৬-১৯৭১) সারেং বৌ (১৯৬২) উপন্যাসের নাম সর্বাগ্রে বিবেচ্য।'[৩] এ উপন্যাসে বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব সমুদ্র উপকূলবর্তী বিস্তীর্ণ অঞ্চলের মানুষের জীবন ও জীবীকার সংগ্রাম এবং বেঁচে থাকার নিরন্তর প্রচেষ্টার শব্দরূপ 'সারেং বৌ' উপন্যাস। বিধৃত সমাজ, অঞ্চল বিশেষের ভূ-খন্ডগত পরিচয়, প্রাকৃতিক পরিবেশ,ভাষা সংস্কার, প্রবাদ-প্রবচন ইত্যাদির ব্যবহার 'সারেং বৌ' উপন্যাসকে আঞ্চলিক উপন্যাসের শিল্পমাত্রায় উন্নীত করেছে। আঞ্চলিক উপন্যাসে প্রথম বৈশিষ্ট্য 'কোনো নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অঞ্চলের নিবিড় এবং অখন্ড পরিচয় দান'[৪] অর্থাৎ চরিত্রগুলো এমনভাবে বিধৃত যে সেই অঞ্চলের ক্ষেত্রভূমির শস্যরূপে আত্মপ্রকাশ করে এবং কোনোক্রমে সেই ক্ষেত্রভূমি থেকে তাকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। দ্বিতীয়ত ভাষা-সংলাপে, স্থানীয় প্রবাদ-প্রবচন এমনকি উচ্চারণভঙ্গিতে সাধ্যমত আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তোলা।[৪] অর্থাৎ ভাষা ও উচ্চারণভঙ্গিতে অঞ্চলবিশেষের জীবনবেদ এমনভাবে সঞ্চারিত থাকে যে, সেই অঞ্চলের ভাষার মধ্য দিয়ে পরিবেশধৃত মানুষের অন্তর-অবলোকন করা সম্ভব। স্থানীয় প্রবাদ-প্রবচনে সেই অঞ্চল বিশেষের সামাজিক রীতিনীতি, সংস্কার, ধর্মবোধ, আচার-অনুষ্ঠানের সমূহ পরিচয় স্পষ্ট হয়। উল্লিখিত বৈশিষ্টের আলোকে বিচার করলে 'সারেং বৌ' আঞ্চলিক উপন্যাসের অনন্য শিল্পপ্রতিমা।

২.

অঞ্চল বিশেষের সামাজিক জীবনাপ্যাটার্ন অনুসারে 'সারেং বৌ' উপন্যাসের প্লটবিন্যাস্ত। গ্রামীণ পরিবেশধৃত চরিত্রসমূহ বাস্তব ও জীবন্ত। ভাষা-সংলাপ ও প্রবাদ-প্রবচনে স্থানীয় জীবনধারার অকৃত্রিম ও বিশ্বাসযোগ্য পরিচয়

Dhaka University Institutional Repository

পাওয়া যায়। ঔপন্যাসিকের সর্বজ্ঞদৃষ্টিকোণের পরিচর্যায় রচিত 'সারেং বৌ' উপন্যাস গঠননৈপুণ্যে অনন্য। বাংলাদেশের সমুদ্রতীরবর্তী অঞ্চল বিশেষের প্রতি শহীদুল্লা কায়সার একজন নৃতাত্ত্বিক ও সমাজবিজ্ঞানীর দৃষ্টি দিয়ে তাকিয়েছেন। নবিনতুনের উপর সমাজ আরোপিত দুঃখকে তিনি যেমন অকারণে বাড়িয়ে দেখেন নি, তেমনি সর্বোচ্চ প্রলোভনের কাছে তিনি বাস্তবকে বিসর্জন দেন নি। 'সারেং বৌ' উপন্যাসের কাহিনীগ্রন্থন নিটোল, পরিণামে জীবনমুখী। বিরুদ্ধ সমাজ ও বিধ্বংসী প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে জয় যুক্ত হয়েছে কদম সারেং ও নবিতুন। কাহিনীর বাস্তবসম্মত উপস্থাপনা, অভিনব উপকরণের দক্ষ ব্যবহারই 'সারেং বৌ' উপন্যাসকে বাংলাদেশের উপন্যাসের ধারায় ব্যতিক্রমী বিশিষ্টতা দান করেছে।

'সারেং বৌ' উপন্যাসটি তেরো অধ্যায়ে বিভক্ত। কাহিনীর শুরুতেই ঔপন্যাসিক একটি সুনির্দিষ্ট রূপরেখা নির্দেশ করেছেন :

> 'চারিদিকে পানি। মাঝখানে ডাঙ্গা। তবু একে দ্বীপ বলেনা কেউ। বলে গ্রাম। কেননা এটা পানিরই দেশ। গ্রামটাকে বলে বামনছাড়ি। নদীটাকে বলে কয়াল। বামনছাড়ি যেমন গ্রাম হয়েও গ্রাম নয়, জলঘেরা ভূখণ্ড, তেমন কয়ালও মামুলি নদী নয়। কয়াল সমুদ্র মোহনায় উন্মত্ত জলোচ্ছ্বাস।.. .. শুধু বামনছাড়ি নয়, সাগর আর মোহনার তীর ঘেঁষা আরও কত গ্রাম কদুরখিল, পিয়াল গাছা, মাদার টেক। এসব গ্রামে যাদের বাস বিচিত্র মানুষ ওরা। বিচিত্র ওদের জীবিকা। ওদেরে আছে জমি। সে জমিতে ধান হয়। .. .. তবু ওরা সমুদ্রের মানুষ। সমুদ্র ওদের জীবিকা, সমুদ্র ওদের জীবনের গান। সাগর উর্মি ওদের কল্লোল গীত। সাগরের বুকে ডিঙ্গি ভাসিয়ে ওরা মাছ ধরে। সাগরের তরঙ্গে চড়ে ওরা চলে যায় দূরদেশে। ওরা নাবিক।'[৬]

নদীবিধৌত ভৌগোলিক অঞ্চলের বামনছাড়ি গ্রামের মজল সারেংয়ের পুত্র কদম সারেংয়ের স্ত্রী নবিতুনকে কেন্দ্র করে কাহিনীর পল্লবিত বিস্তার। অস্তিত্বের সংগ্রামে, জীবিকার সন্ধানে কদম সারেং যায় সমুদ্রে, জাহাজে ভেসে দূরদেশে। ঘরে তার উদ্ভিন্নযৌবনা স্ত্রী নবিতুন, একমাত্র মেয়ে আট বছরের আক্কিক্। নবিতুনের উঠোনে পাশেই একটা বড়ই গাছ। যে গাছে ফুল ধরে ফল হয়, বছরের পর বছর চলে যায়, কদম সারেং বাড়ি ফিরে না। লোকে বলে :

> 'যে দেয় কয়াল পাড়ি
> বৌ তার দুপুরের রাঁড়ি।'[৭]

একমাত্র মেয়ে আক্কিকুকে নিয়ে নবিতুনের নিত্য বাঁচার লড়াই। প্রতিদিন তাকে অন্নসংস্থানের জন্য সংগ্রাম করতে হয়। ঝি-এর কাজ নেয় চৌধুরী বাড়িতে। গ্রামের বাড়ি বাড়ি ঘুরে ধান ভানার কাজ নেয়। কিন্তু যন্ত্রসভ্যতার উদ্যত থাবা নবিতুনের অস্তিত্ব সংগ্রামের সেই অবলম্বন টুকুও কেড়ে নেয় :

> 'সেই যে কোরা নিয়ে গেল মুন্সী বাড়ি এখনো ফেরেনা কেন আককি ? বুঝি আককিকে দেখবার জন্যই উঠোন পেরিয়ে রাস্তাটার উপর একবার চোখ বুলিয়ে এল নবিতুন। তারপর কাঁড়া চালগুলো ঝাড়ল, বাছল, নিজের মেহনতের পাওনা একসের চাল পৃথক করে রাখল। বাকী চাল কোরায় তুলল। খুদ আর তুষ আলাদা আলাদা মালসায় পুরে নিল। যেন মস্তবড় অপরাধ করেছে তেমনি

Dhaka University Institutional Repository

কুণ্ঠিত পায়ে কাছে এসে দাঁড়ায় আক্কি। ওর হাতের শূন্য কোরাটার দিকে তাকিয়ে যেন ছাঁৎ করে ওঠে নবিতুনের বুকটা। কিরে, ধান আনলিনা ! শুধায় নবিতুন। না, ভুইয়ার হাটে কল বসেছে। এখন থেকে সেই কলেই নাকি সবাই ধান ভানবে। মায়ের মুখের তাকিয়ে থেমে যায় আক্কি।'[৮]

অস্তিত্বের সংগ্রামে নবিতুন আরো সংকটে পড়ে যায়। নবিতুনের এই দারিদ্র্য অবস্থায় সুযোগ নেয় লুন্দর শেখ। কদম সারেং নবিতুনের জন্য পাঠানো চিঠি, টাকা সব পোস্টমাস্টারের সহায়তায় গোপন করে রাখে লুন্দর শেখ। নজর দেয় নবিতুনের শরীরের প্রতি। কু-প্রস্তাব দিয়ে পাঠায় গুজাবুড়িকে, গুজাবুড়ি, লুন্দর শেখের প্রস্তাব নিয়ে এলে নবিতুন 'পিঁড়া' ছুড়ে মারে। গুজাবুড়ি ব্যর্থ হলে লুন্দর শেখ নিজেই সরাসরি নবিতুনকে পাওয়ার চেষ্টা করে। পশ্চিম হিস্যার শরবতির দাদু হাঁকে নবিতুনকে, প্রথমে আক্কিকে পাঠালেও শেষে নিজেই যেতে হয়। লুন্দর শেখের দেয়া টাকাগুলোকে নবিতুন আক্কির হাত থেকে নিয়ে ছুঁড়ে মারে। না, নবিতুন লুন্দর শেখের টাকার কাছে সত্তিত্ব বিসর্জন দিতে পারে না। লুন্দর শেখ ক্ষেপে গিয়ে বলে :

'তা এখন ওর কদমেরই বা দরকার কি, টাকারই বা কি ঠেকা ? 'লাং-এর তো আর অভাব নেই, টাকারও কমতি নেই।'[৯]

চৌধুরী বাড়িতে কাজ করতে গিয়েও সে শঙ্কিত থাকে, ছোট চৌধুরীর কথা চাউনি নবিতুনের ভালো লাগে না। তবু কাজটা ছেড়ে দিতে পারেনা। একাজটা ছেড়ে দিলে সে খাবে কি ? মেয়ে আক্কিকে খাওয়াবে কি ? লুন্দর শেখের প্রস্তাবে রাজি হওয়ার চেয়ে মরে যাওয়াও তার কাছে শ্রেয়। নবিতুন চোখে অন্ধকার দেখে। এদিকে লুন্দর শেখ দৃষ্টিও মানে আগুন দিয়ে নবিতুনকে গ্রাস করতে নতুনভাবে ফাঁদ পাতে। চৌধুরী বাড়ি থেকে কাজ শেষে সন্ধ্যায় বাড়ি ফেরার পথে পাট ক্ষেতের পাশে জানোয়ারের বেশি লুন্দর শেখ নবিতুনকে ঝাপটে ধরে, কিন্তু উদ্দেশ্য সফল করতে পারে না। নিজের বুদ্ধি ও শক্তি দিয়ে নবিতুন আত্মরক্ষা করে।

তিনবছর পর কদম সারেং বাড়ি ফিরে। আটমাস বাড়ি থেকে ঘরে নতুন চালা, বেড়া দেখার পর আবার সমুদ্রের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে যেতে চাইলেও নবিতুন সন্তানসম্ভবা জেনে যায় না। কিন্তু গ্রামে নানা উপহাস, নবিতুনের চরিত্র নিয়ে নানা কথা, মামা লুন্দর শেখের ষড়যন্ত্রে কদমের মনে সন্দেহের সৃষ্টি হয়। সে কিছুতেই বুঝতে পারে না। জাহাজ থেকে মাসে মাসে টাকা পাঠানো পরও নবিতুন কেন চৌধুরী বাড়িতে ঝি-এর কাজ করেছে, কেন ঘরের চালা ঠিক করেনি। ক্রমশ তার মনে সন্দেহ প্রবল হয়। অসময়ে নবিতুন চৌধুরীদের বাড়িতে গেলে এনিয়ে তার সঙ্গে কদমের ঝগড়া হয়, কদম নবিতুনকে ধাক্কা মেরে ফেলে দেয়। নবিতুন বদনার উপর পড়ে গিয়ে একটা মৃতসন্তান প্রসব করে। কদম বাড়িছেড়ে চলে যেতে চায় কিন্তু প্রকৃতি যেন এই দ্বন্দ্বে মীমাংসার এগিয়ে আসে। ঝড় এবং জলোচ্ছ্বাসে পুরো উপকূলের লোকালয় নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। বাড়িঘর গাছপালা, পশু-পাখি, সব ভেসে যায়, প্রবল ঝড় আর জলোচ্ছ্বাসে হাজার হাজার মানুষের মৃত্যু হয় :

Dhaka University Institutional Repository

তারপর এক সময় যেখানকার পানি সেখানেই ফিরে গেল। জেগে উঠল পৃথিবীর মাটি। পৃথিবীর মাটিতে ঘর নেই, আশ্রয় নেই। পৃথিবীর মাটিতে এখানে সেখানে মৃত মানুষ-বিবস্ত্র,বিকলাংগ। .. .. ওরা দুজন। দূরে দূরে। একজন বুঝি আর একজনকে দেখছে না এখনো। ওরা একজন পুরুষ,একজন নারী।.. .. ওরা যেন পৃথিবীর সেই প্রথম মানবমানবী। - বাবা আদম আর বিবি হওয়া।'[১০]

ধর্মীয় মিথকল্পনাসূত্রের সঙ্গে শহীদুল্লা কায়সার 'সারেং বৌ' উপন্যাসের শিল্পসূত্রকে এভাবে সমান্তরাল করেছেন। প্রকৃতির দু'সন্তান,দুই নর-নারী, কদম এবং নবিতুন। নতুন পৃথিবীর নবজীবনের প্রেক্ষাপটে ঔপন্যাসিক তাদের স্থাপন করেছেন। প্রথাগত সামাজিক রীতিনীতি, বিশ্বাস-সংস্কারের বিপরীতে, তৃষ্ণার্ত, মৃতপ্রায় কদমের মুখে তুলে দেয় নবিতুন নিজের স্তন :

'জেগে উঠেই নবিতুনকে আকস্মিক ধাক্কায় দূরে ঠেলে দিল কদম। কী এক বিভ্রান্ত উন্মাদ চোখে নবিতুনের মুখে মুহূর্তের জন্য কি যেন খুঁজল। দুর্বল কম্পিত পায়ে উঠে দাঁড়াল। চেঁচিয়ে উঠল - পর করে দিলি ? পর করে দিলি নবিতুন ? পর ? কেন ? বিমূঢ় জিজ্ঞাসা নবিতুনের। এ কী করেছিস ? একি করেছিস নবিতুন ? পর করে দিলি ? এমন দুষমনি ? তুই কি জানিস না বৌ-র দুধ- কথাটা শেষ করতে পারলনা কদম।'[১১]

উপন্যাসের সমাপ্তিতে ধ্বনিত হয় নবিতুন এবং কদমের জীবনাকাঙ্ক্ষার সংগ্রামী উচ্চারণে ; তাদের অনন্ত আশাবাদ :

'দেখল চরের দূরপান্তে সবুজ রেখা। আর দেখল কয়েক হাত দূরে বঙ্গোপসাগরের ঝিলিমিলি নীল। শান্ত সংযত আর সুন্দর। কদম বলল, আর একটু জিরিয়ে নে রে নবিতুন। হাঁটতে হবে অনেক দূর।'[১২]

জীবনসংগ্রামের এই সুদৃঢ় উচ্চারণ, 'সারেং বৌ' উপন্যাসের শিল্পায়তনিক বিন্যাসকে উচ্চারিত করেছে। 'বিশেষ ভৌগোলিক আয়তনের বস্তুসমগ্রতা, সমুদ্র ও সমুদ্র-উপকূলবর্তী জনপদের বাস্তবজীবন ও ভাবজীবন, প্রকৃতির দাক্ষিণ্য ও ক্রোধে নির্মাণ ও ভাঙনশীল মানবপ্রবাহ প্রভৃতি বিষয়কে দক্ষতার সঙ্গে রূপদান করেছেন ঔপন্যাসিক। কদম ও নবিতুনের সক্রিয়তা ও সংগ্রাম ঔপন্যাসিক লক্ষ্যবিন্দু হলেও পারিপার্শ্বিক জীবনবাস্তবতার অনিবার্যতাও স্বীকৃতি পেয়েছে। বিরূপ জীবনস্রোত ও বিধ্বংসী প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে ট্রাজিক অভিজ্ঞতার মধ্যদিয়ে জয়যুক্ত হয়েছে কদম ও নবিতুন।'[১৩] বস্তুত জীবনার্থে রোমান্টিকতা থাকা সত্ত্বেও 'সারেং বৌ' উপন্যাসের বিষয় পরিকল্পনা,জীবনদৃষ্টি ও শিল্পশৈলী অনন্য।

'সারেং বৌ' উপন্যাসের চরিত্র-চিত্রণে ঔপন্যাসিক অঞ্চল বিশেষের পরিবেশধৃত বাস্তব অভিজ্ঞতার স্বাক্ষর রেখেছেন। ব্যক্তিগত জীবনে শহীদুল্লা কায়সার একজন খ্যাতনামা সাংবাদিক ছিলেন এবং তার জন্ম নোয়াখালী জেলায় (বর্তমান ফেনী জেলা)। উপন্যাসের পটভূমিও এই অঞ্চলের ফলত 'সারেং বৌ' উপন্যাসের কাহিনী যে তার বাস্তব অভিজ্ঞতার জগত থেকে নেয়া, তা বলার অপেক্ষা রাখেনা। 'সারেং বৌ' উপন্যাসের কাহিনী আবর্তিত হয়েছে নবিতুনের জীবনকে কেন্দ্র করে। নবিতুন বামছাড়ি গ্রামের প্রকৃতি লালিতা এক সাধারণ অথচ জীবনাকাঙ্ক্ষায় স্বপ্নময়ী, দৃঢ়চেতা, সংগ্রামী

Dhaka University Institutional Repository

নারী। কদমের স্ত্রী আর আক্কির জননী। স্বামী কদমের অনুপস্থিতিতে তার অস্তিত্বের সংগ্রাম, ক্ষুধা ও দারিদ্রের বিরুদ্ধে অবিচল যুদ্ধ, সর্বোপরি আপন সতিত্ব রক্ষায় তার শক্তি ও সাহস, তাকে অসাধারণ নারীর পরিচয়ে অভিসিক্ত করেছে। সতিত্বের অবমাননা তার কাছে মৃত্যুর চেয়ে অধিক। লুন্দর শেখের টাকা তাই সে ঘৃণাভরে ছুঁড়ে মারে। অসময়ে গুজাবুড়ি এলে আককিকে কিল মেরে ঘুম থেকে তোলে। পিঁড়ি ছুঁড়ে মারে বুড়ির উদ্দেশ্যে মনে মনে ভাবে আবার এলে 'কচুপড়া বাটা' দেবে তার মুখে। অথচ গুজাবুড়ি আর তার কাছে খাবার চায়, তখন সে নিজের জন্য রাখা পান্তাটুকু তুলে দেয় বুড়ির মুখে। কারণ, ক্ষুধার জ্বালা সে বোঝে। বেঁচে থাকার প্রয়োজনে ধানভানির কাজ করেছে, শেষ পর্যন্ত চৌধুরী বাড়িতে গিয়ে ঝি-এর কাজ করে মেয়ের জীবন ও নিজের অস্তিত্ব রক্ষা করেছে। শুধু তাই নয়, চৌধুরী বাড়ি থেকে কাজ করে ফেরার পথে সন্ধ্যার অন্ধকারে পাট ক্ষেত্রে লুন্দর শেখ তাকে ধর্ষণের চেষ্টা করলে সে নিজের শক্তি, সাহস ও বুদ্ধি দিয়ে সতিত্ব রক্ষা করতে সক্ষম হয়। দীর্ঘদিন স্বামী কদম খোঁজ খবর না নিলেও কদমের বিরুদ্ধে তার কোনো অভিযোগ নেই। পরে যখন চৌধুরী বাড়ির ছোট বৌয়ের কাছে জানতে পারে যে লুন্দর শেখের ষড়যন্ত্রের কারণে সে কদমের টাকা ও চিঠির সংবাদ থেকে বঞ্চিত হয় তখন তার সামান্য অভিমান ও দূর হয়ে যায়। ঝড়-জলোচ্ছ্বাসে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে নবিতুনের কাছে ক্ষমা চায়। জলোচ্ছ্বাসের পর মৃতপ্রায় স্বামীকে নিজের স্তনের দুধ দিয়ে বাঁচায়। ভাবতে অবাক লাগে যে, বামনছাড়ি গ্রামের এক অশিক্ষিত নারী নবিতুন দৃঢ়তা মনোবল, সংকটের মোকাবেলায় শ্রম ও সাহসের সমন্বয় কি করে ঘটলো ? অথচ আশ্চর্যের বিষয়, কোথাও তার চরিত্র বেমানান হয়ে ওঠেনি। লুন্দর শেখের মত গ্রামীণ সম্পদশালী লম্পট ষড়যন্ত্র করে তার উপর ক্ষুধা ও দারিদ্র্য চাপিয়ে দেয়। বর্হিশক্তি আরোপিত সংকট সে দৃঢ়তার সঙ্গে মোকাবেলা করে নিজের সতীত্ব ও অস্তিত্ব রক্ষা করে। বাংলাদেশের উপন্যাসে নবিতুনের মত এমন অসাধারণ নারী চরিত্র খুব একটা দেখা যায় না। 'সারেং বৌ' উপন্যাসের নামকরণের যথার্থতা নবিতুন চরিত্রের মধ্যে সার্থকতা লাভ করেছে।

উপন্যাসে দ্বিতীয় প্রধান চরিত্র কদম সারেং ভালোবেসে নবিতুনকে বিয়ে করে। কন্যা আককিকে আট বছরের রেখে সে জাহাজে যায়। জীবীকার সন্ধানে অসীম সাহসী কদম সাগর পাড়ি দিতে ভয় করে না। স্ত্রী নবিতুন ও মেয়ের জন্য টাকা, চিঠি পাঠালেও তা লুন্দর শেখের ষড়যন্ত্রের কারণে তাদের হাতে পৌঁছায় না। তিন বছর পর বাড়ি ফেরার সময় খিদিরপুর বন্দরে সহকারী এক সারেংয়ের দেয়া অফিসের চালান পার করতে গিয়ে সে পুলিশের হাতে ধরা পড়ে। কদম জানতো না সহকারী সারেংয়ের দেয়া বাক্সে অফিম। বিচারে কদমের জেল হয়। জেলে বসে কদম চিঠি লিখে নি, কারণ জেলের সিল আঁটা চিঠি দিলে নবিতুন সমাজের চোখে ছোট হয়ে যাবে। জেল থেকে মুক্তি পেয়ে প্রেমিক কদম, পিতা কদম খালি হাতে বাড়ি না ফিরি আবার 'রুতুন্দা' জাহাজে চলে যায়। টাকা রোজগার করে বাড়ি ফিরে। কিন্তু বাড়ি ফিরে সে গ্রামের নানা জনের কাছে স্ত্রী নবিতুনের চরিত্র সম্পর্কে নানা কথা শুনে দ্বিধাগ্রস্ত হয়। দূর সম্পর্কের মামা লুন্দর শেখও নবিতুনের প্রতি নজর রাখতে বলে। নবিতুনের সন্তান গর্ভকৃত সন্তান সম্পর্কে নানা বিশ্রি ইঙ্গিত করে। কদম ক্ষিপ্ত হয়ে নবিতুনকে প্রহার করে। ফলে নবিতুন মৃত সন্তান প্রসব করে। এ জায়গায় কদম চরিত্রের ত্রুটি লক্ষ্য করা যায়। সে কোনো কিছু যাচাই না করে লোকের কথা বিশ্বাস করেছে। বস্তুত, কদম চরিত্রটিতে নায়োকচিত মহিমা থাকলে ঔপন্যাসিক এই চরিত্রটির তেমন পরিচর্যা করেন নি। কদম চরিত্র ঔপন্যাসিকের হাতে উপেক্ষিত হয়েছে। শেষ পর্যন্ত কদমের ভুলভাঙ্গে এবং নবিতুনকে নিয়ে জীবন সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়।

Dhaka University Institutional Repository

উপন্যাসে লুন্দর শেখ চরিত্রটি গ্রামীণ পরিবেশে প্রতিপত্তিশীল লম্পট জোতদারের যথার্থ প্রতিচ্ছবি। অবশ্য এই চরিত্রটিকে রূপ দিতে গিয়ে লেখক লুন্দর শেখের মধ্যে বহুমাত্রিকতার অভাব রেখেছেন। মানুষ তো কেবল মাত্র তার যৌন-উগ্রতা এবং পাশবিকতা দিয়ে সম্পুর্ন নয়। যদির নবিতুনের চরিত্র বিকাশের জন্য কাহিনী অনুসারে লুন্দর শেখের চরিত্র বাস্তব ও বিশ্বাসযোগ্য কিন্তু তার মধ্যে মানবিকতা, অনুশোচনা, দ্বিধা ও সংশয় সৃষ্টি করে অসাধারণ চরিত্রের মাত্রা দেয়া যেতো। লুন্দর শেখ 'জানোয়ার'ই থেকে গেছে শেষ পর্যন্ত। সমাজে এধরণের খারাপ চরিত্র যথেষ্ট আছে, যারা পাশবিকতা চরিতার্থ করতে ব্যর্থ হয়ে নানা ষড়যন্ত্রের আশ্রয় নেয়। উপন্যাসে লুন্দর শেখ সে ধরণের চরিত্রেরই প্রতিনিধি। উপন্যাসে তৃতীয় চরিত্র গুজাবুড়ি, 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের বড়াইয়ের মতই। গুজাবুজি যৌবনে লুন্দর শেখের রক্ষিতা ছিলো। প্রৌঢ় বয়সে তার এই দৌত্যগিরি পেশা নিজের স্ফুর্নিবৃত্তি নিবারণের জন্যই নয় কেবল, অনাস্বাদিত যৌবনের বিকৃতিও বটে। উল্লিখিত চরিত্রগুলোর সাহায্যে ঔপন্যাসিক একটি বিশেষ অঞ্চলের পরিবেশধৃত মানুষের জীবনপ্রকৃতিকে উম্মোচিত করেছেন। ফলে 'সারেং বৌ' কেবল নবিতুনের আর্থ-সামাজিক জীবন বাস্ততারও কাহিনী হয়ে উঠেছে।

৩.

ভাষা-সংলাপ, প্রবাদ-প্রবচনই আঞ্চলিক উপন্যাসের প্রাণসত্তা। অঞ্চল বিশেষের পরিবেশধৃত চরিত্রের আচার-উচ্চারণে স্থানীয়ভঙ্গির তাদের আর্থ-সামাজিক পরিচয়কে বাস্তব ভিত্তি দান করে। 'সারেং বৌ' উপন্যাসের ভাষা নির্মাণের শহীদুল্লা কায়সার এব্যাপারে সচেতন ছিলেন। রোমান্টিক জীবনানুভবের কারণে মৌলধর্মে আঞ্চলিক উপন্যাস হলেও 'সারেং বৌ' গীতিকবিতার সমীপবর্তী। উপন্যাসের চরিত্র তাই আপন ভাব প্রাকশে সঙ্গীতময় পদের আশ্রয় নেয় :

'হিরামতি হিরামতি
আমি যামু সুধারাম কব্যামতি।
হিরামতি হিরামতি
তোমার লাইগা অন্নমু কি
পুঁতির মালা পইরবে কি।
পুঁতির মালা কালা সুতায় লাল,
পুঁতির মালা ধলা সুতায় নীল।
পুঁতির মালা সোনার চিক
পুঁতির মালা গুলবদনি ঝিলিক।
হিরামতি হিরামতি
বড় গাঙ্গে নাও ভাসিয়ে
গহিন জলে ডুবান দিয়ে
আমি যামু সুধারমা কন্যামতি। (সা.বৌ./পৃ. ২০-২১)

Dhaka University Institutional Repository

কদম সারেংয়ের মুখে উচ্চারিত এই লোকগীতির মধ্যে আঞ্চলিক জীবনের সঞ্চার লক্ষ্যণীয়। 'সুধারাম' নোয়াখালীর প্রাচীন নাম।' সামাজিক ইতিহাস থেকে জানা যায়, সুধারাম একসময় গঞ্জ ছিলো, সেই গঞ্জকে নিয়ে সেখানকার জীবনের প্রাণচঞ্চল্য ছিলো। এই লোকগীতিকায় কদম সারেং এর গঞ্জে যাওয়ার কথা আছে এবং সেখান থকে পুঁতিরমালা আনার কথা বলা হয়েছে। সেই অঞ্চলের উচ্চারণভঙ্গিরও গীতিকার শব্দে পাওয়া যায়-

'লাইগা' 'কালো' 'পইরবে' 'যামু' 'নাও' 'গহিন' 'ডুবান' ইত্যাদি শব্দ। 'লাইগা' 'পইরবে' শব্দে অপিনিহিতি ঘটেছে। 'কালা' কালো অর্থে এবং 'ধলা' সাদা, 'যামু' নোয়াখালী অঞ্চলে যাবো অর্থে ব্যবহৃত হয়। চলতি 'ব' এর স্থানে 'ম' 'ে' 'ো' স্থানে (া) হয়েছে। 'নাও' 'নৌকা' শব্দের আঞ্চলিক রূপ, অপিনিহিত অনুসারে ন-এর 'ো' উচ্চারণকে 'ও'-তে পরিণত করে 'কা' বর্ণটিকে লুপ্ত করে 'নাও' হয়েছে। আঞ্চলিক উপন্যাসের অন্যতাম বৈশিষ্ট্য স্থানীয় প্রবাচ-প্রবচনের ব্যবহার। 'সারেং বৌ' উপন্যাসে প্রবাদ-প্রবচনের যথেষ্ট প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। যেমন :

ক.'যে দেয় কয়াল পাড়ি
বৌ-তার দুপুরের রাঁড়ি।' (সা.বৌ/পৃ.৩১)

খ.'কলাই খেতে নাইকো ফুল
গৌরীর মাথায় দীগ্‌গল চুল
দীগ্‌গল চুলে মারল বাড়ি
ফুল ফুইটাছে সারি সারি।' (সা.বৌ/পৃ.৭৯)

গ.'আম ভাল জাম ভাল
তেঁতুল বড় টক
বাপের বাড় হাত গেল পিঠ গেল
মামা বাড়ির পিঠায় বড় ঢক।' (সা.বৌ/পৃ. ১২০)

ঘ.'আইঠা কলার ছাউনি
ভেরনের খাম
পবন ঠাকুর বইসো বইসো।' (সা.বৌ./পৃ.১৩৫)

'ক' উদাহরণ 'কয়াল' নদী সম্পর্কে স্থানীয় লোকগোষ্ঠীর সংস্কার ধ্বনিত হয়েছে। 'খ' উদাহরণে কলাইয়ের ফুলের সঙ্গে স্থানীয় 'গৌরী নামের মেয়ে' চুলের তুলনা করা হয়েছে এবং সেই চুলে আঘাত করলে সারি সারি ফুল ফোটার কথা বলা হয়েছে। উদাহরণ 'গ' এ মামার বাড়ির পিঠার সৌন্দর্যের ('ঢক' শব্দটি নোয়াখালী অঞ্চলে এই অর্থে ব্যবহৃত হয়) কথা বলা হয়েছে। 'ঘ' এ সেই অঞ্চলের লোকবিশ্বাস, সংস্কারের পরিচয় বিধৃত হয়েছে। এসব প্রবাদ-প্রবচনের মধ্যে স্থানীয় জীবনের বাস্তব রূপ এমনভাবে প্রতিফলিত যে সেখানকার জীবন বিশেষ আঞ্চলিক রঙেই রঞ্জিত।

Dhaka University Institutional Repository

কর্ণফুলী

কর্ণফুলী নদী ও তার তীরবর্তী বৈচিত্র্যময় জীবনপ্রবাহ, আঞ্চলিক পরিবেশধৃত শ্রমজীবি মানুষের আত্মদ্বন্দ্ব ও অস্তিত্বের স্বরূপ অঙ্কনের মানসে আলাউদ্দিন আল আজাদ (জন্ম ১৯৩২) রচনা করেন 'কর্ণফুলী' (১৯৬২) উপন্যাস। ঔপন্যাসিক লিখেছেন 'চিত্রী যেমন বিভিন্ন রং দিয়ে একটি সৃষ্টি সম্পূর্ণ করেন, তেমনিভাবে আমি বিভিন্ন ভাষার রং ব্যবহার করেছি ; 'কর্ণফুলীর জীবনধারা, সবুজ প্রকৃতি , শ্যামল পাহাড় ও সাগর সঙ্গমে বয়ে চলা প্রবাহের মতই এভাষা অবিভাজ্য। শিল্পসিদ্ধির জন্য এর অবলম্বন আমার কাছে অপরিহার্য রূপে গণ্য হয়েছে।'[১৪] ঔপন্যাসিক আঞ্চলিক লোকজীবন ও ভাষার অঙ্গীকারের কথা যতই উচ্চারণ করুন না কেন, 'কর্ণফুলী' সর্বোতভাবে আঞ্চলিক উপন্যাস নয়। কারণ, আঞ্চলিক উপন্যাসের যে সব বৈশিষ্ট্য- 'প্রথমত, কোন নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অঞ্চলের নিবিড় এবং অখন্ড পরিচয় দান, দ্বিতীয়ত, ভাষা-সংলাপে,স্থানীয় প্রবাদ-প্রবচন এমনকি উচ্চারণ ভঙ্গিতেও সাধ্যমত আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য গুলি ফুটিয়ে তোলা'।[১৫] ইত্যাদি। 'কর্ণফুলী' উপন্যাসে পরিপূর্ণভাবে পাওয়া যায় না। আঞ্চলিক বৃত্তাবদ্ধ জীবনকাঠামো নগরায়ণ ও যন্ত্রায়ণের ফলে যে রূপান্তর ঘটে, তারই দৃষ্টিগ্রাহ্য বাস্তবতা শিল্পায়িত হয়েছে এউপন্যাসে। অন্তঃপ্রবাহে রোমান্টিকতা থাকা সত্ত্বেও, বিশেষ অঞ্চলের জীবনপ্রবাহের শব্দরূপ হিসেবেই 'কর্ণফুলী' উপন্যাসের বিশেষত্ব।

২.

কাহিনীগঠনে বিশেষ ভৌগোলিক আয়তনের বস্তুসমগ্রতা থাকলেও আর্থ-সামাজিক কাঠামোর অন্তর্গত নৃতাত্ত্বিক ঐতিহ্যমন্ডিত মানবসম্প্রদায়ের সুসংহত রূপবন্ধনে ঔপন্যাসিকের দৃষ্টিকোণ পরিস্রুত নয়। ঔপন্যাসিকের সীমাবদ্ধ অভিজ্ঞতাই এর জন্য দায়ী। জীবনানুভবে রোমান্টিকতার কারণে চরিত্রের ভাবনা-কল্পনা আচার-উচ্চারণে স্থূলতা এসেছে, যা local colour and habitation -কে পূর্ণাঙ্গ শিল্পরূপ দিতে সর্বাংশে সফল হয়। উপন্যাসের শুরুতেই আঞ্চলিক জীবনপ্যাট্যার্নের স্বরূপ স্পষ্ট হয় :

> 'সুড়ঙ্গের মতো অন্ধকার গলি, তার ভিতরে বাঁশের ছোটেপ্পা কামার শালা। বাঁহাতে শেকল ধরে টাকা হাপরের গনগনে আগুন মিস্ত্রির পেশীবহুল কালো দেহটপ্পাকে মোটা রেখায় উৎকীর্ণ করেছে এবং সেই রক্তিম আভায় রঙিন হয়ে থাকা তার মুখ থেকে ফোঁটায় ফোঁটায় ঝরছে ঘাম।'[১৬]

এই কামারশালায় ঠিকাদার রমজানের সঙ্গে পকেটমার ইসমাইলের কাজের কথা হয় এবং তর জন্য অগ্রিম নেয় দেশটাকা। বাড়িতে এসে মা মনুবিডিবকে সেই দশটাকা হাতে দেয় এবং তার কেরামতের মেয়ে জুলিত বিয়ের কথা শুনে মনে মনে রোমান্স অনুভব করে। জুলিকে তার ভালো লাগে, তবে বিয়ে করে দায়িত্ব নেয়ার কথা কখনো ভাবেনি। তবে একবার সে জুলিকে একটি সোনার আংটি দিয়েছে। মা মনুবিবিরি সঙ্গে ইসমাইলের যখন কথা হয় তখন আড়াল থেকে জুলি তা শুনে, হাতের আংটিটা খুলে আচমকা সে ইসমাইলের কোলের উপর ফেলে পালিয়ে যায়। যদিও রমজানের সঙ্গে কাসালং যাওয়ার পূর্বে সে একবার জুলিদের বাড়ি যায়, মানের গোপন ইচ্ছা, যদি জুলির সঙ্গে একটু কথা হয়। জুলির বাবা কুলি কেরামতের সঙ্গে কথ বলে, জুলি কাছে আসেনা।

Dhaka University Institutional Repository

রমজানের সঙ্গে ইসমাইল কাসালং বাঁশ কাটতে যায়। রমজান কর্ণফুলী পেপার মিলের বাঁশের ঠিকাদার। রমজানের কাজে কাসালং গিয়ে ইসমাইল পরিচিত হয় লালচাচার সঙ্গে। স্বভাবে লালচাচা একটু ক্ষেপাটে, বেশি আসক্তি দেশি মদের প্রতি। দ্বিতীয় রাতেই ইসমাইল বুঝতে পারে টাকা ও মদ দিয়ে রমজান লালচাচার কাছ থেকে কিনতে চায় তার মেয়ে রাঙা মিলাকে। দুপুরে কলসি জল দিতে এলে রাঙামিলার সঙ্গে পরিচয় হয় ইসমাইলের, বিকেলে ঝর্ণার জলে জল আনতে গেলে ইসমাইল জুলির ফেরত দেয়া আংটি দেয় রাঙামিলার কলসিতে। অবশ্য কয়েকদিন পর লালচাচার বাড়িতে গিয়ে সে রাঙামিলার জন্য একটা শাড়িও দিয়ে আসে। কিন্তু রাঙামিলাকে ভালোবাসে চাকমা যুবক নীলমণি। রাঙামিলাও নীলমণির প্রেমের যোগ্য স্বীকৃতি দিতে প্রস্তুত। তারা রাতের আঁধারে পালিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করে। ইসমাইল গাছের আড়ালে থেকে তাদের পালিয়ে যাওয়ার কথা শুনে ফেলে। জিঘাংসায় ইসমাইলের চোখ জ্বলে ওঠে। নির্ধারিত রাতে রাঙামিলাও নীলমণির হাত ধরে পথে নামে। ইসমাইলও তাদের অনুসরণ করে। কিন্তু ইসমাইল জানতো না রমজান,ইতুগুন্ডা, হাবুগুন্ডা তাকেও অনুসরণ করছে। পথের ক্লান্তির রাঙামিলা নদীর তীরে এস বিশ্রাম নেয়,নীলমণির কোলে মাথা রাখে। হঠাৎ রাঙামিলার চোখে পড়ে ইসমাইল। নীলমণি উঠতে যাচ্ছিল, এমন সময় ইসমাইলের দুপাশ থেকে ইতুগুন্ডা ও হাবুগুন্ডা এসে দাঁড়ায়। সুযোগ বুঝে তাদেরকে লাথি মেরে ফেলে দিয়ে নীলমণি ইসমাইলের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। কিন্তু নীলমণি পরাস্ত হয়। সে সংজ্ঞা হারিয়ে ফেললে তার জন্য ইসমাইলের মনে সহানুভূতি জাগে। নীলমণিকে কাঁধে নিয়ে রাঙামিলাসহ ইসমাইল এগিয়ে চলে। বাড়ি এসে ইসমাইল শুনতে পায় জুলির বিয়ের কথা। সে রাতেই জুলিকে ডেকে এসে ঘরের লাইট নিভিয়ে দেয়। পরে অবশ্য জুলিকে সে বিয়ে করে। জুলির ঘরে তার সন্তান হয়। এদিকে কুলির কাজ যেমন তার ভালো লাগে না, তেমনি সংসার চালানো তার জন্য কষ্টকর হয়ে ওঠে। একসময় দু'জন ভদ্রলোকের সঙ্গে তার পরিচয় হয়, তাদের সাহায্যে ইসমাইলের 'নলি' হয়, তবে শর্ত থাকে যে, জাহাজে সে তাদের হয়ে কাজ করবে। জাহাজে যাওয়ার পূর্বে ইসমাইল জুলিকে আদর করে, সান্ত্বনা দেয়, জুলির চোখের জল কর্ণফুলীর নোনাজলে মিশে যেতে থাকে। জাহাজ দৃষ্টিরবাইরে চলে গেলে জুলি ফিরে আসে বাস স্ট্যান্ডের দিকে। উপন্যাসটি শেষ হয় এভাবে -

> 'আসমান ওপরে থাক, দরিয়াকে ভয় করা যায় না ? আস্তে আস্তে হেঁটে বাসষ্ট্যান্ডের দিকে যেতে এ কথাটিই মনে জেগে থাকে ধ্রুবতারার মতো। তার কানে বাজে বহুবার শোনা গানের কলি, রঙ্গম রঙ্গিলা সনে মর্জি রইল মন, এ মত দেওয়ানারে হইয়া ও লি কতজন, রঙ্গম রঙ্গিলারে।'[১৭]

এই পরিসমাপ্তিতে বোঝা যায়, কাহিনীগঠনে ও চরিত্র বিন্যাসে আলাউদ্দিন আল আজাদ সচেতন ছিলেন না। কাহিনী কোনো সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য পথে এগিয়ে যায় নি। অর্থাৎ ঔপন্যাসিক শুরু থেকে পরিণতি নিয়ে ভাবেন নি, তাই ঘটনার বিন্যাস এলোমেলো। উপন্যাসে মূল চরিত্র ইসমাইল, তার পরিচয় প্রথমে পকেটমার, গুন্ডা, অবশেষে যে এক বিশেষ গোষ্ঠীর কর্মি হয়ে জাহাজে যাত্রা করে। আঞ্চলিক উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র হিসেবে ইসমাইলের কোনো পরিচয় ফুটে ওঠে না। এমনকি সে কোনো পেশার বা গোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্বও করে না। অথচ ঔপন্যাসিক তাকে শ্রমজীবী মানুষের প্রেক্ষাপটে চিত্রিত করেছেন। এছাড়াও ইসমাইল প্রথমে জুলির প্রতি আকৃষ্ট হলেও তার এ আকর্ষণ যেন সাময়িক, কাসালং বাঁশ কাটতে গিয়ে আবার রাঙামিলার প্রতিও আকর্ষণ অনুভব করে। তাকে জুলির ফিরিয়ে দেয়া আংটি দেয়, এমনকি তার বাড়িতে গিয়ে শাড়িও দিয়ে আসে। রাঙামিলা তার প্রেমিকা চাকমা যুবক নীলমণির হাত ধরে বেরিয়ে

Dhaka University Institutional Repository

যাওয়ার রাতে ইসমাইল হাতে ডেগার নিয়ে তাদের অনুসরণ করে, অন্যদিকে তাকেও অনুসরণ করে রমজান, ইতুগুন্ডা, হাবুগুন্ডা। দ্বন্দ্বযুদ্ধে নীলমণি সংজ্ঞা হারালে সে অবশ্য তার প্রতি সহানুভূতিশীল হয় এবং তাকে কাঁধে করে রাঙামিলাসহ শহরে আসে। এখানে ইসমাইলের চরিত্রে মানবিকতার স্পর্শ দেখা যায়। কিন্তু বাড়ি ফিরে যখন শুনতে পায় জুলির বিয়ে হয়ে গেছে তখন আবার তার মধ্যে জিঘাংসা জেগে ওঠে। জুলিকে ডেকে এনে ঘরের লাইট নিভিয়ে নিয়ে তার পাশবিকতা চরিতার্থ করে। অর্থাৎ নারীর প্রতি তার আকর্ষণ যতটুকু প্রেমের তার চেয়ে বেশি শারীরিক। যদি সেই জুলিকেই শেষ পর্যন্ত ইসমাইল বিয়ে করে কিন্তু তাকে প্রেমিক পুরুষ বলে মনে হয় না। ইসমাইলের চরিত্র চিত্রণে আলাউদ্দিন আল আজাদের এই অসতর্ক বিশৃঙ্খলতা 'কর্ণফুলী' উপন্যাসের গঠনবিন্যাসকে দুর্বল করে ফেলেছে। উপন্যাসের অন্য চরিত্রগুলোর মধ্যে রমজান কর্ণফুলী পেপার মিলের বাঁশের ঠিকাদার। শ্রেণীচরিত্র অনুযায়ী রমজান অর্থলোলুপ, নারীলোলুপ, লম্পট। রাঙামিলাকে পাওয়ার জন্য সে তার পিতা লালচাকে মদ খাওয়ার টাকা দেয় এবং শেষ পর্যন্ত ইতুগুন্ডা ও হাবাগুন্ডাকে নিয়ে নিজেই রাঙামিলা ও নীলমণির অনুসরণ করে। অর্থাৎ সে যথার্থই তার শ্রেণীচরিত্রের প্রতিনিধিত্ব করে। রাঙামিলা এবং জুলি দু'জন ইসমাইলের জীবনের স্বপ্ন-আকাঙ্ক্ষার কারণ ছিলো। কিন্তু জুলির অভিমান যেমন ইসমাইলকে রাঙামিলার প্রতি আগ্রহী করেছে তেমনি আবার বিপথগামী করেছে। জুলি এবং রাঙামিলা এই দুই নারী চরিত্র 'কর্ণফুলী' উপন্যাসের স্বপ্নময় পরিবেশ তৈরি করেছে। তবে তাদের চরিত্র প্রেমের জন্য ত্যাগ কিংবা সংগ্রাম কোনো কিছুই লক্ষ করা যায় না। রাঙামিলা নীলমণিকে ভালোবেসে পথে নামে সত্য, কিন্তু তাদের পরিণাম ঔপন্যাসিকের যথার্থ পরিচর্যা থেকে বঞ্চিত। ঔপন্যাসিকের মূল আকর্ষণ ছিলো আঞ্চলিক জীবনের পরিবর্তনের প্রতি। ইসমাইলের দৃষ্টিতে সেই পরিবর্তনের রূপ ধরা পড়ে এভাবে :

> ক. 'মিলের বাঁশ কাটার মেশিনটা আজব জিনিষ, যেন রূপকাহিনীর রাক্ষস, প্রচন্ড শব্দে কাজ করে চলেছে, বড় বড় বোন্দাগুলি নিমিষেই মিশসার। কাপ্তাইয়ের বিজলীঘর, ছোড়, দরওয়াজা, কলের এত শক্তি। এদের কাছে মানুষের মেহেনত তো কিছু নয় ? পাহাড়কে বদলাচ্ছে, মাটিকে বদলাচ্ছে, যাদুমন্ত্রের মতো।'[১৮]
>
> খ. 'বছর খানেকের মধ্যে গ্রাম ছেড়ে দিয়ে এখানকার সকলকেই চলে যেতে হবে। কাপ্তাই-এর বিজলী-কারখানা চালু ভেসে যাবে এই এলাকাও।'[১৯]

অর্থাৎ বহির্বাস্তবতার আঘাতে, যন্ত্রায়ণ ও নগরায়ণের ফলে আঞ্চলিক জীবনকাঠামোর যে রূপান্তর সাধিত হচ্ছে, তার সঙ্গে স্থানীয় অধিবাসীদের জীবনপ্যাটার্নেরও পরিবর্তন হচ্ছে। উপন্যাসের পরিসমাপ্তিতে তাই দেখা যায়, কেন্দ্রীয় চরিত্র ইসমাইল 'নলি' বানিয়ে জাহাজে পাড়ি জমায়। উপন্যাস নির্মিতির সুদক্ষ স্বাক্ষর থাকা সত্ত্বেও আলাউদ্দিন আল আজাদের 'কর্ণফুলী' সীমাবদ্ধ অভিজ্ঞতার উপন্যাস বলে অনুমিত হয়। শ্রমজীবী মানুষের প্রতি মমত্ববোধ থাকার কারণে আলাউদ্দিন আল আজাদ চরিত্র নির্বাচনে নিম্নশ্রেণীর- কুলি, মজুর, ঠিকাদার, চরিত্রকে প্রাধান্য দিলেও 'কর্ণফুলী' শ্রেণীচেতনার উপন্যাস নয়। 'কর্ণফুলী' উপন্যাসের আন্তঃবিন্যাস রোমান্স আক্রান্ত, আঞ্চলিক গীতলতায় পরিপূর্ণ।

৩.

'কর্ণফুলী' উপন্যাসের ভাষা ব্যবহারে আলাউদ্দিন আল আজাদ চট্টগ্রামেরর আঞ্চলিক গান, প্রবাদ-প্রবচন, প্রয়োগ করে স্থানীয় জীবনধারাকে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। সবক্ষেত্রে তিনি সফল হয়েছেন, এমন বলা যায় না। কারণ, আঞ্চলিক শব্দের অসতর্ক প্রয়োগ, ও আঞ্চলিক উচ্চারণভঙ্গির ভুল বানান দৃষ্টি এড়ায় না।

Dhaka University Institutional Repository

'ইসমাইল একটি স্থির হয়ে চাঁদে আলোতে দেখে ওর পদ্মের মতো মুখ, তারপর হাত ছাড়িয়ে ওকে আগলে বুকের কাছে ধীরে বলল : 'ন ডরইও। চল জলদি। দোহরা পথ দিষওন পড়িব।' (কর্ণফুলী / পৃ.৩৬)

এখানে সংলাপের মধ্যে 'চল জলদি'-এর 'চল' স্থানীয় উচ্চারণ 'চলঅ' এবং 'দিষওন' শব্দটি আঞ্চলিক উচ্চারনে হবে 'দিশ্ হঅন' অর্থাৎ সঠিকভাবে পাওয়া। চট্টগ্রামের আঞ্চলিক গানের ব্যবহার :

ক. রইস্যা বন্দু ছাড়ি গেলরে
শাদা দিলে দাগ লাগ্যাই।

খ. নিডির তলি মারবহিব
পসারি দুগান লবহিব
লাইবে এবারৎ ইলে
বাজ্জি পারে নায় কোনদিন।

আঞ্চলিক প্রবাহ-প্রবচন :

যদি আছে দুই পাও, যেথা ইচ্ছা সেথা যাও
যদি হবে চার পাও, এই ব্যাটা কোথা যাও
যদি হবে ছয় পাও, আব্বাজান মিস্ত্রি দাও।

আলাউদ্দিন আল আজাদ 'কর্ণফুলী' উপন্যাসের 'লেখকের কথা'য় যদিও বলেছেন- 'চিত্রী যেমন বিভিন্ন রং দিয়ে একটি সৃষ্টি সম্পূর্ণ করেন, তেমনিভাবে আমি বিভিন্ন ভাষার রং ব্যবহার করেছি, কর্ণফুলীর জীবনধারা, সবুজ প্রকৃতি, শ্যামল পাহাড় ও সাগর সঙ্গমে বয়ে চলা প্রবাহের মতই এভাষা অবিভাজ্য।' কিন্তু আমাদের বিবেচনায় এ 'অবিভাজ্য' ভাষা তিনি অকৃত্রিমভাবে প্রয়োগ করতে পারেন নি। বিচ্ছিন্নভাবে প্রয়োগের ফলে ভাষার আঞ্চলিক রং পরিস্ফুট হয়নি। আঞ্চলিক জীবনধারার অকৃত্রিম ছবি আঁকতে গেলে অবশ্যই আঞ্চলিক অবিভাজ্য ভাষার অকৃত্রিম প্রয়োগ করতে হবে। তবু নদীকর্ণফুলীর তীরবর্তী জীবনধারা যে ছবি আলাউদ্দিন আল আজাদ আমাদের সাহিত্যে উপহার দিয়েছেন তা সর্বাংশে আঞ্চলিক সার্থকতায় পরিপূর্ণ না হলেও বাংলাদেশের উপন্যাসে সুনির্দিষ্ট ব্যতিক্রম।

তথ্যনির্দেশ ও টীকা

১. অলোক রায় (সম্পাদিত), *সাহিত্যকোষ : কথাসাহিত্য, সাহিত্যলোক,* দ্বি.স.১৯৯৩, কলকাতা, পৃ.৩

২. গোপিকানাথ রায় চৌধুরী, *দুই বিশ্বযুদ্ধ মধ্যকালীন কথাসাহিত্য,* ১৯৮৬, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, পৃ.২৮৩

৩. শহীদুল্লা কায়সারের *'সারেং বৌ'* ১৯৬২ সালে ঢাকায় প্রকাশিত হয়, বর্তমান সন্দর্ভে নবম মুদ্রণ ১৯৮৮, ঢাকা, নওরোজ সাহিত্য সম্ভার-এর পাঠ গৃহীত হয়েছে।

৪. রফিকউল্লাহ খান, *বাংলাদেশের উপন্যাস : বিষয় ও শিল্পরূপ,* ১৯৯৭, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, পৃ.১২৪-২৫

Dhaka University Institutional Repository

৫. অরূপকুমার ভট্টাচার্য, *আঞ্চলিকতা : বাঙলা উপন্যাস*,১৯৮৭, কলকাতা, পুস্তক বিপনী,পৃ.৬
৬. *আঞ্চলিকতা : বাঙলা উপন্যাস*, পুর্বোক্ত, পৃ.৬
৭. শহীদুল্লা কায়সার, *সারেং বৌ*, নবম মুদ্রণ,১৯৮৮,ঢাকা, নওরোজ সাহিত্য সম্ভার,পৃ.৯
৮. *সারেং বৌ*, পূর্বোক্ত,পৃ.৩১
৯. *সারেং বৌ*, পূর্বোক্ত,পৃ.১৫
১০. *সারেং বৌ*, পূর্বোক্ত,পৃ.৮০
১১. *সারেং বৌ*, পূর্বোক্ত,পৃ.১৪৭-৪৮
১২. *সারেং বৌ*, পূর্বোক্ত,পৃ.১৫০
১৩. *সারেং বৌ*, পূর্বোক্ত,পৃ.১৫২
১৪. *বাংলাদেশের উপন্যাস : বিষয় ও শিল্পরূপ*,পূর্বোক্ত,পৃ.১২৬
১৫. আলাউদ্দিন আল আজাদ, *কর্ণফুলী*, দ্বিতীয় সংস্করণ,১৯৭৪, ঢাকা, মুক্তধারা,দ্রষ্টব্য-'লেখকের কথা'
১৬. *আঞ্চলিকতা : বাঙলা উপন্যাস*, পুর্বোক্ত, পৃ.৬
১৭. *কর্ণফুলী*, পূর্বোক্ত,পৃ.৯
১৮. *কর্ণফুলী*, পূর্বোক্ত,পৃ.১৩২
১৯. *কর্ণফুলী*, পূর্বোক্ত,পৃ.৩৩
২০. *কর্ণফুলী*, পূর্বোক্ত,পৃ.৪২

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

'বাংলাদেশের উপন্যাস' কথাটির মধ্যে ভুখন্ডগত একটি পরিচয়ের ইঙ্গিত বর্তমান। উনিশ'শ সাতচল্লিশ সালে দেশ-বিভাগের পর বাংলাদেশের উপন্যাসের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ কাল-পরিসরে রচিত বাংলাদেশের উপন্যাসের দিকে দৃষ্টিপাত করলে একথা সুস্পষ্ট হয় যে, আমাদের ঔপন্যাসিকরা বিষয়ের প্রতি যতটা আগ্রহী, ফর্ম বা প্রকরণ-পরিচর্যায় ততটা যত্নশীল নন। আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব-সংঘাতের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের সমাজকাঠামোর যে পরিবর্তন ঘটেছে, সেই পরিবর্তনকে আমাদের ঔপন্যাসিকরা নিজেদের রচনা ধারণ করলেও, তা আধুনিক ফর্মচেতনা দ্বারা ঋদ্ধ নয়। প্রবীণরা যেমন প্রথাগত আঙ্গিকে উপন্যাস রচনায় আরামবোধ করেছেন, তেমনি নবীন-প্রবংশের অধিকাংশ ঔপন্যাসিকই পূর্বসূরীদের পথ অবলীলায় অনুসরণ করেছেন। এক্ষেত্রে উজ্জ্বল ব্যতিক্রম হচ্ছেন শওকত ওসমান, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ, শহীদুল্লা কায়সার, সত্যেন সেন,আবু জাফর শামসুদ্দীন এবং আলাউদ্দিন আল আজাদ। প্রধানত এই সব ঔপন্যাসিকের সাধনায় বাংলাদেশের উপন্যাসে আধুনিক প্রকরণ-শৈলী সূত্রপাত হয়।

প্লটবিন্যাসে কার্যকারণ-সূত্র, চরিত্রায়ণ, সময়-ধারণা, প্রকরণ-পরিচর্যা,দৃষ্টিকোণ-নির্বাচন,ভাষা ব্যবহার বাক্যগঠন-শৈলী-এসব বিষয় উপন্যাসের শৈলীবিচারের প্রধান প্রধান দিক। বাংলাদেশের অতি অল্পসংখ্যক উপন্যাসকে আমরা শৈলীবিচারের এই দৃষ্টিকোণের বিবেচনায় আনতে পেরেছি। শহীদুল্লা কায়সারের 'সংশপ্তক' এবং আলাউদ্দিন আল আজাদের 'ক্ষুধা ও আশা' উপন্যাসে মহাকাব্যিক ক্যানভাসে বাংলাদেশের সংগ্রাম আর স্বপ্নের ছবি প্রকাশিত হয়েছে। সমাজবিকাশের বিশ্বস্ত দলিল হিসেবে মহাকাব্যিক এই উপন্যাসদ্বয় আমাদের সাহিত্যের উজ্জ্বল সম্পদ। চেতনাপ্রবাহ শিল্পশৈলীর উপন্যাস অপেক্ষাকৃত আধুনিক এবং এ শিল্পধারার নিঃসঙ্গ যাত্রী সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ। ফর্মনিষ্ঠা ও প্রকরণ-পরিচর্যায় তাঁর উপন্যাস সমগ্র বাংলা উপন্যাসের ধারাতেই স্বতন্ত্র ও ব্যতিক্রমী।

শওকত ওসমানের 'ক্রীতদাসের হাসি', ' রাজা উপাখ্যান' এবং 'সমাগম' উপন্যাসে রূপক-প্রতীক শিল্পশৈলীর আধারে বাঙালির সংগ্রামশীল চেতনার দ্রোহ ও প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে।

ইতিহাস ও ঐতিহ্যের আধারে আত্ম-অনুসন্ধান এবং পুরাণের সময়গর্ভে সুপ্ত সম্ভাবনার বীজকে সমকালের প্রেক্ষাপটে নতুন করে নির্মাণ করেছেন আবু জাফর শামসুদ্দীন এবং সত্যেন সেন। 'ভাওয়াল গড়ের উপাখ্যান'-এর মধ্যে যেমন আমাদের জাতিসত্তার বৈশিষ্ট্য বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে, তেমনি মিথ অঙ্গীকারে সমকালীন জীবন সংগ্রাম কল্লোলিত হয়েছে 'অভিশপ্ত নগরী' এবং 'পাপের সন্তান' উপন্যাসে। আঞ্চলিক জীবনরূপায়ণ মূলক শিল্পশৈলীর সার্থক উদাহরণ হিসেবে শহীদুল্লা কায়সারের 'সারেং বৌ' এবং আলাউদ্দিন আল আজাদের 'কর্ণফুলী' আলোচ্য কালপর্বের শ্রেষ্ট সৃষ্টি।

বস্তুত, বাংলাদেশের উল্লিখিত ঔপন্যাসিকবৃন্দ বিভাগোত্তরকালে ফর্ম-নিষ্ঠা ও প্রকরণ-পরিচর্যার যে স্বাক্ষর রেখেছেন, তা বহুমাত্রিক বৈশিষ্ট্যে অনন্য। আলোচ্য কালপর্বের এই ঔপন্যাসিকদের জীবনজিজ্ঞাসা আধুনিক আঙ্গিকচেতনায় সমৃদ্ধ ও উজ্জ্বল। শৈলী-স্বাতন্ত্র্যে এই সব ঔপন্যাসিক তাঁদের সাধনা দিয়ে বাংলাদেশের পরবর্তী প্রবংশের ঔপন্যাসিকদের ফর্ম-নিরীক্ষায় গভীরভাবে প্রভাবিত ও অনুপ্রাণিত করেছেন। বস্তুত, তাঁদের সাধনার সরণী বেয়েই বাংলাদেশের ঔপন্যাসিকদের মাঝে ক্রমে সঞ্চারিত হয়েছে আধুনিক ফর্মচেতনা।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট

Dhaka University Institutional Repository

আলোচিত উপন্যাস

(১৯৪৭-১৯৭১) কাল পর্ব

আবু জাফর শামসুদ্দীন	:	*ভাওয়াল গড়ের উপাখ্যান,* দ্বিতীয় মুদ্রণ ১৯৬৮, ঢাকা, নওরোজ কিতাবিস্তান।
আলাউদ্দিন আল আজাদ	:	*ক্ষুধা ও আশা,* দ্বিতীয় প্রকাশ ১৯৭৪, ঢাকা, মুক্তধারা ।
	:	*কর্ণফুলী* , দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৭৪, ঢাকা, মুক্তধারা।
শওকত ওসমান	:	*ক্রীতদাসের হাসি,* ৭ম সংস্করণ ১৯৮৩, ঢাকা, মুক্তধারা।
	:	*রাজা উপাখ্যান,* ১৩৭৭, ঢাকা, মাওলা ব্রাদার্স।
	:	*সমাগম,* ১৩৭৪, ঢাকা, কথাকলি।
শহীদুল্লা কায়সার	:	*সংশপ্তক,* সপ্তম সংস্করণ, ১৯৯১, ঢাকা, মুক্তধারা।
	:	*সারেং বৌ,* নবম মুদ্রণ, ১৯৮৮, ঢাকা, নওরোজ সাহিত্য সম্ভার।
সত্যেন সেন	:	*অভিশপ্ত নগরী,* ১৩৭৮, কলিকাতা, মুক্তধারা (স্বাধীন বাংলা সাহিত্য পরিষদ)।
	:	*পাপের সন্তান,* দ্বি-সং ১৯৭৪, ঢাকা, নওরোজ কিতাবিস্তান।
সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্	:	*চাঁদের অমাবস্যা,*
	:	*কাঁদো নদী কাঁদো*
		সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ রচনাবলী - ১, সৈয়দ আকরম হোসেন সম্পাদিত, ১৯৮৬,ঢাকা, বাংলা একাডেমী।

* বর্তমান সন্দর্ভে উপন্যাসসমূহের উল্লিখিত পাঠ গৃহীত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

সহায়ক বাংলা গ্রন্থ

অচ্যুত গোস্বামী : *বাংলা উপন্যাসের ধারা,* দ্বি.সং. ১৯৬৮, কলকাতা, পাঠকভবন।

অনুপম সেন : *বাংলাদেশ :রাষ্ট্র ও সমাজ সামাজিক অর্থনীতির স্বরূপ,* দ্বি.সং. ১৯৯৯, ঢাকা, অবসর।

অপূর্ব কুমার রায় : *শৈলী বিজ্ঞান,* ১৯৮৯, কলকাতা, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড

অমলেন্দু দে : *বাঙালী বুদ্ধিজীবী ও বিচ্ছিন্নতাবাদ,* ১৯৮৭, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ।

অরবিন্দ পোদ্দার : *মার্ক্সীয় নন্দনতত্ত্ব ও সাহিত্যবিচার,* ১৯৮৫, কলকাতা, উচ্চারণ।

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় : *কালের প্রতিমা,* ১৯৭৪, সংশোধিত ও পরিবর্ধিত দ্বি.সং. ১৯৯১, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং।

অরুণ সান্যাল (সম্পাদক) : *প্রসঙ্গ:বাংলা উপন্যাস,* ১৯৭৭,কলকাতা, ওয়েস্ট বেঙ্গল পাবলিশার্স।

অলোক রায় : *কথাসাহিত্য জিজ্ঞাসা,* ১৯৯২, কলকাতা, সাহিত্যলোক।

অলোক রায় (সম্পাদক) : *সাহিত্য কোষ :কথাসাহিত্য,*দ্বি.সং. ১৯৯৩, কলকাতা, সাহিত্যলোক।

অশ্রুকমার সিকদার : *আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস,* ১৯৮৮, কলকাতা, অরুণা প্রকাশনী।

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : *সমালোচনার কথা,* চতু.সং. ১৯৯৫, কলকাতা, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড।

আনিসুজ্জামান : *মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য,* ১৯৭১, কলিকাতা, মুক্তধারা, ঐ এ্যান্টনিবাগান লেন।

আবদুল মওদুদ : *মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ: সংস্কৃতির রূপান্তর,* ১৯৬৯, ঢাকা, নওরোজ কিতাবিস্তান।

আবু সয়ীদ আইয়ুব : *পথের শেষ কোথায়,* ১৯৭৭, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং।

আবু হেনা মোস্তাফা কামাল : *কথা ও কবিতা,* ১৯৮১, ঢাকা, মুক্তধারা।

আশিস্ কুমার দে : *সাহিত্যালোচনা ও শৈলীবিজ্ঞান,* ১৯৯২, কলকাতা, সাহিত্যপ্রকাশ।

আলাউদ্দিন আল আজাদ : *শিল্পীর সাধনা ,*তৃ.সং. ১৯৬৮, ঢাকা, মাওলা ব্রাদার্স।

আহমদ ছফা : *বুদ্ধিবৃত্তির নতুন বিন্যাস,* তৃ.সং.১৯৮৭,ঢাকা, মুক্তধারা।

আহমেদ মাওলা : *বাংলাদেশের কথাসাহিত্য প্রবণতাসমূহ,*১৯৯৭, ঢাকা, বাংলা একাডেমী।

কল্যাণ মিরবর : *বাংলাদেশেরন উপন্যাস:চারদশক,* ১৯৯২, কলকাতা, পুস্তক বিপনি।

কামরুদ্দিন আহমদ : *পূর্ববাংলার সমাজ ও রাজনীতি,*১৩৭৬, ঢাকা, স্টুডেন্টস্ পাবলিকেশন।

কাজী আবদুল ওদুদ : *বাংলার জাগরণ,* ১৩৬৩, কলকাতা, বিশ্বভারতী।

: *শাশ্বত বঙ্গ,* ১৯৫১, কলকাতা।

খোন্দকার সিরাজুল হক : *মুসলিম সাহিত্য-সমাজ :সমাজচিন্তা ও সাহিত্যকর্ম,* ১৯৮৪, ঢাকা, বাংলা একাডেমী।

গোপিকানাথ রায় চৌধুরী : *দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাংলা কথাসাহিত্য,* ১৯৮৬,কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং

Dhaka University Institutional Repository

গোপাল হালদার : *সাংস্কৃতির রূপান্তর,* ১৩৫৬, কলকাতা, পুথিঘর।

জীনাত ইমতিয়াজ আলী : *সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ :জীবনদর্শন ও সাহিত্যকর্ম,* ১৯৯২, ঢাকা, শিল্পতরু প্রকাশনী

তপোধীর ভট্টাচার্য : *বাখতিন তত্ত্ব প্রয়োগ,* ১৯৯৬, কলকাতা, পুস্তক বিপনি।

তানভীর মোকাম্মেল : *মার্কসবাদ ও সাহিত্য,* দ্বি-সং ১৯৮৯, ঢাকা, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী উপন্যাস, নিয়ে, ১৯৯১, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং।

দেবেশ রায় : *উপন্যাস নিয়ে,* ১৯৯১,কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং।

দীপ্তি ত্রিপাঠী : *আধুনিক বাংলা কাব্যপরিচয়* ; ১৯৭৭, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং

ধনঞ্জয় দাশ : *মার্কসবাদী সাহিত্য বিতর্ক* ;১৯৭৫, কলকাতা, প্রথমখন্ড, প্রাইমা পাবলিকেশন।

বদরুদ্দিন উমর : *পূর্ববাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি,* প্রথমখন্ড, প্রথম প্রকাশ ১৯৭০, ঢাকা, মাওলা ব্রাদার্স।

: *পূর্ববাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি,* দ্বিতীয়খন্ড, ১৯৭৫, ঢাকা, মাওলা ব্রাদার্স।

বিশ্বজিৎ ঘোষ : *বাংলাদেশের সাহিত্য* ; ১৯৯১, ঢাকা, বাংলা একাডেমী।

: *বুদ্ধদেব বসুর উপন্যাসে নৈঃসঙ্গ্যচেতনার রূপায়ণ,* ১৯৯৭, ঢাকা বাংলা একাডেমী।

ভুঁইয়া ইকবাল : *বাংলাদেশের উপন্যাসের সমাজচিত্র,* ১৯৯১, ঢাকা, বাংলা একাডেমী।

মনসুর মুসা : *পূর্ববাংলার উপন্যাস,* ১৯৭৪, ঢাকা, পূর্বলেখ প্রকাশনী।

মুহম্মদ ইদ্‌রিস আলী : *বাংলাদেশের উপন্যাস সাহিত্য মধ্যবিত্তশ্রেণী,* ১৯৮৫, ঢাকা, বাংলা একাডেমী।

মুহম্মদ রেজাউল হক : *দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর বাংলা উপন্যাস,* ১৯৮৯, ঢাকা, বাংলা একাডেমী।

মুহম্মদ আবদুল হাই ও
সৈয়দ আলী আহসান : *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (আধুনিকযুগ)* পঞ্চম-সং ১৯৭৯, ঢাকা, আহমদ পাবলিশিং হাউস।

রণেশ দাশগুপ্ত : *উপন্যাসের শিল্পরূপ, পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত* ২য় সংস্করণ ১৯৭৩, ঢাকা কালিকলম প্রকাশনী।

রমেশচন্দ্র মজুমদার : *বাংলাদেশের ইতিহাস,* চতুর্থ খন্ড, ১৯৭৫, কলকাতা।

রংগলাল সেন : *বাংলাদেশের সামাজিক স্তর বিন্যাস,* ১৯৮৫, ঢাকা, বাংলা একাডেমী।

রফিকউল্লাহ খান : *বাংলাদেশের উপন্যাস :বিষয় ও শিল্পরূপ,*১৯৯৭, ঢাকা, বাংলা একাডেমী।

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় : *বাংলা উপন্যাসের কালান্তর,* পরিবতির্ত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ ১৯৭১, কলিকাতা, সাহিত্যশ্রী।

সাঈদ-উর রহমান : *পূর্ববাংলার রাজনীতি-সংস্কৃতি ও কবিতা,* ১৯৮৩, ঢাকা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

সুকুমার সেন : *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস,* চতুর্থখন্ড, চতুর্থ সংস্করণ, ১৯৭৬, কলিকাতা, ইস্টার্ণ পাবলিশার্স।

Dhaka University Institutional Repository

সৈয়দ আকরম হোসেন : *প্রসঙ্গ: বাংলা কথাসাহিত্য,* ১৯৯৭, ঢাকা, মাওলা ব্রাদার্স।

: *রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস:চেতনালোক ও শিল্পরূপ,* পুনর্মুদ্রণ, ১৯৮৮, ঢাকা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

হাসান আজিজুল হক : *কথাসাহিত্যের কথকতা,* ১৯৮১, ঢাকা, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশণী।

হুমায়ুন কবির : *বাংলার কাব্য,* ১৩৬৫, কলকাতা, চতুরঙ্গ।

সহায়ক বাংলা প্রবন্ধ

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় : *আঞ্চলিক উপন্যাস,* সাহিত্য সন্ধান, দ্বি-সং, ১৯৮৮, কলিকাতা, সাহিত্যবিহার।

বিশ্বজিৎ ঘোষ : *প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘ :পটভূমি ঢাকা'* বাংলাদেশের সাহিত্য, ১৯৯১, ঢাকা, বাংলা একাডেমী।

যতীন সরকার : *সত্যেন সেনের ঐতিহাসিক উপন্যাস,* গণসাহিত্য, (সম্পাদক : আবুল হাসনাত) অষ্টম বর্ষ, চতুর্থ-ষষ্ট সংখ্যা, চৈত্র ১৩৮৬, ঢাকা।

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় : *বাংলা রাজনৈতিক উপন্যাস,* উত্তর প্রসঙ্গ, ১৩৯৩, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং।

সৈয়দ আজিজুল হক : *শওকত ওসমানের রূপক উপন্যাস,* সাহিত্য পত্রিকা, (সম্পাদক মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান) ঊনত্রিংশ বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, জুন ১৯৮৬, ঢাকা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

সহায়ক ইংরেজি গ্রন্থ

Abdur Razzaq	:	*Bangladesh : The State of the Nation,* 1981, Dhaka, Dhaka University.
Alan Friedman	:	*The Turn of the Novel : the transition of Modern Fiction ,* 1966, NewYork and London.
Agnes Heller	:	*Renaissance man* (Translated by Rrchard E. Allen), 1978, London.
Bernard Bergonzi	:	*The Situation of the Novel,* Second ed. 1979. London and Basingstoke, the Macmillan Press Ltd.
C.S. Lewis	:	*The Allegory of Love*, 1979, London, Oxford University
E.M. Forster	:	*Aspects of the novel* (1927), 1970, Penguin Books England.
F.K. Stangel	:	*A theory of Narrative*, (trans. by charlolte Goedsche). 1984, London, Cambridge University Press.
Georg Lukacs	:	*The Historical Novel* (translatad from the German by Hannah and Sanley Mitchel), 1963, Boston.
G.S.Fraser	:	*The Modern Writer and his world,* 1964. London Andre Deutsch.
Henry James	:	*Selected Litarary Criticism*, 1968, London, Penguin books.
Humayun kabir	:	*The Bengali Novel,* 1968, Calcutta.
Jadunath Sarkar (ed)	:	*History of Bangal* , Voll.II, 1948, Dacca, Dacca University.
Joan Rockwell	:	*Fact in Fiction*, 1974, London, Routledge and Kegan Paul.
Kamruddin Ahmad	:	*A Scio-Political History of Bengal and the Birth of Bangladesh,* Fourth edn. 1975, Dacca, Enside Library.
Karl Marx	:	*Economic and Philosopic Manuscripts of 1844* (Moscow: Progress Publishers, Fifth Edition 1977)
Northrop Frye	:	*Anatomy of Criticism,* 1971, Princton, New Jersey.
Peter Brooks	:	*Reading for the plot :Desigh and entention in the Noarrative,* 1984, Oxford, Walton Stree,U.S.A.
Ralf Fox	:	*The Novel and the People,* Moscow, Progress Publishers.
Robert Scholes & Robert Kellogg	:	*The Nature of Narrative*, 1966, NewYork, Oxford University Press.
Shlomith Rimmon -Kenan	:	*Narrative Fiction : Contemporary Poetics*. 1983, London, Methuen and co. Ltd.
Michael Holquist	:	*Dialogism, Bakhtin and his world*, Reprinted 1991, 1994, 11 New Fetter Lane, London ECUP UEE, 29 West 35th Street NewYork NY 1001
M.M. Bakhthin	:	*The Dialogic emagination : Four Essays* (trans.C.Emerson and M.Holquist, ed. M.Holquist) Austin, Texas, University of Texas Press.